কিশোর ক্লাসিক

আঙ্কল টমস কেবিন

হ্যারিয়েট বিচার স্টো

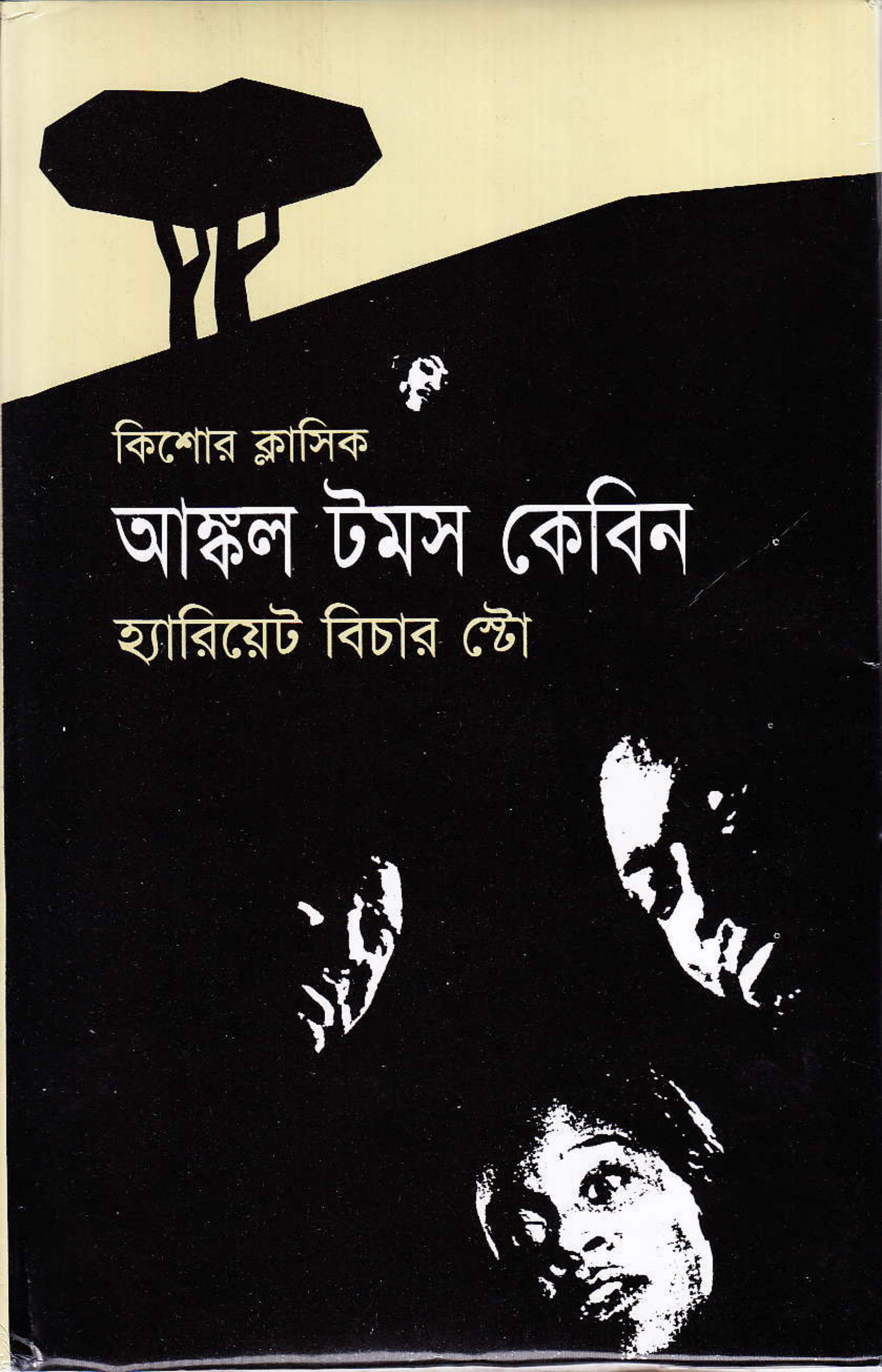

আঙ্কল টমস কেবিন

হ্যারিয়েট বিচার স্টো

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
আলোকিত মানুষ চাই
অন্তর্ভুক্তি নং
776403
স্থাপিত-১৯৭৮
বইটিকে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করুন

আজকাল প্রকাশনী

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

ষষ্ঠ মুদ্রণ : অক্টোবর ২০১১
প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৯৬

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

প্রকাশক : চিন্ময় পাল আজকাল প্রকাশনী ৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
কম্পোজ : বাংলাবাজার কম্পিউটার ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা ১১০০
মুদ্রক : ঢাকা প্রিন্টার্স ৩৬/১ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা ১১০০

মূল্য : ১৪০.০০ টাকা

এক

মনুষ্যত্ববোধ আছে এমন একজন মানুষ

ফেব্রুয়ারি মাস। কনকনে শীতের বিকেল। মার্কিন দেশের কেন্টাকি রাজ্যের এক শহরে একটি বড় বাড়ি। সুন্দর সাজানো-গোছানো। একটি নিরিবিলি বৈঠকখানা। এইমাত্র খাওয়া শেষ করে মুখোমুখি বসে দুজন লোক জরুরি আলাপ করছেন। তাদের আলোচনা এতোই জরুরি আর গোপনীয় যে আশেপাশে কোনো ভৃত্যকেও থাকতে দেয়া হয় নি।

দুজনের মধ্যে একজনের মেজাজ খুব কড়া। বেঁটেখাটো হৃষ্টপুষ্ট চেহারা তার। বিশেষ করে তুলে ধরার মতো আর কোনো বৈশিষ্ট্য নেই লোকটার চেহারায়। কিন্তু হাবভাব দেখলে বোঝা যায়, বহু মানুষের মাঝখান থেকে তার নিজের পথ নিজেই তৈরি করে নিয়েছেন। তার পরনে বেশ দামি পোশাক। গায়ে বিচিত্র রঙের ঝলমলে জামা। গলায় নীল রঙের রেশমি রুমাল। তাতে হলদে ফুটকি আঁকা। লোমভরা দুটি হাতে কয়েকটা আংটি। পকেটঘড়ির সোনার বেল্টটা বেশ ভারি। চকচক করছে আলো। তাকে দেখেই মনে হয়, নিজেকে একজন ভদ্রলোক হিসেবে প্রমাণ করার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে সে।

এ-বাড়ির মালিকের নাম মিস্টার শেলবি। অবশ্য তাঁকে দেখলে বোঝা যায় যে, তিনি আসলেই একজন ভদ্রলোক। পরিপাটি সাজানো ঘরদোর। ঘরের পরিবেশ থেকে গৃহকর্তার রুচি আর স্বচ্ছল অবস্থার কথাও অনুমান করতে কষ্ট হয় না। দুজনে এখনো গভীরভাবে জরুরি আলাপে মগ্ন।

মিস্টার শেলবি বললেন, 'কাজটা ওভাবেই আমাকে করে দিতে হবে হ্যালি।' সুরার গ্লাসটা আলোর সামনে নিয়ে হ্যালি বলল, 'এভাবে এ-ব্যবসা করা সম্ভব নয়, মিস্টার শেলবি ... কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়।'

'আসল কথা কী জানো হ্যালি, টম মোটেই আর দশটা ক্রীতদাসের মতো নয়। শুধু টাকা-পয়সার হিসেবে দাম ধরা যায় না ওর। টম যেমন কাজের, তেমনি সৎ। আমার খামারের কথাতো জানোই। টম সব কাজই ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে মিলিয়ে করে রাখে।'

'তাহলে আপনি বলছেন, টম খুব সৎ। মানে নিগ্রোরা যতটা সৎ হতে পারে ততটাই?'

'ওভাবে বলবেন না, টম আসলেই খুব সৎ। চার বছর আগে টম একটা ধর্মীয় উৎসবে গিয়েছিল। তখন থেকেই ও মনেপ্রাণে খ্রিস্টান। ওকে বিশ্বাস করতে পারি বলে ওর হাতে টাকা-পয়সা, ঘরবাড়ি, জমিজমা, খামার, ঘোড়া, আমার সবই তো ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারি। কাজের দরকারে টম যখন যেখানে খুশি আসা-যাওয়া করে। আমাকে কখনো ঠকায় নি। ওর মতো সৎ আর বিশ্বাসী ক্রীতদাস আর কখনো দেখি নি।'

হ্যালি হাসতে হাসতে বলল, 'মিস্টার শেলবি, নিগ্রোরা যে সৎ হয় এ কথা কেউই মানতে চায় না।'

মিঃ শেলবি একটা লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'হয়তোবা তাই। কিন্তু সত্যিকার অর্থেই টমের কোনো তুলনা হতে পারে না। একটা মানুষ যতটা সৎ হতে পারে টম ঠিক ততটাই সৎ! এইতো মাত্র কদিন আগে, ব্যবসার একটা কাজে আমার যাওয়া হলো না। টমকে সিনসিনাটিতে পাঠিয়ে দিলাম। টমই বিক্রিটিক্রি করে পাঁচশ ডলার নিয়ে ফিরে এল। কিন্তু বাজে লোকেরা ওকে লোভ দেখিয়েছিল, "টাকা-পয়সা নিয়ে কানাডায় পালিয়ে যাও।" টম বলেছিল, "অসম্ভব, কর্তা আমাকে বিশ্বাস করেন, আমি বিশ্বাসঘাতক হতে পারব না।"

পরে লোকমুখে আমি একথা শুনেছিলাম। আমি ভালোভাবেই জানতাম টম ফিরে আসবেই। এখন একেবারে নিরুপায় বলেই ওকে ছাড়তে হচ্ছে। টমকে নিয়েই আমার সমস্ত দেনা মাফ করে দেওয়া উচিত। হ্যালি, তোমার বিবেচনা বলে কিছু থাকলে তুমি তা করবে।'

হ্যালি বললেন, 'মিস্টার শেলবি, একজন ব্যবসায়ী হিসেবে কোনো মানুষের যতটুকু বিবেচনা থাকা দরকার, অন্তত সেটুকু আমার আছে।' হ্যালির কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ মেশানো একটুকরো হাসি। একটু থেমে আবার বললেন, 'আমি সব সময়ই বন্ধুদের সাহায্য করার জন্যে তৈরি থাকি। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, এ-বছর ব্যবসার খুবই বাজে অবস্থা। এতই খারাপ অবস্থা যে, আপনাকে বলে বোঝানো সম্ভব নয়।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হ্যালি তার পেয়ালায় আরো খানিকটা ব্রান্ডি ঢেলে নিল।

কিছুক্ষণ অস্বস্তিকর নীরবতার পর শেলবিই প্রথমে মুখ খুললেন, 'তাহলে এ ব্যাপারটার কী করা যায় ঠিক করলে?"

'সত্যিই তোমাকে দেয়া যায় তেমন কেউ এখানে নেই। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, আমি খুব দায়ে পড়েই টমকে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছি। তাছাড়া এতদিনের পুরনো আর বিশ্বাসী কোনো চাকরকে ছেড়ে দেওয়ার কোনো কথাই ওঠে না।'

দুজনের কথার মধ্যেই দরজা খুলে একটা নিগ্রো ছেলে ভেতরে এল। চার-পাঁচ বছরের ছেলেটা দেখতে বেশ। ছেলেটার সমস্ত চেহারায় এমন একটা উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে রয়েছে যা সবার চোখে পড়ে। রেশমের মতো নরম একরাশ কোঁকড়ানো কালো চুল। টোল খাওয়া সুন্দর মুখখানা ঘিরে টানাটানা দুটো চোখ। সে চোখের মণিতে ঢেউ খেলে যাচ্ছে অদ্ভুত একটা উজ্জ্বল আভা। গাঢ় লাল রঙের চমৎকার পোশাকে ওকে দারুণ মানিয়েছে।

ঘরের ভিতরে ঢুকে বাচ্চা ছেলেটা সাবধানে একবার চারদিকে তাকাল।

ছেলেটির চোখে চোখ পড়তেই শিষ দিয়ে ছেলেটাকে কাছে ডাকলেন মিস্টার শেলবি, 'হ্যালো, জিম ক্রো!' পরম আদরে একগুচ্ছ মনাক্কা ছেলেটার দিকে ছুড়ে দিয়ে বললেন,

'কুড়িয়ে নাও।' মহা খুশিতে ছেলেটাকে উপহারটির দিকে ছুটে যেতে দেখে তার মনিব খুশিতে হেসে উঠলেন।

'জিম, এদিকে এস।'

ছেলেটি ছুটে এল। শেলবি তার গাল টিপে আদর করতে করতে কোঁকড়ানো চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তুমি কেমন নাচতে পার, গাইতে পার, এই ভদ্রলোককে একটু দেখিয়ে দাও তো।'

ছেলেটি নিঃসঙ্কোচে জনপ্রিয় একটা নিগ্রো সংগীত তার কচি মিষ্টি গলায় গেয়ে শোনাল। সেই সঙ্গে সুরের তালে তাল রেখে হাত-পা নেড়ে, হাস্যকর ছন্দে সারা শরীর হেলিয়ে-দুলিয়ে নাচতে লাগল।

'চমৎকার, চমৎকার হয়েছে!' কমলার কয়েকটা কোয়া বাচ্চাটার দিকে ছুড়ে দিল হ্যালি।

শেলবি বললেন, 'আচ্ছা জিম, দেখাও তো দেখি কুঁজো কাকার বাত হলে কেমন করে হাঁটে।'

বলতে না বলতেই জিম মনিবের ছড়িটার ওপর শরীরের ভার রেখে, পিঠটাকে যতটা সম্ভব বাঁকা করে বেশ কষ্টে হাঁটতে শুরু করল। তার কচি মুখটায় ভেসে উঠল বৃদ্ধ কোনো মানুষের তীব্র যন্ত্রণা।

জিমের ভাবভঙ্গিতে দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল। 'এইযে জিম, বুড়ো রবিন কীভাবে উপাসনা করে একটু দেখিয়ে দাও তো এবার।' জিম তখুনি গোলগাল মুখটা টানটান করে উপর দিকে তুলে, কিছুটা নাকি সুরে, তা নকল করে দেখাল।

'বাঃ ছেলেটা দেখছি সব ব্যাপারেই একেবারে তাক লাগিয়ে দেয়ার মতো। আচ্ছা ...' হঠাৎ শেলবির দিকে ফিরে হ্যালি তাঁর হাত দুটো সবেগে আঁকড়ে ধরল। একটু আমতা আমতা করে বলল, 'এখানে তো আর এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, আপনি বরং টমের সঙ্গে এই ছেলেটাকেও দিন। বিশ্বাস করুন, আমি কথা দিচ্ছি, আপনার সম্পূর্ণ দেনা শোধ হয়ে যাবে।'

হ্যালির কথা শেষ হতে না হতেই আলতো করে দরজা ঠেলে একটি নিগ্রো মহিলা ঘরে ঢুকল। পঁচিশ কি ছাব্বিশ বছরের মহিলাটি খুবই সুন্দর। এক ঝলকেই বলে দেয়া যায় মহিলাটি জিমের মা। জিমের মতো তার মারও দীর্ঘ পল্লবঘেরা টানাটানা চোখ, মাথায় রেশমের মতো একরাশ কোঁকড়ানো কালো চুল। গায়ের রঙ হালকা বাদামি। ওকে দেখে নিগ্রোদের চাইতে বরং শ্বেতাঙ্গদের কথাই বেশি করে মনে পড়ে। ওর সুন্দর মুখ আর সুঠাম দেহের সঙ্গে পোশাকটাও চমৎকার মানিয়েছে। মসৃণ দুটো হাত, নিটোল পায়ের পাতা আর গোড়ালি দেখে হ্যালির পাকা চোখ এক নজরেই বলে দিতে পারে নারী পণ্যের হাটে এই সুন্দরী মেয়েটার দাম কত?

মেয়েটিকে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর মনিব জিজ্ঞেস করলেন, 'এলিজা, কী ব্যাপার?'

'স্যার, আমি হ্যারিকে খুঁজছিলাম।

জিম দৌড়ে এসে তার কুড়িয়ে নেয়া মনাক্কার গুচ্ছ আর কমলার কোয়াগুলো মাকে দেখাল।

শেলবি বললেন, 'জিমকে নিয়ে যাও।'

এলিজা ছেলেকে সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হ্যালি প্রশংসার চোখে শেলবির দিকে তাকিয়ে বলল, 'চমৎকার! আপনার ঘরে তো দেখছি খুব দামি একটা বস্তু রয়েছে! যখন তখন অলিয়েন্সের হাটে নিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে বিক্রি করলে আপনার ভাগ্য ফিরে যেতে পারে। আমি বহু মেয়ে বিক্রি করেছি, কিন্তু এমন সুন্দরী আর একটাও চোখে পড়ে নি।'

'এলিজাকে বিক্রি করে আমি ভাগ্য ফেরাতে চাই না।' শুকনো গলায় শেলবি বললেন।

'আচ্ছা, ঠিক আছে।' ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো শেলবির কাঁধে হাত রেখে হ্যালি বলে ফেলল, 'আমি না হয় নিজেই মেয়েটাকে কিনব। আপনি কত চান বলুন?'

'ওকে আমি মোটেই বেচতে চাই না হ্যালি। ওর সমান ওজন সোনার বদলেও আমার বউ ওকে ছাড়তে রাজি হবে না।'

'মেয়েরা অমন বলেই থাকে। ওরা কখনোই হিসেবের ধার ধারে না। যদি আপনি আপনার স্ত্রীকে বোঝান যে ওর দামে অনেক ভালো ভালো পোশাক আর নামী দামি গয়না হতে পারে, আমার তো মনে হয়, উনি ঠিকই আপত্তি করতে পারবেন না।'

শেলবি দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তোমাকে স্পষ্টই বলছি হ্যালি, একথা তুমি আর একবারও মুখে আনবে না।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে টমের সঙ্গে আপনি ওই ছোট্ট ছেলেটাকেই দিন। সমস্ত দেনা শোধ হয়ে যাওয়ায় আশা করি আপনি মোটামুটি ভালোই দাম পাবেন।'

শেলবি অবাক হয়ে বললেন, 'কিন্তু অতটুকুন একটা বাচ্চাকে দিয়ে তুমি কী করবে?'

'আমার এক বন্ধু আছে, সুন্দর সুন্দর বাচ্চা ছেলে কিনতেই তার বেশি আগ্রহ। দাস-ব্যবসার ওদিকটা নিয়েই তার কারবার। বাচ্চাগুলোকে খাইয়ে পরিয়ে বেশ বড়সড় করে হোটেল রেস্তোরাঁয় কাজের জন্যে বাজারে খুব দামে বিক্রি করে। এতে তার খুব ভালো লাভ হয়। আপনার এই বাচ্চাটা যেমন সুন্দর, তেমন চটপটে। একে পেলে আমার তো মনে হয় বেশ বড় একটা অঙ্কের টাকা পাওয়া যাবে।'

'ওকে বিক্রি করার কোনো ইচ্ছে আমার নেই', কিছু একটা ভাবতে ভাবতেই শেলবি বললেন, 'সত্যি বলতে কি জানো হ্যালি, আমি নিজেকে একজন মানুষ বলে মনে করি এবং এভাবে মার কোল থেকে কোনো শিশুকে কেড়ে নেয়াটাকে আমি ঘৃণা করি।'

'ঘৃণা যে আমি করি না এমন নয়। মেয়েদের কান্নাকাটি আমার একেবারেই সহ্য হয় না। তবে অসুবিধে কী জানেন, ব্যবসা করতে গেলে এসব ভাবলে চলে না। আচ্ছা, কয়েকদিনের জন্যে বাচ্চাটার মাকে কোথাও পাঠিয়ে দেয়া যায় না? এই সুযোগে ছেলেটাকে সরিয়ে নেয়া যাবে এরপর ওর মা ফিরে এলে নতুন কিছু পোশাক কিংবা ওই ধরনের কোনো উপহার দিলে মেয়েটা ঠিকই সব ভুলে যাবে।'

শেলবি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, বললেন, 'আমার কিন্তু তা মোটেই মনে হয় না।'

'হয় না কেন, নিশ্চয়ই হয়। সত্যি কি জানেন ওই কালো ভূতগুলো মোটেই শ্বেতাঙ্গদের মতো নয়। ওদের মধ্যে দয়ামায়া বলতে কিছুই নেই। তবে ব্যাপারটা অবশ্য বেশ কায়দা করে করা দরকার। অন্যেরা যেভাবে করে, তাদের ধরনের সঙ্গে আমার মেলে না। এতে আসল জিনিসটাই নষ্ট হয়ে যায়। আমি জানি, একবার এক ভদ্রলোক অলিয়েন্সের হাট থেকে একটা মেয়ে কিনেছিলেন। সত্যিই বেশ সুন্দর দেখতে মেয়েটা। কিন্তু ভদ্রলোক তার বাচ্চাটাকে কেনেন নি। বাচ্চার জন্যে কান্নাকাটি করার ফলে ভদ্রলোক মেয়েটাকে ঘরে তালাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। দুঃখশোকে মেয়েটা পাগল হয়ে যায়, এমনকি

দিনকয়েক পরে মারাও যায়। ফলে ভদ্রলোকের নগদ এক হাজার ডলার একদম জলে গেল। কিন্তু একটু কায়দা করে করলে তাঁর এতো বড় ক্ষতিটা হতো না। আমার বন্ধু, টম লকারও মেয়েদের মারধর করে, তাদের ওপর অত্যাচার করে। আমি অনেকবার নিষেধ করেছি। এতে আসলে তারই ক্ষতি। মেয়েদের চেহারা খারাপ হয়ে পড়ে, বিক্রির সময় ভালো দাম পাওয়া যায় না। এ জন্যে আমি সাধারণত নিগ্রোদের ওপর কখনো খারাপ ব্যবহার করি না।'

'শুনে সত্যিই খুব খুশি হলাম, হ্যালি।'

একটু নীরব থেকে হ্যালি জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে মিস্টার শেলবি, আমার প্রস্তাবটার ব্যাপারে আপনি ভাবছেন?'

'আরো ভেবে পরে বলব। এ-ব্যাপারে আমার স্ত্রীর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার।'

'ঠিক আছে।' হ্যালি উঠে দাঁড়িয়ে ওভারকোটটা গায়ে জড়িয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন তো, আমার হাতে সময় খুবই কম।'

'আচ্ছা, সন্ধ্যে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে এলে চলবে, তখনি আমার উত্তর পেয়ে যাবেন।'

'ধন্যবাদ।'

হ্যালি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। বন্ধ ঘরে নীরবে একা বসে শেলবি নিজের মনেই ভাবতে লাগলেন, 'বিশ্রী লোকটাকে আমার ঘর থেকে দূর করে দিলেই ঠিক হতো। অথচ কোনো উপায়ই দেখছি না। ওর কাছেই তো আমার ঘরবাড়ি সব বাঁধা রয়েছে। নইলে শুধু এলিজার ছেলে কেন, টমকেও বিক্রি করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এর জন্যে স্ত্রীর কাছেও আমাকে কথা শুনতে হবে। শেলবি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'উঃ, দেনা যে কী ভয়ঙ্কর, যার আছে সেই জানে!'

অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় কেন্টাকিই সম্ভবত নিগ্রো ক্রীতদাস-দাসীদের প্রতি অনেক বেশি উদার। এদের মধ্যে মিস্টার শেলবি আবার সবচাইতে ভদ্র আর স্নেহপ্রবণ। অধীনস্থ্ সমস্ত দাসদাসীদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি তাঁর কোনো ত্রুটিই তেমন করে চোখে লাগে না। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে ফটকায় লোকসান দিতে দিতে ঋণের পরিমাণ এমন একটা অঙ্কে গিয়ে দাঁড়ায়, যেখান থেকে মুক্তি পাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ঋণের সময় তিনি যেসব হুন্ডি দিয়েছিলেন, তার অধিকাংশই গিয়ে পড়েছিল হ্যালির হাতে। সেই জন্যে আজকের এই আলোচনার সূত্রপাত। এদিকে এলিজা হঠাৎই দরজার কাছাকাছি এসে পড়ায় ভিতরের কথাবার্তার কিছু অংশ তার কানে এসেছিল। তা থেকে সে এইটুকু অনুমান করতে পেরেছিল একজন দাসব্যবসায়ী তার মনিবের সঙ্গে কাউকে কেনার জন্যে দর কষাকষি করছে। তার আরো খানিকক্ষণ আড়ি পেতে শোনার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময় কর্ত্রীর ডাকে তাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হলো। তবু সে যদি নিতান্ত শুনতে ভুল না করে থাকে, তাহলে লোকটা তার হ্যারির জন্যেই দরাদরি করছিল। এতে তার বুকের ভিতরটা থরথর করে কেঁপে উঠল। ছেলেকে এতো জোরে সে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরল যে হ্যারি অবাক্ হয়ে মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সব কাজেই আজ এলিজার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। এটা ফেলছে, সেটা ওলটাচ্ছে। শেষপর্যন্ত, রেশমি পোশাকটা চাওয়ায় সে যখন আলমারি থেকে রাতের পোশাকটা এনে দিল, বাড়ির কর্ত্রী অবাক না হয়ে পারলেন না। 'আজ তোর কী হয়েছে বলতো এলিজা?'

'গিন্নিমা, একজন দাসব্যবসায়ী আজ বৈঠকখানায় কর্তাবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল।'

'তাতে তোর কী?'

'ভয় হচ্ছে, কর্তাবাবু বোধহয় আমার হ্যারিকে তার কাছে বেচে দেবেন?' বলতে বলতে কান্নায় তার গলার স্বর বুজে এল।

'বেচে দেবে! আচ্ছা বোকা মেয়ে তো! তুই তো জানিস, তোর মনিব দক্ষিণের দাসব্যবসায়ীদের সঙ্গে কারবার করেন না, নিতান্ত দুর্ব্যবহার না করলে তিনি কখনো কাউকে বেচেনও না। তাছাড়া অতটুকুন দুধের বাচ্চাকে কে কিনতে যাবে শুনি? তোর যতসব উদ্ভট ধারণা। নে, এখন আমার চুলটা সেদিনের মতো ভালো করে বেঁধে দে দেখি। আর কোনোদিনও অমন করে দরজায় আড়ি পেতে শুনবি না।'

'আচ্ছা, তবু আপনি কিন্তু কিছুতেই আমার হ্যারিকে বিক্রি করার অনুমতি দেবেন না, মা।'

'কী আজে-বাজে বকছিস! তুই কি পাগল হয়েছিস? তাহলে তো আমার নিজের ছেলে জর্জকেও বিক্রি করে দিতে পারি।'

মনিবানির কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হয়ে এলিজা প্রসাধনের কাজে মন দিল। প্রসাধন শেষ হবার পর মিসেস শেলবি প্রতিদিনের মতো সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়ে গেলেন। এলিজার কথাগুলো তার আর একটুও মনে রইল না।

দুই

জর্জ হ্যারিস

শৈশব থেকে এলিজাকে নিজের মেয়ের মতো করে মানুষ করেছেন মিসেস শেলবি।

ক্রীতদাসী হলেও এলিজা রূপে গুণে অসাধারণ। শুধু চোখধাঁধানো রূপ নয়, চাল-চলন আচার-ব্যবহারে সে যেকোনো ভদ্রমহিলারই মতো শোভন। জর্জ হ্যারিস নামে অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন তরুণের সঙ্গে মিসেস শেলবি তার বিয়ে দিয়েছিলেন। পাশের জমিদারিতে জর্জ ছিল নিগ্রো ক্রীতদাস। তার মনিব, মিস্টার হ্যারিস তাকে চট তৈরির

একটা কারখানায় ভাড়া খাটাতেন। কর্মচারী হিসেবে জর্জ সত্যিই অতুলনীয়। তার মিষ্টি ব্যবহার আর নিপুণ কর্মতৎপরতার জন্যে কারখানার সবাই তাকে খুব ভালোবাসত, এমন কি শ্রদ্ধাও করত। অনেক মাথা খাটিয়ে সে শন পরিষ্কার করার একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছিল, যা তার মতো স্বল্পশিক্ষিত তরুণের পক্ষে ইটনির তুলো পাকানোর যন্ত্র-উদ্ভাবনী প্রতিভার চাইতে কোনো অংশে কম ছিল না। তবু আইনের চোখে জর্জকে আদৌ মানুষ হিসেবে গণ্য করা হতো না। বিশেষ করে তার সংকীর্ণমনা মনিবটি ছিল অত্যন্ত নীচু, অভদ্র আর অত্যাচারী। জর্জের যন্ত্র আবিষ্কারের কথাটা তিনি শুনেছিলেন বটে। কিন্তু যার সম্পর্কে সবাই এতো বলাবলি করে সেই জিনিসটাকে কোনোদিন চোখে দেখেন নি। তাই নিজেই একদিন ঘোড়ায় চড়ে কারখানায় এসে হাজির হলেন।

জর্জের মতো প্রতিভাবান একজন ক্রীতদাসকে লাভ করতে পারার জন্যে কারখানার মালিক মিস্টার হ্যারিকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। জর্জ বিপুল উৎসাহে যন্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁকে বোঝাতে লাগল। খুশিতে ঝলমল করা মুখ, মাথা উঁচিয়ে রাখা পৌরুষদীপ্ত সুন্দর চেহারার তুলনায় মনিবকে কেমন যেন নিকৃষ্ট মনে হতে লাগল। মিস্টার হ্যারি মনে মনে ভাবলেন, নিগ্রো ক্রীতদাসটার কী দরকার ছিল এই যন্ত্রটা আবিষ্কার করার? ও কি ভদ্রলোকদের মতো মাথা উঁচু করে চলতে চায়? তখনি তিনি মনে মনে ঠিক করলেন খুব তাড়াতাড়ি ওর দর্প চূর্ণ করা দরকার। মিঃ হ্যারিস তাই জর্জের পাওনা মিটিয়ে যখন নিজের খামারবাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা বললেন, সবাই তখন অবাক হয়ে গেল।

কারখানার মালিক বললেন, 'ব্যাপারটা খুব অপ্রত্যাশিত হয়ে যাচ্ছে না স্যার?'

'হলোই বা, লোকটা তো আমারই।'

'আমরা ওর মাইনে বাড়িয়ে দিতে রাজি আছি।'

'আমি ঠিক করেছি আমার আর কোনো লোককেই ভাড়া খাটাব না।'

'কিন্তু এই ছেলেটি আমার সব কাজের উপযুক্ত।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি; শুধু আমার ছাড়া ও আর সবারই কাজের উপযুক্ত।'

'কিন্তু একবার ভেবে দেখুন স্যার, যে এমন দারুণ একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে ...'

'সে শুধু খাটুনি বাঁচাবার ধান্দা। প্রতিটি নিগ্রোই যখন এক-একটা খাটুনি বাচাবার কল, তখন আর এটাকে নতুন করে বানাবার দরকারটা ছিল কী? না, ওকে যেতেই হবে।'

মনিবের কথা শুনে জর্জ একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। হাতে হাত জড়িয়ে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে, পাথরের প্রতিমূর্তির মতো সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। শুধু তার বুকের মধ্যে তখন ঝড় বইছিল, শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছিল অগ্নিস্রোত, চোখ দুটো গনগনে ভাটার মতো জ্বলছিল। ঠিক সেই সময় ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কারখানার মালিক আলতো করে ওর হাতে চাপ দিয়ে কানে কানে যদি না বলতেন, 'এখনকার মতো যাও জর্জ। পরে তোমাকে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করব।' তাহলে সেদিন হয়তো উত্তেজনার বশে জর্জ একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ডই বাঁধিয়ে বসত।

জর্জের প্রভু, মিস্টার হ্যারিস, জর্জকে ফিরিয়ে এনে তার খামারবাড়িতে আগাছা পরিষ্কার করার মতো নীরস কাজে লাগিয়ে দিলেন। সবসময় নানাভাবে তিনি জর্জকে দমিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও, তার চোখ থেকে আগুনের সেই দীপ্তিটাকে কিছুতেই নিভিয়ে দিতে পারলেন না।

জর্জের কাছে কারখানার দিনগুলো ছিল সব চাইতে সুখের। বন্ধুরা যেমন তাকে ভালোবাসত, কারখানার বৃদ্ধ মালিকের মনটাও ছিল তেমনি উদার। ফলে সে যখন যেখানে ইচ্ছে যেতে পারত। মিসেস শেলবি নিজে দেখেশুনে এলিজার বিয়ে দিয়েছিলেন এবং জর্জের মতো প্রতিভাবান, প্রিয়দর্শন তরুণের সঙ্গে এলিজার বিয়ে দিতে পেরে নিজেই খুশি হয়েছিলেন। শেষের কয়েকটা বছর খুশিমতো আসা-যাওয়া করতে পারত। বিশেষ করে হ্যারির জন্মের পর থেকে, জর্জ আর এলিজার জীবনে সুখের অন্ত ছিল না। কিন্তু কারখানা থেকে সরিয়ে মনিবের লৌহকঠিন শাসনের শৃঙ্খলে ফিরিয়ে আনার মুহূর্তে জর্জ বুঝতে পারল তার জীবনে সুখের দিন শেষ হয়ে গেছে।

দু-এক সপ্তাহ পরে কারখানার মালিক তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো জর্জকে ফিরিয়ে আনার জন্যে মিস্টার হ্যারিসের সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু হ্যারিস কিছুতেই রাজি হলেন না।

'এর জন্যে এতদূর কষ্ট করে আসার কোনো প্রয়োজন ছিল না।' রুক্ষ স্বরেই হ্যারিস জবাব দিলেন, 'লোকটা আমার; আমি কোনো শর্তেই ওকে আর ভাড়া খাটাব না।'

জর্জ সেদিনই স্পষ্ট বুঝতে পারল তার জীবনে এক চরম দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে।

তিন

এলিজা

মিসেস শেলবি বাড়িতে নেই, বেড়াতে বেরিয়েছেন। এলিজা মন খারাপ করে বারান্দার এককোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ কে যেন তার কাঁধে হাত রাখল। চমকে ফিরে তাকাতেই তার সুন্দর চোখ দুটো খুশিতে ঝকমক করে উঠল।

'ওঃ জর্জ তুমি? উঃ, আমাকে যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! তুমি আসায় সত্যিই আমার খুব ভালো লাগছে। গিন্নিমা এখন বাইরে বেড়াতে গেছেন। চলো, আমরা ভিতরে গিয়ে বসি।

সামনেই সুন্দর বারান্দা। সাজানো-গোছানো ছোট্ট বসার জায়গাটায় সে জর্জকে টানতে টানতে নিয়ে এল! অবসর সময়ে সাধারণত সে এখানে বসেই সেলাই-ফোঁড়াই করে, যাতে মনিবানি ডাকলেই সে শুনতে পায়।

'কী ব্যাপার, আজ যে হাসছ না?' এলিজা জিজ্ঞেস করল, তারপর তার ঘাঘরার প্রান্ত আঁকড়েধরা ছেলেকে দেখিয়ে বলল, 'দেখ, হ্যারি কত বড় হয়ে গেছে ... আর কী সুন্দর দেখতে হয়েছে।'

'আমার মনে হয়, ও না জন্মালেই ভালো হতো, এলিজা! আরো ভালো হতো যদি আমি নিজেই না জন্ম নিতাম।' জর্জের কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ল তিক্ত বেদনা। স্বামীর কাঁধে মাথা রেখে এলিজা সজল চোখে বলল, 'এ তুমি কী বলছ জর্জ!'

'ঠিকই বলছি এলিজা। তোমার মতো এতো সুন্দর মেয়ে আমি আর একটাও দেখি নি। অথচ সেই তোমাকেই আমি সুখী করতে পারলাম না। তোমার সঙ্গে আমার কোনোদিন দেখা না হলে ভালো হতো। আমার জীবনে উন্নতির আর কোনো আশা নেই। সব শেষ। বেঁচে থেকে কী লাভ? আমার বরং মরাই ভালো।'

'না, না, ও কথা বলো না জর্জ! আমি বুঝতে পারছি, কারখানা থেকে সরিয়ে নিয়ে এসেছে বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু একটু ধৈর্য ধর জর্জ। দেখো একদিন ...'

'ধৈর্য কি আমি ধরি নি এলিজা? সবাই যেখানে আমাকে চেনে জানে ভালোবাসে, সেই কারখানা থেকে একেবারে কোনো কারণ ছাড়া সরিয়ে আনার সময় আমি একটি কথাও বলি নি। আমার উপার্জনের প্রতিটা পাই-পয়সা তাঁকে দিয়েছি, নিজের জন্যে একটা কপর্দকও রাখি নি।'

'সবই জানি জর্জ, তবু তিনি তোমার মনিব।'

'মনিব! কে আমার মনিব? তাঁকে কে আমার মনিবের আসনে বসিয়েছে? আমার উপর তাঁর কী অধিকার থাকতে পারে? তিনি যতটা লেখাপড়া জানেন, আমি তার চাইতে বেশি জানি। আমি শিখেছি নিজের চেষ্টায়। একটা ঘোড়া যে কাজ করতে পারে, তিনি তার চাইতেও নোংরা কাজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছেন।'

'তোমার কথা শুনে আমার বুক কেঁপে উঠছে জর্জ! তোমাকে আমি কখনো এভাবে বলতে শুনি নি। আমার ভয় হচ্ছে তুমি হয়তো সাংঘাতিক একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবে। জর্জ তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার আর হ্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে তোমার একটু ধৈর্য ধরা উচিত।'

'ধৈর্য আমি সত্যিই ধরেছিলাম এলিজা। কিন্তু রক্তমাংসের শরীরে এর চাইতে বেশি আর সহ্য করা যায় না। মুখ বুজে ভালোভাবে কাজ করে যাওয়া সত্ত্বেও সারাক্ষণ তিনি আমাকে অপমান করেন, নির্যাতন করেন, বোঝার উপর আরো বোঝা চাপিয়ে দেন। তিনি বলেন, আমার মধ্যে নাকি একটা শয়তান আছে। সেই শয়তানটা যেদিন নিজের মূর্তি ধারণ করবে সেদিন আমার আর কিছুই করার থাকবে না।

'আমাদের কী হবে জর্জ?' আর্তস্বরে এলিজা জিজ্ঞেস করল।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে জর্জ বলল, 'এই তো, গতকালেরই ঘটনা। ঘোড়ায়-টানা একটা গাড়িতে আমি পাথর তুলছি আর মনিবের ছেলেটা ঘোড়ার খুব কাছে দাঁড়িয়ে বন্‌বন্‌ শব্দে চাবুক ঘোরাচ্ছে। ঘোড়াটা ভয় পাবে ভেবে আমি তাকে চাবুক ঘোরাতে নিষেধ করলাম। ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে আমাকেই চাবুক মারতে শুরু করল। আমি তার হাত দুটো ধরতেই সে আমাকে লাথি মারতে লাগল। তারপর চেঁচাতে চেঁচাতে বাবার কাছে গিয়ে নালিশ করল, আমি নাকি তার সঙ্গে মারপিট করছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে তার বাবা ছুটে এসে বললেন,

www.alorpathsala.org

"দাঁড়া হারামজাদা, এবার তোকে দেখাচ্ছি কে তোর প্রভু।" তারপর আমাকে একটা গুড়ির সঙ্গে বেঁধে, সেই গাছেরই ডাল থেকে চাবুক বানিয়ে ছেলের হাতে দিয়ে বললেন, "যতক্ষণ পার শুয়োরটাকে চাবকে যাও।" ছেলেটাও বাবার উৎসাহে আমাকে মারতে শুরু করল। এর প্রতিশোধ একদিন আমি নেবই। সেদিন দেখব কে লোকটাকে আমার মনিব বানিয়েছে।

'আমি কিন্তু মনিব বা মনিবানিকে অমান্য করার কথা ভাবতেই পারি না জর্জ।'

'এলিজা, তোমার ব্যাপারটা কিন্তু একেবারেই ভিন্ন। খাইয়ে-পরিয়ে ওঁরা তোমাকে নিজের মেয়ের মতো করে মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন। ওঁরা তোমার ওপর দাবি করতে পারেন, কিন্তু আমার মনিবটি একটা অমানুষ। কার্লো নামে তুমি আমাকে একটু কুকুরছানা দিয়েছিলে, মনে আছে? সারাক্ষণই সে আমার পেছনে পেছনে ঘুরঘুর করত, আমার সঙ্গে শুয়ে থাকত। মাঝে মাঝে এমনভাবে আমার মুখের দিকে তাকাত যেন আমার দুঃখকষ্ট সে বুঝতে পারছে। একদিন রান্নাঘরে মাংসের কয়েকটা ছাঁট পড়েছিল, সেগুলো কুড়িয়ে আমি তাকে খাওয়াচ্ছি, এমন সময় মনিব এসে বললেন, তাঁর পয়সায় কুকুরকে খাওয়ানো চলবে না এবং কোনো চাকরকে কুকুর পুষতে দেবেন না। তখন তিনি হুকুম দিলেন আমি যেন কুকুরটার গলায় পাথর বেঁধে পুকুরের পানিতে ফেলে দিই।'

'ও, জর্জ; তুমি নিশ্চয়ই তা কর নি!'

'আমি করি নি, কিন্তু উনি আর ওঁর ছেলে করেছিল। বেচারি কার্লো যতবার পানি থেকে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছিল, ওঁরা দুজনে ততবারই ঢিল মেরে তাকে ডুবিয়ে দিচ্ছিল। উঃ, তখন যে আমার কী কষ্ট হচ্ছিল তোমাকে বলে বোঝাতে পারব না! আমি নিজে কুকুরটাকে ডুবিয়ে মারি নি বলে সেদিনও আমাকে চাবুক খেতে হয়েছিল। আমার মনিবটা যে কী নিষ্ঠুর তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। গত কয়েকদিন ধরে উনি বলতে শুরু করেছেন এখানে আমার বিয়ের অনুমতি দিয়ে খুব ভুল করেছেন। কেননা তিনি মিস্টার শেলবি আর মিসেস শেলবি বা ওঁদের মতো উদারচেতা মানুষদের ঘৃণা করেন। উনি চান না আমি এখানে আসি বা তোমার সঙ্গে দেখা করি। ওনার ইচ্ছে ক্রীতদাসী মিনার সঙ্গে আমার বিয়ে দেন।'

এলিজা শিউরে উঠল। 'না, না, তা কী করে সম্ভব জর্জ! একবার তো আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে?'

'তুমি কি জানো না ক্রীতদাসরা কখনো বিয়ে করতে পারে না? এ দেশে ক্রীতদাস-দাসীদের বিয়ে আইনসিদ্ধ নয়। মনিবরা চাইলে যেকোনো মুহূর্তে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারি। সেই জন্যে বলছিলাম, এলিজা, এ পৃথিবীতে না জন্মালেই বোধহয় ভালো হতো।'

'না না ও কথা বল না, জর্জ!' এলিজার দুচোখ বেয়ে পানি নেমে এল; কিন্তু এই দুঃসময়ে জর্জের মনকে সে আর ভারাক্রান্ত করে তুলতে চাইল না। তাছাড়া গিন্নিমা যখন কথা দিয়েছেন, তখন হ্যারিকে ওঁরা নিশ্চয়ই বিক্রি করবেন না।

'কেঁদ না এলিজা, লক্ষ্মীটি!' বিষণ্ণতার মধ্যেই জর্জ এলিজাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল, 'আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।'

'তুমি কোথায় যাচ্ছ, জর্জ?'

'কানাডায়। ইচ্ছে আছে সেখানে গিয়ে তোমাকে কিনে নেবার। আশা করি তোমার মনিব তাতে রাজি হবেন।'

'কিন্তু জর্জ পালাতে গিয়ে তুমি যদি ধরা পড়?'

'ধরা আমি কিছুতেই পড়ব না এলিজা। হয় এই দাসত্ব থেকে মুক্তি পাব, নয়ত মরব। জীবিত অবস্থায় ওরা আমাকে কোনোদিনই ধরতে পারবে না।' জর্জের কথা শুনে এলিজার বুক কেঁপে উঠল। তবু এ কথাটাও সে স্পষ্ট বুঝতে পারল। জর্জ একবার যখন মনস্থির করে ফেলেছে তখন আর কোনোমতেই ওকে ফেরানো যাবে না। তাই সজল চোখে সে কাতর মিনতি জানাল, আমাদের মুখ চেয়ে তুমি খুব সতর্ক থেকো, জর্জ রাগের মাথায় যেন হঠাৎ কিছু করে বসো না।'

'তোমার কোনো ভয় নেই এলিজা। আমি পালাবার সমস্ত পরিকল্পনা পাকা করে রেখেছি। আমার কয়েকজন বন্ধু এ-ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে। আর দু-সপ্তাহের মধ্যে সবাই দেখবে আমি নিরুদ্দিষ্ট মানুষদের একজন হয়ে গেছি। আমার হয়ে তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর এলিজা, বিদায়।'

'বিদায়, জর্জ।'

মুহূর্তের জন্যে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল, যেন বলতে চাইছে আবার আমাদের দেখা হবে। তারপর সজল-চোখে দুজন দুজনের কাছ থেকে বিদায় নিল।

চার

টম কাকার কুঠরি : একটি সন্ধ্যা

মনিবের বাড়ির উঠোনের পাশেই চাকরদের জন্যে সম্পূর্ণ আলাদা থাকার জায়গা। এখানেই টমের কাঠের কুঠরি। কুঠরির সামনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক টুকরো বাগান। তাতে সারা বছরই স্ট্রবেরি, সারবেরি থেকে শুরু করে নানা ধরনের ফল আর শাকসবজি

ফলে। ফটকের সামনে গাঢ় বেগুনি রঙের ঝাঁকড়া একটা বিগোনিয়া। বেড়ার চারপাশ ঘিরে মাল্টিফ্লোরা, মেরিগোল্ড, পিটুনিয়া, ফোরওক্লক, অজস্র ফুলের মেলা।

কুঠরির ভেতরটাও ঝকঝকে তকতকে। টমের স্ত্রী ক্লোর নিপুণ হাতে সবকিছুই সুন্দর করে সাজানো-গোছানো। একপাশে তক্তপোশের ওপর ধবধবে সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা বিছানা। অন্যদিকে, তাপচুল্লির পাশে, পায়া ভাঙা একটা টেবিল আর গোটা দুয়েক চেয়ার। এই অংশটাই টমের কুঠরির বৈঠকখানা। বিছানার উল্টো দিকে, দেয়াল ঘেঁষে চওড়া একটা বেঞ্চি। বেঞ্চির নিচে মস আর পেট তাদের বছরখানেকের ছোট ভাইটাকে নিয়ে হুড়োহুড়ি করছে। দেয়ালে টাঙানো রয়েছে জেনারেল ওয়াশিংটনের বেশ বড় একটা প্রতিকৃতি।

মিস্টার শেলবির পরিবারে ক্লো একজন রাঁধুনি। এমন কোনো রান্না নেই যা ওর অজানা। এবং সবরকম রান্নাতে সত্যিই ওর তুলনা হয় না। বারান্দার রান্নাঘরে এখন কেক তৈরির কাজে ব্যস্ত রয়েছে সে।

মিস্টার শেলবির সবচাইতে বিশ্বস্ত ক্রীতদাস, আমাদের এই গল্পের নায়ক, টম। ছেলেরা সবাই যাকে টম চাচা বলে ডাকে। সে এখন শ্লেটে অত্যন্ত ধৈর্য ধরে ইংরেজি বর্ণমালা লেখা অভ্যাস করছে। টম দীর্ঘদেহী। তার চওড়া বুক আর উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের পাথরে খোদা বলিষ্ঠ চেহারা প্রকৃত একজন আফ্রিকান মানুষের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নম্রতা মেশানো অদ্ভুত একটা সরল গাম্ভীর্য জড়ানো রয়েছে তার সারা মুখে। টমের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে বছর তের বয়েসের ভারি চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার একটি কিশোর। টমের ভবিষ্যৎ মনিব, জর্জ শেলবি। তার কোমল মুখের অভিব্যক্তিতে বয়স্ক শিক্ষকদের মতো কপট একটা গাম্ভীর্য।

'উঁহ, ওভাবে নয়, টম চাচা, ওভাবে নয়! একটুও হচ্ছে না ...' জি-এর লেজটাকে উল্টো দিকে দিয়ে ঘোরাতে দেখে জর্জ দ্রুত বলে উঠল, 'জি না হয়ে ওটা তোমার 'কিউ' হয়ে গেছে।'

তারপর টমের হাত থেকে পেনসিলটা নিয়ে কীভাবে 'জি' লিখতে হয় শিখিয়ে দিতে লাগল।

ভিতরে ঢুকে ক্লো অপাঙ্গে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাস্টারমশাই দেখিয়ে দিলে কী হবে, ছাত্রের একটুও উন্নতি হচ্ছে না। এখন বইপত্তর রেখে দিয়ে এইটুকু খেয়ে নাও তো, মাস্টার জর্জ।'

ধোঁয়া-ওঠা গরম কেকের পাত্রটা ক্লো টেবিলের ওপর রাখল।

'কিন্তু এখন এসব খেলে রাত্তিরে যে আর কিছু খেতে পারব না।' দ্বিধা জড়ানো স্বরে জর্জ বলল।

মিষ্টি হেসে ক্লো বলল, 'তা হোক। আমি জানি ক্লো-কাকির হাতের তৈরি কেক তোমার পছন্দ। এটুকু খেলে কিচ্ছু হবে না।'

এতটুকু দ্বিরুক্তি না করে জর্জ রেকাবিটা টেনে নিল। ছুরি দিয়ে কেটে কেকটাকে কয়েকটা অংশে ভাগ করতে দেখে ক্লো হা-হা করে উঠল। 'না না, ওদের দিতে হবে না। তুমি খাও।'

'তা হয় না, কাকি। ছোটদের না দিয়ে আমি একা বুঝি খেতে পারি!'

ক্লোর শত নিষেধ সত্ত্বেও জর্জ আধখানা কেকই মস আর পেট-এর মধ্যে ভাগ করে দিল। ওরা তখন বেঞ্চির তলা ছেড়ে পায়া ভাঙা টেবিলটার নিচেই হুড়োহুড়ি করছিল।

কৃত্রিম রাগে টেবিলের নিচে লাথি চালিয়ে ক্লো হুঙ্কার ছাড়ল, 'এই কালো ভূত কোথাকার, দেখতে পাচ্ছিস না তোদের মনিব এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে? যা, বেরিয়ে যা সব ঘর থেকে। মুখভর্তি থাকা অবস্থাতেই জর্জ বলল, 'আঃ ক্লো চাচি, ওরা ছোট, কেন ওদের মিছিমিছি এভাবে বকছ?'

'তুমি জানো না মাস্টার জর্জ, ছোট হলে কী হবে, ওগুলো এক-একটা রামবিচ্ছু। যত দাও না কেন, খিদে ওদের আর কিছুতেই মিটবে না। তারপর হঠাৎ বাচ্চাগুলোর দিকে ফিরে ক্লো আবার ধমক লাগাল। 'কিরে, এখনো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস? শিগগির বেরিয়ে যা বলছি। নইলে মাস্টার জর্জ চলে যাবার পর তোদের জামার বোতামঘর ঠিক নিচে নামিয়ে দেব।'

জামার বোতামঘর নিচে নামিয়ে দেয়ার মধ্যে ভয়ঙ্কর রকমের কোনো আতঙ্ক জড়ানো আছে কিনা স্পষ্ট বোঝা না গেলেও, বাচ্চা-দুটো কিন্তু সুড়সুড় করে বাইরে বেরিয়ে গেল। ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিয়ে ক্লো বসল টমের পাশে হাত ভাঙা চেয়ারটায়।

জর্জ বলল, 'জানো ক্লো চাচি, তোমার কেকে এমন সুন্দর একটা রঙ হয় যা আমি আর কোথাও দেখি নি।'

ক্লো ঠোঁট টিপে মুচকি হাসল, 'হবেই তো, রাঁধুনি হিসেবে কি আমার কম নাম-ডাক?'

'তবে টম লিনকন কী বলে জানো তো ক্লো চাচি?'

'কী?'

'ও বলে রাঁধুনি হিসেবে জিনি নাকি তোমার চাইতেও ভালো।'

'আরো রাখো তো তোমার টম লিনকনের কথা। জিনিকে যে আমি নিজে হাতে রান্না শিখিয়েছি, সে খবর তো আর টম লিনকন জানে না। জিনি পারবে আমার মতো পেস্টি রাঁধতে, যা মুখে দিলেই গলে যায়?'

'হ্যা, তা অবশ্য সত্যি।' জর্জের ঠোঁটের প্রান্তে ফুটে উঠল দুষ্টুমির হাসি। আমিও টম লিনকনকে তাই বলেছি। আমার ক্লো চাচির হাতে পাই খেলে কোনোদিন ভুলতে পারবি না।'

'তুমি তাই বলেছ বুঝি?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে, এবার একদিন মাস্টার লিনকনকে চিকেন পাই করে খাওয়াব।'

'তুমি তাই করো তো। সামনের সপ্তাহেই ওকে একদিন আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করব। সেদিন তুমি এমন ভালো করে চিকেন পাই বানাবে না ক্লো চাচি, যা খেয়ে ও দিন-পনেরো আর নড়তে না পারে।'

জর্জের বলার ভঙ্গিতে ক্লো হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল, টমও না হেসে পারল না। জর্জের স্বভাবটা হয়েছে ঠিক ওর মার মতো। যেমন হাসিখুশি, তেমিন সরল। মিষ্টি স্বভাবের জন্যেই ছোটবড় সবাই ওকে অসম্ভব ভালোবাসে। হাসি ঠাট্টা আর গল্প-গুজবে ওর সন্ধ্যেগুলো কেটে যায় টমকাকার কুঠরিতেই।

এমনি একসন্ধ্যায় টমকাকার কুঠরিতে যখন ওইসব ঘটছে, মনিবের নিভৃত বৈঠকখানায় তখন ঘটে চলেছে সম্পূর্ণ অন্য এক দৃশ্য।

দাসব্যবসায়ী আর মিস্টার শেলবি, টেবিলের দুপ্রান্তে দুজন বসে রয়েছেন। টেবিলের ওপর ছড়ানো রয়েছে কাগজপত্র আর খেলার সরঞ্জাম।

তোড়া থেকে স্বীকৃতিপত্রগুলো বেছে নিয়ে মিস্টার শেলবি প্রথমে গুনে দেখলেন, তারপর সেগুলো এগিয়ে দিলেন হ্যালির দিকে। হ্যালিও সেগুলো খুব সাবধানে একটা একটা করে গুনল।

'হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবার অনুগ্রহ করে এগুলো সই করে দিন।'

বিক্রয়-দলিলগুলো দ্রুত টেনে নিয়ে শেলবি এমনভাবে সই করে সেগুলো ফিরিয়ে দিলেন যেন এই জঘন্য ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি মেটে ততই ভালো। পুরনো একটা থলি থেকে রীতিমতো জীর্ণ হয়ে আসা চামড়ার কাগজখানায় একবার করে হ্যালি এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নিল, তারপর বাড়িয়ে দিল শেলবির দিকে। শেলবি নিতান্ত হেলা ভরেই সেটা গ্রহণ করলেন।

মিছিমিছি আর অপেক্ষা না করে হ্যালি উঠে পড়ল। 'যাক, কাজটা তাহলে মিটল!' অনেকটা স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শেলবি বললেন, 'হ্যাঁ, মিটল।'

'মনে হচ্ছে আপনি তেমন খুশি হতে পারেন নি?'

'হ্যালি, আশা করি তুমি নিশ্চয়ই তোমার প্রতিশ্রুতির কথা মনে রাখবে। টমকে অন্য কোথাও বিক্রি করার আগে অবশ্যই খোঁজ নেবে লোকটা কেমন। তুমি বিশ্বাস করো, নিতান্ত বাধ্য না হলে টমকে আমি সত্যিই বিক্রি করতাম না।'

'নিতান্ত বাধ্য না হলে আমি নিগ্রোদের ওপর কখনো খারাপ ব্যবহার করি না। তবে কথা যখন দিয়েছি টমকে বেচার সময় নিশ্চয় কোনো ভালো লোকের কাছেই বেচব।'

হ্যলির এই আশ্বাসবাণী সত্ত্বেও শেলবি এতটুকুও স্বস্তি পেলেন না। তাই হ্যালি নীরবে বিদায় নেবার পরেও একটা চুরুট ধরিয়ে তিনি দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ বসে রইলেন।

পাঁচ

মিসেস শেলবি

সেদিন রাতে মিস্টার আর মিসেস শেলবি তাঁদের শোবার ঘরে ফিরে এসেছেন। মিস্টার শেলবি বড় একটা চেয়ারে আরাম করে গা এলিয়ে বসে বিকেলের ডাকে আসা চিঠিগুলো

গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছেন। মিসেস শেলবি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জট পাকিয়ে যাওয়া বিনুনিটা আস্তে আস্তে খুলছেন। হঠাৎ এলিজার কথাগুলো মনে পড়ে যাওয়ার স্বামীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন,

'আচ্ছা আর্থার, ওই লোকটা কে?'

'ওর নাম হ্যালি। আমার পরিচিত।' চিঠি থেকে চোখ না তুলেই মিস্টার শেলবি জবাব দিলেন।

'হ্যালি! কই, ওর নাম তো কখনো শুনি নি? কী করে লোকটা? এখানে কেন এসেছিল?'

'গতবার যখন ন্যাচস্-এ ছিলাম ব্যবসায়িক কাজেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল।'

'আর সেই সূত্রেই ও তোমার সঙ্গে এখানে দেখা করতে এসেছে, খাওয়া-দাওয়া করেছে?'

শেলবি কিছুটা বিরক্ত বোধ করলেন। 'আমিই ওকে নিমন্ত্রণ করেছিলাম। ওর সঙ্গে আমার জরুরি কিছু কাজ ছিল।'

স্বামীর মনোভাব লক্ষ করেই মিসেস শেলবি প্রশ্ন করলেন, 'লোকটা কি দাস-ব্যবসায়ী?'

'কী করে বুঝলে?' শেলবি অবাক হয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন।

'এমনিই বলছি। বিকেলে এলিজা কাঁদতে কাঁদতে এসে বলল, তুমি বৈঠকখানায় একজন দাসব্যবসায়ীর সঙ্গে কথা বলছ। ও শুনেছে তুমি নাকি ওর হ্যারিকে তার কাছে বিক্রি করে দিতে চাইছ।'

'ও বলেছে বুঝি?' হালকাভাবে কথাটা বলেই শেলবি খুব মন দিয়ে একটা চিঠি পড়ার ভান করলেন। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই তিনি বুঝতে পারতেন চিঠিটা উল্টো দিকে ধরা রয়েছে।

চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে মিসেস শেলবি বললেন, 'আমি এলিজাকে বলেছি ও নিয়ে অত মাথা ঘামাতে হবে না। তুমি সাধারণত চাকর-বাকরদের কখনো বিক্রি করো না। বিশেষ করে অমন একটা অসভ্য লোকের কাছে তো নয়ই।'

'এতোদিন আমি নিজেও তাই ভাবতাম, এমিলি।' নিজের মনকে প্রস্তুত করে নিয়ে শেলবি বললেন, 'কিন্তু কিছুদিন ধরে আমার ব্যবসার অবস্থা এমন খারাপ যাচ্ছে যে দু-একটা চাকরকে না বেচে আমার আর কোনো উপায় নেই।'

'ওই জানোয়ারটার কাছে? অসম্ভব! তুমি ঠাট্টা করছ না তো, আর্থার?'

'না, এমিলি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গেই তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমি টমকে বিক্রি করতে রাজি হয়েছি।'

মিসেস শেলবি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, 'কী বলছ তুমি! আমাদের টমকে? ছোটবেলা থেকে যে তোমাকে মানুষ করেছে। অমন বিশ্বাসী, এতো দিনের পুরনো একটা চাকরকে তুমি বিক্রি করে দেবে! অথচ তুমি তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে মুক্তি দেবে। আমিও বহুবার তাকে সে কথা বলেছি। এখন আমি আর কিছুই অবিশ্বাস করতে পারছি না,

আর্থার! আমার ধারণা তুমি হয়তো এলিজার একমাত্র সন্তান হ্যারিকেও বিক্রি করে দিতে পারো।'

'তুমি যখন সবই জানতে পেরেছ, তখন আর তোমার কাছে লুকিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি টম আর হ্যারি, দুজনকেই বিক্রি করে দিতে রাজি হয়েছি। কিন্তু একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না এমিলি; সবাই প্রতিদিন যে কাজ করছে শুধু আমার বেলায় তুমি এমন একটা ভাব করছ যেন আমি কত অপরাধী।'

'কিন্তু আরো অনেকে তো ছিল? যদি নিতান্তই বিক্রি করতে বাধ্য হও, তবে অন্য কাউকে না বেচে ওদের দুজনকে বিক্রি করতে গেলে কেন?'

'যেহেতু ওদের দুজনকে বিক্রি করে বেশ দাম পাওয়া যাবে, অন্য কাউকে বেচলে সে দাম পাওয়া যেত না। লোকটা এলিজার জন্যও অনেক টাকা দিতে চেয়েছিল।'

'আচ্ছা শয়তান তো।'

'কিন্তু আমি তোমার কথা ভেবেই রাজি হই নি।'

'ধন্যবাদ, আর্থার!' বেদনায় মিসেস শেলবির গলার স্বর ভারী হয়ে উঠল। 'কিন্তু তুমি বিশ্বাস করো, টমের মতো এমন মহৎ হৃদয় আর একজন বিশ্বাসী চাকরকে ছেড়ে দিতে সত্যিই আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি জানো না, আমাদের জন্যে ও নিজের জীবনকেও বির্সজন দিতে পারে।'

'আমি জানি, এমিলি। কিন্তু এ-ছাড়া সত্যিই আমরা আর অন্য কোনো উপায় ছিল না।'

'কিন্তু আমি এখন ওদের কাছে কেমন করে মুখ দেখাব? কেমন করে বলব যে এতদিন যে শিক্ষা দিয়েছি সে সবই ভুল ... ভালোবাসা আর মানবতার কোনো মূল্য নেই ... সামান্য কটা টাকার কাছে সে সবই তুচ্ছ, অর্থহীন!' মিসেস শেলবির মসৃণ চিবুক বেয়ে নেমে এসেছে অশ্রুধারা।

'এতদিন আমি এলিজাকে বুঝিয়েছি খ্রিস্টধর্ম বিশ্বাসী মা হিসেবে তার কর্তব্য হ্যারির প্রতি যত্ন নেয়া, তার হয়ে প্রার্থনা করা, তাকে মানুষ করা। আমি ওকে বহুবার বলেছি টাকার চাইতে মানুষ অনেক বড়। সেই এলিজার বুক থেকে এতটুকন দুধের বাচ্চাকে ছিনিয়ে নিয়ে আমরা যদি অসভ্য একটা লোকের কাছে বিক্রি করি, তাহলেই বা অন্যান্য চাকরবাকররা আমাদের কী ভাববে আর আমিই বা কেমন করে ওদের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াব তুমি বলো?'

'সত্যিই আমি দুঃখিত এমিলি, যদিও তোমার ভাবনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত নই, তবু তোমার অনুভূতিগুলোকে কিছুতেই শ্রদ্ধা না করে পারছি না। এইসব কারণেই আমি তোমাকে কিছু বলতে চাই নি, কিন্তু এখন না বলে পারছি না। সত্যিই এ-ছাড়া আমার আর অন্য কোনো উপায় ছিল না। হয় ওদের দুজনকে বিক্রি করতে হতো, নয়ত সমস্ত সম্পত্তি হাত ছাড়া হয়ে যেত। হ্যালি আমার বন্ধকী সম্পত্তি অধিকার করার জন্যেই এখানে এসেছিল। ওর প্রস্তাবে রাজি না হলে সম্পত্তির সঙ্গে প্রতিটা চাকর-বাকরকেও হারাতে হতো।'

মিসেস শেলবি এতক্ষণ বজ্রাহতের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন, স্বামীর শেষ কথাগুলোয় দুহাতে মুখ ঢেকে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন, 'হা ঈশ্বর এখন আমি কী

করব! এ পাপ! এমন জানলে আমি কোনোদিনই কোনো ক্রীতদাস রাখতাম না। অন্তত এলিজার ছেলেটাকে বাঁচানো যেত ...'

'থাকলেও কোনো লাভ হতো না, এমিলি। আমার সই করা দলিল এখন রয়েছে হ্যালির হাতে। লোকটার যে কী লোভ তুমি তা কল্পনাও করতে পারবে না। টাকার জন্যে ও নিজের মাকে পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে পারে।'

'উঃ, মানুষ যে কী করে এতো নিষ্ঠুর হতে পারে!'

'এমিলি, এখন আর ওসব ভেবে কোনো লাভ নেই। হ্যালি কাল সকালে এসে ওদের দুজনকে নিয়ে যাবে। আমি খুব ভোরে উঠে ঘোড়ায় চড়ে কোথাও চলে যাব। তুমিও এলিজাকে নিয়ে গাড়িতে করে দূরে কোথাও বেড়াতে যেও। ওর অসাক্ষাতেই ব্যাপারটা ঘটা ভালো।'

'না না, এই অমানুষিক বর্বরতার মধ্যে তোমরা আর আমাকে টেনো না! আমি বরং গিয়ে টমের সঙ্গে দেখা করব। চরম বেদনার মুহূর্তে ওরা দেখুক আমিও ওদের সঙ্গে রয়েছি, ওদের ব্যথাকে অনুভব করতে পারছি। আর এলিজার কথা ভাবতেই আমার বুকের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে উঠছে! আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি, আজ আমরা যে অপরাধ করলাম, এর জন্যে ঈশ্বর আমাদের কোনোদিনই ক্ষমা করতে পারবেন না।'

মিস্টার আর মিসেস শেলবি ভাবতেই পারেন নি যে অলক্ষে দাঁড়িয়ে কেউ ওঁদের কথাবার্তা শুনবে।

সেদিন একটু তাড়াতাড়িই মিসেস শেলবি এলিজাকে রাতের মতো বিদায় দিয়েছিলেন। কিন্তু এলিজা নিজের ঘরে ফিরে না গিয়ে পিছনের দিকের বারান্দা থেকে ওঁদের শোবার ঘরের দরজায় কান পেতে রেখেছিলেন। ছেলের প্রতি উদ্বিগ্ন মনই তাকে এই গর্হিত কাজ করতে বাধ্য করেছিল।

রাতের নিস্তব্ধতায় ওঁদের কোনো শব্দই তার কান এড়িয়ে যায় নি। তাই বিহ্বল আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে সে একসময় চোরের মতো নিঃশব্দ-পায়ে ফিরে এল। তার নম্র-লাজুক চেহারায় তখন এমন অদ্ভুত এক পরিবর্তন ঘটে গেছে যে, হঠাৎ দেখলে কেউ তাকে চিনতেই পারবে না। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে এলিজা নিজের ঘরে প্রবেশ করে সোজা বিছানার দিকে এগিয়ে গেল, বিছানায় ঘুমন্ত ছেলের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে সে বলল, 'সোনামণি, ওঁরা তোমাকে বিক্রি করে দিয়েছেন! তবু তোমার মা যেভাবে হোক তোমাকে বাঁচাবেই!'

তার চোখে জলের কোনো চিহ্ন নেই। যেন হৃদয়ের উৎসধারা থেকে যদি এখন কিছু ঝরে পড়ে তা অশ্রু নয়, রক্তের ফোঁটা।

দ্রুত হাতে এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে এলিজা লিখল, "মাননীয়া গৃহকর্ত্রী, অনুগ্রহ করে আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না, বা অকৃতজ্ঞ ভাববেন না। আজ রাতে কর্তার সঙ্গে আপনার আলোচনা আমি সবই শুনেছি। আমার প্রিয় সন্তানকে বাঁচাবার জন্যেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। আপনি আমাকে দোষী করবেন না! আপনার মহানুভবতার জন্যে ঈশ্বর আপনার নিশ্চয়ই মঙ্গল করবেন।"

কাগজটা ভাঁজ করে তার ওপর মিসেস শেলবির নাম লিখে চিঠিটা সে টেবিলের ওপর রেখে দিল। তারপর টানা খুলে কয়েকটা পোশাক বার করল। পোশাকগুলো বড় একটা

রুমালে জড়িয়ে পুঁটলিটা শক্ত করে বেঁধে নিল কোমরের কাছে। বিহ্বল সেই আতঙ্কের মুহূর্তেও এলিজা হ্যারির প্রিয় খেলনাগুলো নিতে ভুলল না। ওর সব চাইতে প্রিয় ছিল রঙিন একটা টিয়া। এলিজা বহুকষ্টে ছেলের ঘুম ভাঙিয়ে সেই রঙিন কাঠের টিয়াটা হ্যারির হাতে দিল। হ্যারি জড়ানো চোখে টিয়াটিকে নিয়ে খেলতে লাগল। এই অবকাশে এলিজা পোশাক পাল্টে গায়ে একটা শাল জড়িয়ে নিল। তারপর হ্যারির কোট আর টুপি হাতে মাকে বিছানার দিকে এগিয়ে আসতে দেখে সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ, মা?'

'চুপ চেঁচিও না; সবাই শুনতে পাবে।' চাপাস্বরে এলিজা বলল, 'একটা দুষ্টু লোক আমার হ্যারিসোনাকে তার মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নেবার মতলব করেছে। কিন্তু তার মা তাকে কিছুতেই ছিনিয়ে নিতে দেবে না। তাই জামা-কাপড় পরে আমরা অনেক দূরে পালিয়ে যাব, যাতে সেই দুষ্টু লোকটা আর ধরতে না পারে।'

কথা বলতে বলতেই এলিজা ছেলের পোশাক পরানো শেষ করে তার কোটের বোতামগুলো ভালো করে এঁটে দিল, কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'একদম শব্দ করবে না!' তারপর ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে বাইরের বারান্দার দিকের দরজা খুলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে শীতের হিমরাত্রি। আকাশে ঝলমল করছে অজস্র নক্ষত্র। এলিজা ছেলের গায়ে শালটা ভালো করে জড়িয়ে দিল। অজানা একটা আতঙ্কে হ্যারি মায়ের গলাটা আঁকড়ে ধরে চুপটি করে পড়ে রইল।

বারান্দার শেষপ্রান্তে প্রকাণ্ড একটা নিউফাউন্ডল্যান্ড কুকুর শুয়ে ছিল। এলিজার পায়ের পায়ের শব্দ পেতেই সে চাপা গর্জন করে উঠল। এলিজা মৃদুভাষায় তাকে ধমক দিল, 'এই ব্রুনো, চুপ!'

কুকুরটা তখন লেজ নাড়তে নাড়তে নিঃশব্দে ওদের অনুসরণ করল।

একটু পরে এলিজা টম চাচার কুঠরির সামনে এসে পৌঁছল এবং খুব আস্তে আস্তে জানালার সার্সিতে টোকা দিল।

নৈশ-উপাসনার জন্যে টমের বরাবরই শুতে বেশ দেরি হয়। সেদিনও টম বা তার স্ত্রী তখনো কেউ ঘুমোয় নি।

'কে?' তাড়াতাড়ি পর্দা সরিয়ে ক্লো জানালা দিয়ে মুখ বাড়াল। 'ওমা লিজি এতো রাত্রিতে কী ব্যাপার? সঙ্গে ব্রুনোও রয়েছে দেখছি!'

দরজা খুলে দিতেই মোমবাতির আলোর একটা রেখা গিয়ে পড়ল পলাতকার বিস্ফারিত দুটো চোখ আর তার ম্লান মুখখানার ওপর।

ওকে দেখে টম উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, 'কী হয়েছে, লিজি! তুমি কি অসুস্থ?'

'টম চাচা ক্লো কাকি-হ্যারিকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাচ্ছি। কর্তা ওকে বেচে দিয়েছেন।'

'বেচে দিয়েছেন!' দুজনে প্রায় একইসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল।

'হ্যাঁ, টম চাচা। শুধু হ্যারি নয়, তার সঙ্গে ওঁরা তোমাকেও একজন দাস-ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দিয়েছেন। আমি নিজে দরজায় কান পেতে শুনেছি। কাল ভোরে মনিব ঘোড়ায় চড়ে কোথাও চলে যাবেন আর সেই সময় লোকটা তোমাদের নিতে আসবে।'

এতক্ষণ টম স্বপ্নাবিষ্টের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে এলিজার কথাগুলো শুনছিল। কিন্তু কথাগুলো বোধগম্য হতেই সে চেয়ারে বসে পড়ল, মাথাটা নুয়ে এল বুকের কাছে।

'ঈশ্বর আমাদের কৃপা করুন!' আর্তস্বরে ক্লো বলে উঠল। 'না না, এ কখনো সত্যি হতে পারে না! ও কী এমন অন্যায় করেছে যে কর্তা ওকে বেচে দেবেন?'

'টম চাচা কোনো অন্যায় করে নি। উনি তার জন্যে বেচেন নি। উনি বা গিন্নিমা আমাদের কাউকেই বেচতে চান না। গিন্নিমা চোখের জলে অনেক কাকুতি মিনতি করছিলেন, কিন্তু কর্তা বললেন যে এ-ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় নেই। লোকটার কাছে কর্তার এতো দেনা হয়েছে যে টম চাচা আর হ্যারিকে বিক্রি না করলে কর্তার ঘরবাড়ি, জায়গা-জমি, এমন কি সমস্ত চাকর-বাকররাও ওই ব্যবসায়ী লোকটার খপ্পরে গিয়ে পড়ত। কর্তার কোনো ইচ্ছে ছিল না, শুধু ওই শয়তান লোকটার জন্যেই উনি এ কাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। আর গিন্নিমার কথা শুনলে তোমাদের চোখ ফেটে জল আসত! আমি জানি এভাবে হ্যারিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না ... এ অন্যায় ... কিন্তু আমি মা, আমার বুক থেকে কেউ ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, আমি কেমন করে সহ্য করব বলো?'

'টম তুমিও পালিয়ে যাও', ক্লো বলল। 'না হলে নদীর ওপারে নিয়ে গিয়ে তোমাকে না খেতে দিয়ে সারাদিন খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলবে। তোমার তো যখন যেখানে খুশি যাবার ছাড়পত্র আছে, তুমিও বরং লিজির সঙ্গে পালিয়ে যাও। এখনো সময় আছে, আমি তোমার জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে দিচ্ছি।'

ধীরে ধীরে মাথা তুলে বিষণ্ন অথচ স্থির দৃষ্টি মেলে টম স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। 'তা হয় না ক্লো। আমি যাব না। লিজি যাক। ওর যাবার অধিকার আছে। কিন্তু আমি যেতে পারি না। শুনলে না, কর্তা বলেছেন, আমাদের না বেচলে ঘর-বাড়ি, জায়গা-জমি, এমন কি চাকর-বাকররাও সব ওই লোকটার খপ্পরে গিয়ে পড়বে? ইচ্ছে না থাকলেও উনি একাজ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই তুমি ওঁকে দোষী করো না ক্লো। বরং আমি চলে যাবার পরেও উনি তোমার আর বাচ্চাগুলো ...'

এই পর্যন্ত বলে টম আর কিছু বলতে পারল না। শয্যায় নিদ্রাতুর সন্তানগুলোর দিকে তাকিয়ে তার বুক গভীর বেদনায় ভরে ওঠে। দুহাতে মুখ ঢেকে সে অস্ফুট যন্ত্রণায় ঢুকরে ওঠে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে টুপটাপ করে ঝরে পড়তে থাকে অশ্রুধারা।

এলিজা বলল, 'আজ বিকেলে আমার স্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখনো আমি ব্যাপারটা স্পষ্ট জানতাম না। সেও খুব কষ্টে দিন কাটাচ্ছে। আজই আমাকে বলছিল আর কয়েক দিনের মধ্যে সে কানাডায় পালিয়ে যাবে। যদি পারো একটু কষ্ট করে তাকে একটা খবর দিও। দেখা হলে বলো কেন আমি পালিয়েছি। আরো বলো যে আমিও কানাডায় যাবার চেষ্টা করব। তাকে আমার ভালোবাসা জানিও। আর তার সঙ্গে যদি আমার কখনো দেখা না হয় ... চকিতে মুখ ফিরিয়ে এলিজা কান্নার নিরুদ্ধ আবেগকে চেপে রাখার চেষ্টা করল, তারপর ধরা-ধরা গলায় কোনোরকমে বলল, 'তাকে বলো যে পরলোকে যেন তার দেখা পাই। আর ব্রুনোকে ঘরের ভিতরে ডেকে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দাও, যাতে আমার পিছন পিছন না যায় বেচারি! সত্যি, সত্যি, ওর জন্যেও আমার মায়া হচ্ছে।' চোখের জলে পরস্পরের কাছ থেকে শুভেচ্ছা আর বিদায় জানিয়ে এলিজা হ্যারিকে বুকে চেপে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ছয়

প্রস্তুতি

সেদিন রাতে তর্ক-বিতর্কে অনেকখানি সময় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পরের দিন সকালে মিস্টার আর মিসেস শেলবির ঘুম ভাঙল স্বাভাবিকের চাইতে বেশ খানিকটা বেলায়।

'কী ব্যাপার, আজ এলিজার কী হলো!' বারবার ঘণ্টি বাজিয়েও এলিজার কোনো সাড়া না পেয়ে মিসেস শেলবি অবাক হয়ে ভাবলেন।

মিস্টার শেলবি সাজগোজ করার বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষুর শান দিচ্ছেন, এমন সময় দরজা ঠেলে একটি নিগ্রো কিশোর গরম জলের পাত্র নিয়ে ভিতরে ঢুকল।

মিসেস শেলবি তাকে বললেন, 'অ্যান্ডি, এলিজার ঘরে গিয়ে দেখ তো ও কী করছে। ওকে বলবি সকাল থেকে আমি অনেকবার ডেকেছি।' তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উনি নিজের মনেই বললেন, 'বেচারির আবার অসুখ-বিসুখ করল কিনা তাই বা কে জানে!'

একটু পরেই অ্যান্ডি যখন ফিরে এল, বিস্ময়ে তার চোখের মণি দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে।

'লিজির ঘরের টানাগুলো সব খোলা, জিনিস-পত্তর চারদিকে ছড়ানো। আমার মনে হয় ও পালিয়েছে।'

'আমারও তাই মনে হয়।' মিসেস শেলবির চোখ দুটো যেন সুখে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, 'ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, উনি যেন ওকে সাহায্য করেন।'

'বোকার মতো বলো না।' শেলবি চটে উঠলেন, 'ও যদি সত্যিসত্যিই পালিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে আমার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে একবার ভেবে দেখেছ? হ্যালি প্রথম থেকেই লক্ষ করেছিল আমি হ্যারিকে বিক্রি করতে ইতস্তত করছি। ও ভাববে আমিই বুঝি ষড়যন্ত্র করে এলিজাকে সরিয়ে দিয়েছি। ব্যাপারটা আমার পক্ষে সত্যিই অপমানকর।'

দাড়ি না কামিয়েই শেলবি দ্রুত ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

তারপরই ছুটোছুটি, চিৎকার-চেঁচামেচি, দরজা-জানালা খোলা আর বন্ধ হওয়ার শব্দ। চাকর-বাকররা সব এলিজাকে চারদিকে খুঁজছে। একমাত্র ক্লো, যে হয়তো এ ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত করতে পারত, এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিজেকে নীরব রেখে প্রাতরাশের কাজে ব্যস্ত রয়েছে, যেন সে কিছুই জানে না। সবসময় হাসিখুশি থাকত যে মুখখানা, আজ তাতে ঘনিয়ে উঠেছে বিষাদের গাঢ় ছায়া। ব্যাপারটা ও আগেই আঁচ করতে পেরেছিল, তাই পালিয়েছে।

অবশেষে হৈ-হট্টগোলের মধ্যেই হ্যালি এসে হাজির হলো। গায়ে অশ্বারোহীর পোশাক, পায়ে কাঁটাওয়ালা বুট, হাতে ঘোড়ায় চড়ার চাবুক। সব শুনে তার মেজাজ হয়ে উঠল একেবারে তিরিক্ষি। দাঁতে দাঁত ঘষে, চাবুক দোলাতে দোলাতে সে বলল, 'শয়তান দুটোকে ধরতে পারলে একবার দেখাতাম মজা!'

'ওদের তুমি আর ধরতে পারবে না চাঁদ।' ঝকঝকে সাদা দাঁতে হাসতে হাসতে অ্যান্ডি এমন ভাবে কথাগুলো বলল যাতে হ্যালি শুনতে না পায়।

'কী ব্যাপার, মিস্টার শেলবি ...' রীতিমতো উত্তেজিতভাবে ভিতরের বসার ঘরটায় ঢুকে হ্যালি বলল, 'মনে হচ্ছে দাসিটা বাচ্চাটাকে নিয়ে কেটে পড়েছে?'

'আঃ আস্তে, মিস্টার হ্যালি! এখানে আমার স্ত্রী রয়েছেন?'

'ক্ষমা করবেন, ম্যাডাম। সত্যিই আমি দুঃখিত।' মিসেস শেলবিকে অভিবাদন জানাল। 'কিন্তু যা শুনছি, কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ! সম্ভবত আগে থেকে বুঝতে পেরে ও বাচ্চাটাকে নিয়ে পালিয়েছে।'

'নাঃ, এ বছর দেখছি ব্যবসার অবস্থাটা সত্যিই একেবারে শোচনীয়।'

'ক্ষতি তোমার চাইতে আমারও কিছু কম হয় নি, হ্যালি। তুমি হারিয়েছে বাচ্চাটাকে, আর আমি হারিয়েছি এলিজাকে।' অনুযোগের সুরে শেলবি বললেন। কিন্তু এখনো সময় আছে, মিছিমিছি মেজাজ খারাপ না করে একটু শান্ত হয়ে বসো। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি এ ব্যাপারে যতরকম সাহায্যের প্রয়োজন আমি করব। আগে প্রাতরাশটা সেরে নাও, তারপর আমার ঘোড়া, কুকুর আর চাকর-বাকর নিয়ে মেয়েটার খোঁজে গেলেই চলবে।'

প্রাতরাশের টেবিল সাজানো হয়েছে কিনা দেখার জন্যে মিসেস শেলবি উঠে পড়লেন।

ততক্ষণ টমকে বিক্রি করে দেয়ার খবর, বিশেষ করে এলিজার পালিয়ে যাওয়ার সংবাদ, আশেপাশের প্রতিটি বাড়ি, এমন কি ক্ষেতে খামারেও ছড়িয়ে পড়েছে। কেননা এ ধরনের ঘটনা সচরাচর এ তল্লাটে বড় একটা ঘটে না।

এলিজাকে খুঁজে বার করার প্রধান দায়িত্ব পড়ল স্যামের ওপর। সবাই তাকে কালো স্যাম বলে ডাকে। সব নিগ্রোরাই কালো। স্যাম আবার তাদের চাইতে তিনগুণ কালো। সবসময়ই হাসিখুশি আর ফুর্তিবাজ। আস্তাবলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে সে নিজের মনেই বলতে লাগল, 'দেখব এবার আমার নাকের ডগা দিয়ে কে পালায়!'

'হেই স্যাম ... স্যাম ...' ছুটতে ছুটতে এসে অ্যান্ডি বলল, 'আমি যদি লিজিকে খুঁজে বার করতে না পারি, সবাই বলবে ব্যাটা কালো নিগ্রোটা নিগ্রোটা কোনো কম্মের নয়।'

'কিন্তু তুই কী বললি ভেবে দেখেছিস একবার?' অ্যান্ডি চোখ বড় বড় করে তাকাল। 'মিসেস চান না লিজি ধরা পড়ুক।'

'হ্যাঁ, তোকে বলেছে।'

'মাইরি, বলছি, তুই বিশ্বাস কর!'

'তুই কেমন করে জানলি?'

'সকালে যখন কর্তার জন্যে দাড়ি কামানোর জল নিয়ে গিয়েছিলাম, মিসেস বললেন, 'দেখত অ্যান্ডি, লিজি কী করছে?' আমি যখন এসে বললাম যে ও পালিয়েছে, ওঁর মুখ দেখে মনে হলো উনি যেন খুব খুশি হয়েছেন। নিজের মনেই বিড়বিড়, করে বললেন, 'ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, উনি যেন ওকে সাহায্য করেন।' তাই বলছিলাম তুই যদি এখন সত্যিসত্যিই লিজিকে ধরার চেষ্টা করিস, মিসেস কিন্তু তোর ওপর খুব রেগে যাবেন।'

'যা বাব্বা, কর্তা বলছে লিজিকে ধরা চাই ... গিন্নিমা লিজিকে ধরতে মানা করছেন।' দার্শনিকের ভঙ্গিতে মাথা চুলকাতে চুলকাতে স্যাম বলল, 'এখন আমি কেমন করে বুঝব রুটির কোন পিঠটাতে মাখন মাখানো রয়েছে।'

'কিন্তু তুই তো জানিস, মিসেস লিজিকে কত ভালোবাসেন। উনি চান না লিজির ছেলেটা হ্যালির মতো বদমাইস কোনো লোকের হাতে গিয়ে পড়ুক। একটু আগেই উনি নিজে আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, 'লিজিকে খুঁজে বার করার জন্যে এতো তাড়াহুড়া করার কো:না দরকার নেই। তোরা যত দেরি করবি, ওর পক্ষে ততই মঙ্গল।'

'উনি তোকে তাই বলেছেন বুঝি?'

অ্যান্ডি স্যামের বুকে হাত ছুঁয়ে বলল, 'মাইরি বলছি, তুইি বিশ্বাস কর!' তবু বীরত্ব দেখানোর ভঙ্গিতে স্যাম হাসতে হাসতে বলল, 'হুঁ বাব্বা, আমার নাকের ডগা দিয়ে কেউ পালাবে, না, তা হবে না!'

স্যামের ভঙ্গি দেখে মনে হলো এ ব্যাপারে ওর অসীম উৎসাহ এবং রীতিমতো গর্বের সঙ্গে ও যেভাবে বিল আর জেরিকে আস্তাবল থেকে ঝড়ের বেগে ছুটিয়ে এনে উঠোনে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে দিল, মনে হলো। কেউ আর ওকে থামাতে পারবে না। কাজেই অন্য একটা খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে হ্যালির ভারি সুন্দর দেখতে কুচকুচে কালো ঘোড়াটা। ঘোড়াটা যেমন তেজি, তেমনি অসম্ভব ছটফটে—কিছুতেই এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না।

'হো হো হো!' স্যাম তার কাছে গিয়ে আদর করে ডাকতেই ঘোড়াটা মসৃণ গ্রীবা বেঁকিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিত তাকাল তার দিকে, 'এতো ছটফট করলে কি হয়? দাঁড়া, আমি তোর জিনটা ঠিক করে দিচ্ছি।'

সামনেই প্রকাণ্ড একটা বিচগাছ ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার সুচালো তিনকোণা ফলগুলো ছড়িয়ে রয়েছে মাটিতে। সবার অলক্ষ্যে একটা বিচফল তুলে নিয়ে স্যাম ঘোড়ার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর আদর করে ঘোড়াটার গায়ে গলায় আস্তে আস্তে চাপড় মারতে লাগল, যেন তাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে। জিনটাকে ঠিক করে বসানোর ছলে সে বিচফলটাকে এমনভাবে জিনের নিচে রেখে দিল, যাতে সামান্য একটু চাপ পড়লেই ঘোড়াটা অস্বস্তি বোধ করবে, অথচ পিঠে কোনো ক্ষতচিহ্ন থাকবে না?'

অ্যান্ডিকে ডেকে সে বলল, 'দেখ তো, জিনটা এবার ঠিক মতো বসানো হয়েছে কিনা?'

এমন সময় মিসেস শেলবিকে সামনের বারান্দায় দেখা গেল। ইশারায় উনি স্যামকে কাছে ডাকলেন, 'কী, তোরা এখনো যাস নি?' বেশ জোরে জোরেই মিসেস শেলবি বললেন, 'আমি যে অ্যান্ডিকে দিয়ে পাঠালাম তাড়াতাড়ি করতে।'

'আমাদের হয়ে গেছে গিন্নিমা।'

'তাহলে আর মিছিমিছি দেরি করিস না, বেরিয়ে পড়। মিস্টার হ্যালিকে পথ দেখিয়ে তোদের সাহায্য করতে হবে।' তারপর গলার স্বর নামিয়ে এনে উনি বললেন, 'গত সপ্তাহে জেরি একটু খুঁড়িয়ে চলছিল। ওকে খুব সাবধানে রাখিস, বাবা। আর ঘোড়াটাকে একদম জোরে ছোটাস না।'

মনিবানির কথাগুলোর প্রকৃত অর্থ বুঝতে স্যামের একটুও অসুবিধে হলো না। অহেতুক জোর দিয়েই সে বলল, 'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, গিন্নিমা। আমি ঠিক মিস্টার হ্যালিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।'

বিচ গাছের ছায়ায় ফিরে এসে স্যাম কুনই দিয়ে অ্যান্ডিকে গুঁতো দিল। 'এবার দেখ না কী রকম মজাটা ঘটে!'

দুজনেই চাপা হাসিতে লুটিয়ে পড়ল।

এমন সময় হ্যালি বারান্দায় বেরিয়ে এল। চমৎকার এক পেয়ালা কফির প্রভাবে তার মেজাজ তখন কিছুটা গা-ঝাড়া। হাসতে হাসতে তাকে নিচে নেমে আসতে দেখেই স্যাম আর অ্যান্ডি মাথায় চড়িয়ে নিল তালপাতার বিশাল দুটো টুপি।

ওদের তৎপরতা দেখেও হ্যালি তাড়া লাগাল, 'জলদি এখন আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করলে চলবে না।'

'না, হুজুর।' স্যাম হ্যালির হাতে লাগাম তুলে দিয়ে চাবুকটা এগিয়ে দিল। অ্যান্ডি তখন অন্য ঘোড়া দুটোকে খুঁটি থেকে খুলছে।

হ্যালি সবে জিনের ওপর চড়ে বসেছে কিনা সন্দেহ, তেজি ঘোড়াটা হঠাৎ স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে উঠল, মনিবকে ছিটকে ফেলে দিল কয়েক হাত দূরে শুকনো ঘাসের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় চওড়া কানওয়ালা তালপাতার টুপিটা ঘঁষে গেল ঘোড়াটার চোখে। এতে তার রুক্ষ মেজাজ আরো তিরিক্ষি হয়ে উঠল। নিমেষে প্রচণ্ড এক ধাক্কায় স্যামকে মাটিতে উল্টে ফেলে দিয়ে পেছনের পা দুটো বারকয়েক শূন্যে ছুড়ল, তারপর মুখের হ্রেষাধ্বনিতে মাঠ ভেঙে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল সামনের বন-বাদাড়ের দিকে।

অ্যান্ডি ইতোমধ্যে বিল আর জেরিকে খুলে দিয়েছিল। কী ভেবে তারাও হ্যালির ঘোড়াটার পেছন পেছন তীরবেগে ছুটতে শুরু করে দিল। ঘোড়াগুলোকে ধরার জন্য স্যাম আর অ্যান্ডি চিৎকার করতে করতে ছুটছে ... কুকুরগুলো ভয়ঙ্করভাবে ডাকছে ... মাইক, মোস, অ্যান্ডি, ফ্যানি, মিস্টার শেলবির অন্যান্য চাকর-চাকরানিরা তখন চারপাশে ভিড় জমিয়ে তামাশা দেখছে—উল্লাসে কেউ চেঁচাচ্ছে, কেউ হাততালি দিচ্ছে, কেউবা হাসতে হাসতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে।

মাঠটা প্রায় আধমাইল লম্বা, তারপর চারদিকেই ক্রমশ ঢালু হতে হতে মিশে গেছে দূরে অরণ্যে। যেন বিপুল আনন্দে অচেনা অরণ্যের টানে ঘোড়াটা ছুটতে ছুটতে অনেক

দূরে চলে গেল, তারপর এক সময় স্থির হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু স্যাম যখন চিৎকার করে তাকে ধরতে গেল, ঘোড়াটা অমনি ঘুরে একলাফে কয়েক হাত দূরে ছিটকে গেল। তার মসৃণ বলিষ্ঠ পেশিতে রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। স্যাম আবার তাকে ধরতে গেল, অমনি দুজনের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ধরা ছোঁয়ার খেলা। স্যাম যত চেঁচাচ্ছে, ঘোড়াটা যেন ততই মজা পেয়ে তাকে নিয়ে সারা মাঠময় ঘুরছে।

এদিকে হ্যালি নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করছে, আর সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই ধমকাচ্ছে। মিস্টার শেলবি বারান্দা থেকে বৃথাই চেঁচিয়ে ওদের পরিচালনা করার চেষ্টা করছেন। মিসেস শেলবি নিজের ঘরের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে এই মজার দৃশ্যটা উপভোগ করে মুচকি মুচকি হাসছে, পরক্ষণেই ভাবছেন হতভাগ্য মেয়েটির অদৃষ্টে কী লেখা আছে কে জানে।

অবশেষে বেলা যখন প্রায় বারোটা, স্যাম জেরির পিঠে চড়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে হ্যালির ঘোড়াটাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। ঘোড়াটার অবস্থা তখন রীতিমতো কাহিল। ঘামে ভিজে উঠেছে সারা দেহ, ঘন ঘন শ্বাস ফেলছে, চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে।

'আমি ধরেছি হুজুর!' বুক ফুলিয়ে স্যাম বলল, 'আমি ছাড়া আর অন্য কেউ আপনার ঘোড়াটাকে ধরতে পারত না।'

তোমার জন্যেই এই কাণ্ডটা ঘটেছে।' চাপা গলায় হ্যালি গর্জে উঠল। আর কেউ হলে এমনটা ঘটত না।'

'আমি? এ আপনি কী বলছেন, হুজুর!' স্যাম যেন গাছ থেকে পড়ল। 'আমারই জন্যে যদি এমন কাণ্ডটা ঘটবে, তাহলে মিছেমিছি ঘেমে নেয়ে মাঠময় ছুটোছুটি করে মরতে যাব কেন আপনিই বলুন?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। এমনিতেই আমাদের তিন ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর একটুও দেরি না করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়।'

'কী বলছেন, হুজুর! আপনি কি আমাদের আর ঘোড়াগুলোকে মেরে ফেলতে চান নাকি? এখন একটু বিশ্রাম না নিলে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারব না ... ঘোড়াগুলোও বড্ড ঘেমে গেছে। তার ওপর জেরিটা যেভাবে খোঁড়াচ্ছে, ডলাই-মলাই না করে এমনি যদি এই অবস্থাতে ওকে নিয়ে যাই, গিন্নিমা কিন্তু ভীষণ রাগ করবেন। আমার মনে হয় হুজুর, একটু বিশ্রাম করে, খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা যদি বের হই তবু ওকে ঠিক ধরতে পারব। কেননা লিজি কোনোকালেই তেমন জোরে হাঁটতে পারে না।'

এমন সময় মিসেস শেলবি বারান্দা পেরিয়ে এসে হ্যালিকে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ জানালেন। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও হ্যালির আমন্ত্রণ গ্রহণ না করে উপায় ছিল না। ফলে মিসেস শেলবির সঙ্গে হ্যালিকে ভিতরে বসার ঘরটায় প্রবেশ করতে দেখে স্যাম ইশারায় অ্যান্ডিকে ডাকল, তারপর পরস্পরের গা টিপে দুজনে হাসতে হাসতে একেবারে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল।

ঘোড়াগুলোকে আস্তাবলের দিকে নিয়ে যেতে যেতে স্যাম অ্যান্ডিকে বলল, 'মনে হচ্ছে আজ আমাদের কপালে খাওয়াটা বেশ ভালোই জুটবে।'

সাত

মা ও ছেলে

টমের ঘর থেকে বেরিয়ে আসার পর এলিজার চাইতে নিঃসঙ্গ আর বিধুর কোনো মানুষকে কল্পনা করা বা মানসিক অবস্থার বর্ণনা দেয়া সত্যিই খুব কঠিন।

এ পৃথিবীতে তার নিজের বলতে যেটুকু ছিল সেই নীড় ছেড়ে, এতদিনে যাদেরকে বন্ধুর মতো ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত, তাদের স্নেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আজ সে কেবলই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। এতদিনের পরিচিত যত স্মৃতি একে একে যেন ভিড় করে আসছে। সেই গৃহকোণ, যেখানে সে এতদিন বাস করে এসেছে, কেটেছে তার শৈশব আর কৈশোরের অনাবিল দিনগুলো। সেই গাছের ছায়া, যার নিচে সে খেলা করেছে। সেই নিরালা উপবন, যেখানে উতলা সন্ধ্যায় সে স্বামীর সঙ্গে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়িয়েছে : এইরকম আরো কত না অজস্র স্মৃতি। এখন নক্ষত্রখচিত এই হিমেল রাত্রি যেন তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বলছে, 'এ তুমি কী করছ, এলিজা! তোমার ঘর-দোর সংসার ফেলে কেউ এভাবে চলে যায়?'

কিন্তু অজানা ভয় আর বিপদের আশঙ্কার চাইতে একমাত্র সন্তানের প্রতি তার ভালোবাসা অনেক বেশি গভীর, অনেক প্রবল। তাই হ্যারিকে বুকের ওপর নিবিড় করে আঁকড়ে ধরে সে যতটা সম্ভব দ্রুত হেঁটে চলেছে। অন্য সময় এলিজা তাকে কোল থেকে নামিয়ে হাঁটিয়েই নিয়ে যেত। কিন্তু এখন আর মুহূর্তের জন্যে সে ভরসা পেল না, পাছে হ্যারিকে কেউ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়।

তুষার ছাওয়া পথে ত্রস্ত পায়ের চাপে যখনি কোনো শব্দ হচ্ছে, আতঙ্কে তার বুক কেঁপে উঠছে, আর প্রতিটি ছায়ার সামান্যতম নড়াচড়ায় তার রক্তের স্রোত যেন হিম হয়ে আসছে। তবু একএক সময় সে অবাক হয়ে ভাবছে এতো শক্তি সে পেল কোথা থেকে? কেননা গলা জড়িয়ে থাকা ছেলেটার ভার তার কাছে মনে হচ্ছে পালকের মতো হালকা। আর অজানা ভয়ে শিউরে ওঠার প্রতিটা ক্ষণেই মনে হচ্ছে একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে

সাহস যুগিয়ে চলেছে। তাই সারাক্ষণ শুকনো ঠোঁটে সে মনে মনে প্রার্থনা করছে, 'হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের রক্ষা কর!'

ঘুমে হ্যারির দুচোখের পাতা যখন বুঁজে আসছিল। প্রথমটায় ভয়ে আর উত্তেজনায় তার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। কিন্তু মা যখন তাকে বুঝিয়ে বলল যে সে যদি কেবল শান্ত হয়ে থাকে তাহলে তাকে নিশ্চয়ই বাঁচাতে পারবে, হ্যারি তখন মার গলাটা আঁকড়ে ধরে চুপটি করে পড়ে রইল। শুধু ঘুমিয়ে পড়ার আগে সে মাকে জিজ্ঞেস করল, 'মা, আমি কি জেগে থাকব?'

'না, বাবা। তোমার যদি ঘুম পেয়ে থাকে নিশ্চিন্তে ঘুমোও।'

'কিন্তু মা, আমি ঘুমিয়ে পড়লে সেই লোকটা যদি আমাকে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যায়?'

'না, বাবা। আমি কিছুতেই তা হতে দেব না। ঈশ্বর আমাদের নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন!'

'তুমি ঠিক বলছ, মা?'

'হ্যাঁ, সোনা।'

হ্যারি পরম নিশ্চিন্তে মার কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল।

বিহ্বল একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে এলিজা মনিবের খামারবাড়ি, জমির সীমানা আর জঙ্গল পেরিয়ে এল, একের পর এক অতিক্রম করে গেল তার যত পরিচিত দৃশ্যাবলি। তবু তার চলার বিরাম নেই, শিথিলতা নেই হাঁটার গতিতে। এমনিভাবে মাইলের পর মাইল সে হেঁটে চলল। অবশেষে পুবের আকাশে যখন ধরল রাঙা আলোর ছোপ, পরিচিত সবকিছুকে পেছনে ফেলে সে পাকা রাস্তায় উঠল।

আগে মনিবানির সঙ্গে ওহিও নদীর ধারের একটা গ্রামে সে বেশ কয়েকবার এসেছিল। ফলে গ্রাম থেকে নদীর তীর পর্যন্ত পথটা তার বেশ ভালোই চেনা। তাই মনে মনে পরিকল্পনা করেছে নদী পেরিয়ে প্রথমেই সে ওপারে পালিয়ে যাবে, তারপর তার অদৃষ্টে কী আছে একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।

ভোরের আকাশ রাঙিয়ে যখন সূর্য উঠল, ক্রমে ক্রমে রাজপথ দিয়ে একটা দুটো করে গাড়ি-ঘোড়া চলতে শুরু করল, এলিজার হঠাৎ তখন খেয়াল হলো, তার অবিন্যস্ত বেশবাস, রুক্ষমূর্তি, ত্রস্ত পথচলা লোকের মনে সন্দেহ জাগিয়ে তুলতে পারে। তাই হ্যারিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে এলিজা জামা-কাপড় ঠিক করে নিল, অবগুণ্ঠনটাকে ভালো করে বসিয়ে নিল মাথার ওপর, তারপর হ্যারির হাত ধরে যতটা জোরে হাঁটলে কারো মনে সন্দেহ জাগবে না ততটা জোরেই হাঁটতে লাগল। এলিজার পুঁটলিতে কিছু কেক আর কয়েকটা আপেল ছিল। একসময় সে পুঁটলি থেকে একটা আপেল বার করে রাস্তার ওপর গড়িয়ে দিল আর হ্যারি সেটাকে ধরার জন্যে দৌড়ে গেল। এমনিভাবে দুজনে আরো মাইলখানেক পথ পেছনে ফেলে এল।

একটু বেলা বাড়ার পর ওরা দুজনে একটা ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করল। জঙ্গলের গভীর থেকে ভেসে আসছে পাহাড়ি নদীর মৃদু কুলকুল শব্দ। হ্যারি তখন খিদে আর তেষ্টায় একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছিল। বেড়া ডিঙিয়ে এলিজা ছেলেকে নিয়ে নদীর ধারে বড় একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে বসল, যাতে চট করে কারুর নজরে না পড়ে। তারপর পুঁটলি থেকে কেক বার করে ছেলের হাতে দিল। কিন্তু মা কিছু খাচ্ছে না দেখে হ্যারি যখন একহাতে

মার গলাটা জড়িয়ে ধরে অন্যহাতে তার আধখাওয়া কেকটা মার মুখের দিকে নিয়ে গেল, এলিজা আর কিছুতেই নিজেকে সামলে রাখতে পারল না, কান্নায় বুজে এল তার গলার স্বর, 'না না, আমাকে দিতে হবে না, তুমি খাও সোনামণি।'

'নদীর ওপারে নিরাপদ কোনো জায়গায় তোমাকে নিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি কি খেতে পারি? নাও, তাড়াতাড়ি কর। এখনো আমাদের অনেক পথ হাঁটতে হবে।'

দুজনে আবার শুরু করল পথ চলা। পরিচিত সবকিছুকে পেছনে ফেলে ওরা এখন অনেক দূরে চলে এসেছে। এলিজা আর হ্যারি দুজনেই দেখতে ঠিক শ্বেতাঙ্গদের মতো, ভালো করে লক্ষ্য না করলে ওরা যে নিগ্রো সেটা স্পষ্ট বোঝাই যায় না। ফলে ওদের পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সন্দেহ করার কেউ কোনো সুযোগই পেল না। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া আর একটু বিশ্রামের জন্যে একজন চাষির খামার বাড়িতে আশ্রয় নিল, তারপর আবার পথ চলতে শুরু করল।

সূর্যাস্তের ঘণ্টাখানেক আগে ওরা পৌঁছে গেল ওহিও নদীর ধারের সেই গ্রামটায়। ক্লান্ত শ্রান্ত এলিজার পা দুটো তখন ক্ষতবিক্ষত, তবু তার হৃদয় সংকল্পে দৃঢ়।

প্রথমেই তার চোখ পড়ল ওহিও নদীটার ওপর। নদীটা এলিজার আর ওপারের মুক্তির মধ্যে দিয়ে আপন মনে বয়ে চলেছে।

সবে বসন্তের শুরু। ঘোলা জলে নদীটা ফুলে ফেঁপে রয়েছে। তাতে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে বড় বড় সব তুষারের চাঁই। কেন্টাকির দিক থেকে ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে যাওয়া তুষার ছাওয়া তীরটা অনেকখানি বেঁকে একেবারে নদীর মধ্যে গিয়ে পড়েছে এবং দুপার থেকে নদীটাকে এমনভাবে ঢেকে ফেলেছে যে ওহিওর জলধারা প্রায় চোখে পড়ে না বললেই চলে। তুষারের বড় বড় চাঙড় ভরা নদীটাকে এখন মনে হচ্ছে এবড়ো-খেবড়ো বিশাল একটা ভেলার মতো।

নদীর এই অবস্থা দেখে এলিজা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। সে স্পষ্টই বুঝতে পারল এর মধ্যে দিয়ে খেয়া নৌকা চালানো সম্ভব নয়। খোঁজ খবর নেবার জন্যে নদীর ধারে যে ছোট সরাইখানাটা ছিল, এলিজা সেই দিকে এগিয়ে গেল।

সরাইখানার যিনি মালিক, সেই ভদ্রমহিলা রাতের রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। এলিজার করুণ কণ্ঠস্বর শুনে উনি ফিরে তাকালেন। 'কী ব্যাপার, কিছু বলছ বাছা?'

'ওপারে যাবার কোনো খেয়া নেই?'

'না, খেয়া পারাপার বন্ধ হয়ে গেছে।'

'ওঃ।'

এলিজার ম্লান মুখ আর হতাশ চোখের দৃষ্টি দেখে ভদ্রমহিলা ব্যথিত হলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ওপারে যেতে চাও কেন? কারুর কি অসুখ-বিসুখ করেছে? তোমাকে দেখে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।'

'নদীর ওপারে আমার বড় ছেলে রয়েছে। তার অবস্থা খুব খারাপ। কাল রাতে খবর পেয়েই আমি এতখানি পথ হেঁটে এসেছি খেয়া ধরব বলে!'

'সত্যিই বড় দুর্ভাগ্যের কথা!' ভদ্রমহিলার মনে মাতৃস্নেহ উদ্বেল হয়ে উঠল।

'তোমার জন্যে আমার খুবই কষ্ট হচ্ছে।'

তারপর জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে উনি কাকে যেন ডাকলেন। একটু পরেই চামড়ার বহির্বাসপরা একটা লোককে দেখা গেল। তার হাত দুটো কালি ঝুলিতে ভরা। ওকে দেখে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আচ্ছা সোলেমন, তুমি কি জানো সেই লোকটাকে পার করার জন্যে আজ মাঝি কি খেয়া নিয়ে আসবে?'

'ও বলেছে, সুবিধে হলে আপ্রাণ চেষ্টা করে দেখবে।'

'আজ একটা লোকের ওপারে যাবার কথা আছে। রাত্তিরে সে এখানে খেতে আসবে। যদি সম্ভব হয় তুমিও তার সঙ্গে ওপারে যেতে পারবে। তুমি বরং ততক্ষণ এখানে একটু বিশ্রাম কর। বাঃ, তোমার ছেলেটাতো ভারি সুন্দর দেখতে!'

ভদ্রমহিলা একটা কেক হ্যারির হাতে দিলেন।

ক্লান্তি আর ভয়ে হ্যারি কাঁদছিল। এলিজা বলল, 'আহা, বেচারির খুব কষ্ট হয়েছে। এমনিতে হাঁটার অভ্যেস নেই, তার ওপর আমি আবার ওকে দৌড় করিয়ে এনেছি।'

'পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ওকে শুইয়ে দাও।'

দরজা খুলে ভদ্রমহিলা ছোট একটা শোবার ঘর দেখিয়ে দিলেন। এলিজা হ্যারিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ তার হাত দুটো ধরে চুপচাপ বসে রইল। একটু পরেই হ্যারি ঘুমিয়ে পড়ল। এলিজার মনে স্বস্তি নেই। তার শিরায় শিরায় যেন আগুনের হলকা বইছে। ধরা পড়ার আগে যেভাবেই হোক তাকে নদীর ওপারে পৌছতেই হবে। বড় বড় তুষার-চাঙ্গড় ভরা ওহিওর ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ জলধারার দিকে এলিজা ব্যাকুল আগ্রহে তাকিয়ে রইল।

এদিকে মিসেস শেলবি হ্যালিকে মধ্যাহ্নভোজের আমন্ত্রণ জানানোর সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে একটুও দেরি হবে না এবং হ্যালিকে শুনিয়ে শুনিয়ে সেইমতো চাকর-বাকরদের নির্দেশও দিয়েছিলেন। কিন্তু মনিবানির মনের ভাব বুঝতে পেরে ওরা যতটা সম্ভব দেরি করেই খাবার পরিবেশন করল, যাতে এলিজার সন্ধানে বের হতে যত দেরি হবে এলিজা ততই নির্বিঘ্নে পালাতে পারবে।

খাওয়া-দাওয়ার পর মিস্টার শেলবি টমকে বৈঠকখানায় ডেকে পাঠালেন।

'টম', মিস্টার শেলবি কোমলস্বরে বললেন, 'আমি তোমাকে এই ভদ্রলোকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছি এবং এই মর্মে একখানা খৎ লিখে দিয়েছি যে উনি যখনই চাইবেন তখনি তোমাকে উপস্থিত হতে হবে, নইলে আমাকে এক হাজার ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। উনি অন্য একটা কাজে আজ চলে যাচ্ছেন। সুতরাং আজকের দিনটা তুমি যা খুশি তাই করতে পার।'

মৃদুভাষে টম বলল, 'ধন্যবাদ, হুজুর।'

'কিন্তু খবরদার' আঙুল উঁচিয়ে হ্যালি শাসাল। 'অন্যান্য নিগ্রোদের মতো তুমিও যদি চালাকি শুরু করো, তাহলে কিন্তু তোমার মনিবকেই তার খেসারত দিতে হবে। পাই পয়সাটি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমি ওঁকে ছাড়ব না। আসলে কি জানো, আমি নিগ্রোদের একদম বিশ্বাস করি না। একটু আলগা পেলেই ওরা বান মাছের মতো পিছলে যায়।'

'কর্তা', একেবারে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে টম মিস্টার শেলবিকে বলল, 'আমার যখন আট বছর বয়স, আপনার মা, মাননীয়া গৃহকর্ত্রী আপনাকে আমার কোলে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, "টম, এই তোর নতুন মনিব; একে তুই যত্ন করিস।" তখন আপনার বয়স

এক বছরেরও কম। এখন আপনাকে জিজ্ঞেস করি, সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি কি আপনার কোনো কথা অমান্য করেছি? আপনার মতের বিরুদ্ধে যাবার কোনোরকম চেষ্টা করেছি?'

'না টম, তুমি তা কখনো করো নি।' মিস্টার শেলবি খুব বিচলিত বোধ করলেন। ওঁর চোখের কোণে তখন টলটল করছে দু-ফোঁটা অশ্রু। 'সত্যি বলতে কি আমরা আবার তোমাকে ফিরিয়ে আনব।' তারপর হ্যালির দিকে ফিরে অনুরোধ করলেন, 'আপনি শুধু অনুগ্রহ করে একটু জানাবেন কার কাছে টমকে বিক্রি করলেন।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই', হ্যালি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। 'এ ব্যাপারে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

বেলা দুটো। স্যাম আর অ্যান্ডি ঘোড়া তিনটেকে নিয়ে ফিরে এল। বিশ্রাম নিয়ে উপযুক্ত আহার পেয়ে ঘোড়াগুলো তখন রীতিমতো চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।

ঘোড়ার পিঠে উঠতে গিয়ে হঠাৎ হ্যালির কী খেয়াল হলো, স্যামকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, তোদের মনিবের কোনো কুকুর নেই?'

'অনেক কুকুর আছে, হুজুর।' বিজয়ীর ভঙ্গিতে স্যাম বলল, 'এই তো ব্রুনোই রয়েছে। তার গর্জন শুনলে আপনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে। তাছাড়া আমাদের নিগ্রোদের প্রত্যেকেরই একটা করে কুকুরছানা আছে।'

'ওগুলো কুকুরছানা নয়, ইঁদুরের বাচ্চা।'

'না হুজুর, গন্ধ শুঁকে ওরা চোরও ধরতে পারে।'

'কিন্তু তোদের মনিবের পালিয়ে যাওয়া নিগ্রোকে খুঁজে বার করার মতো নিশ্চয়ই কোনো শিকারি কুকুর নেই?'

'কেন, এই তা আমাদের ব্রুনোই রয়েছে, স্যার ...'

'চুলোয় যাক তোদের ব্রুনো! নে নে, এখন চটপট ঘোড়ায় ওঠ।' হ্যালি তাড়া লাগাল।

ইশারায় স্যাম অ্যান্ডির গা টিপল। অ্যান্ডি কিছুতেই হাসি চেপে রাখতে পারল না। ব্যাপারটা লক্ষ করে চাবুক উঁচিয়ে হ্যালি ক্রুদ্ধস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

গম্ভীর গলায় স্যাম বলল, 'এই অ্যান্ডি, ইয়ার্কি মারিস না! দেখছিস না আমরা কত বড় একটা কাজ করতে যাচ্ছি?'

এরপর তিন জনেই ঘোড়ায় চড়ে বসল। মিস্টার শেলবির জমির সীমানার শেষপ্রান্তে এসে হ্যালি বলল, 'নদীতে যাবার সোজা পথটাই ধরব। মনে রাখিস এখানকার কোনো পথই আমার অজানা নয়।'

'নিশ্চয়ই', স্যাম সায় দিল। 'মিস্টার হ্যালি কিন্তু ঠিক জিনিসটাই আঁচ করতে পেরেছেন। কিন্তু স্যার, নদীতে যাবার তো দুটো রাস্তা আছে। একটা খারাপ, আর একটা ভালো, কোন রাস্তায় যাব?'

অ্যান্ডি অবাক হয়ে স্যামের মুখের দিকে তাকাল, কেননা কথাটা সে এই প্রথম শুনল। কিন্তু পরক্ষণেই রহস্যটা বুঝতে পেরে সে স্যামকেই সমর্থন করল। স্যাম বলল, 'আমার

মনে হয় লিজি খারাপ পথটা ধরেই গেছ। কেননা ওপথে স্বাভাবিকভাবে লোক চলাচল করে না বললেই চলে।

হ্যালি তেমন চতুর না হলেও, তার সন্দেহপ্রবণ মন, বিশেষ করে এ রকম একটা জটিল পরিস্থিতিতে, স্বাভাবিকভাবেই ইতস্তত না করে পারল না। তাই নিজের মনেই ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে অনেকটা স্বগত স্বরে সে বলল, 'তোরা যদি মিথ্যেবাদী না হতিস, তোদের কথা আমি একবারেই বিশ্বাস করতাম!'

স্যাম দমে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ঠিক আছে কর্তা, আপনার যা ইচ্ছে তাই করবেন। আপনার যদি মনে হয়, বড় রাস্তা দিয়েই চলেন। আমাদের কাছে দুটো পথই সমান। তবে আমার মনে হয় বড় রাস্তা ধরে যাওয়াই ভালো।'

হ্যালি আগেরই মতো স্বগত স্বরে বলল, 'আমার মনে হয় মেয়েটার পক্ষে নির্জন রাস্তা ধরে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

'তাহলে তাই চলেন।'

'কতক্ষণে সেই রাস্তাটায় পড়তে পারব?'

'এই তো একটু আগে', অ্যান্ডির দিকে চোখ ঠেরে স্যাম বলল। 'আমার কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় হুজুর, খারাপ রাস্তাটা ধরে যাওয়া উচিত নয়। এ পথে আমি কখনো যাই নি। তাছাড়া রাস্তাটা এতো নির্জন যে আমরা যেকোনো সময় পথ হারিয়ে ফেলতে পারি। তখন যে কী হবে একমাত্র ঈশ্বর জানেন।'

'তা হোক। আমি খারাপ রাস্তা ধরেই যাব।'

'আমি নিজে যাই নি বটে, তবে শুনেছি রাস্তার মাঝে মাঝে খাঁড়ির ঠিক মুখে বেড়া দেয়া আছে। তাই না, অ্যান্ডি?'

অ্যান্ডি রীতিমতো মুশকিলে পড়ল। সে 'হ্যাঁ' বলবে না 'না' বলবে কিছুই বুঝতে পারল না। তাই সে বুদ্ধি করে এমন দু-একটা শব্দ ব্যবহার করল, যাতে হ্যাঁ বা না দুই-ই বোঝায় না।

হ্যালির মনে হলো তার খারাপ রাস্তাটা ধরেই যাওয়া উচিত। কেননা স্যামের মুখ দিয়ে ওই রাস্তাটারই কথা প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল। এখন সে কথা ঘোরাবার জন্যে বারবার ভালো রাস্তাটার গুণ আর খারাপ রাস্তাটার দোষ বর্ণনা করছে। সুতরাং কিছু দূর যাবার পর সামনে খারাপ রাস্তাটা দেখতে পেয়েই হ্যালি সেই দিকে দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। স্যাম আর অ্যান্ডি তাকে অনুসরণ করতে লাগল। রাস্তাটা সত্যিই খুব পুরনো। এক সময়ে নদীতে যাবার এটাই একমাত্র পথ ছিল, কিন্তু নতুন একটা পাকা সড়ক হওয়ায় পথটা বহুকাল আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে এবং চাষিরা সত্যিই চলাচলের জন্যে মাঝে মাঝে জুলি কেটে বেড়া দিয়ে রেখেছে।

অ্যান্ডি না জানলেও স্যামের কাছে পথটা অজানা ছিল না। তাই সে অনুগত ভৃত্যের মতো হ্যালিকে অনুসরণ করছিল আর থেকে থেকে কেবলই অনুযোগ করছিল, 'উঃ, কী জঘন্য পথরে বাবা! এমনপথে কোনো মানুষ যেতে পারে। তার ওপর জেরির একটা পায়ে আবার চোট রয়েছে।'

একেই পথটা খারাপ, তার ওপর স্যামের অনুযোগে হ্যালির মেজাজ আরো বিগড়ে যাচ্ছে। তাই প্রায়ই সে স্যামকে ধমক লাগাচ্ছে, 'খবর্দার শয়তানি করবি না। আমি

তোদের হাড়ে হাড়ে চিনি। তোরা কিছুতেই আমাকে এপথ থেকে ফেরাতে পারবি না সুতরাং গজগজ না করে মুখ বুজে চল।'

'হুজুরের যা ইচ্ছে।' অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে কথাগুলো বলে স্যাম অ্যান্ডিকে চোখ টিপল। অ্যান্ডি বেচারিকে অতিকষ্টে হাসি চেপে রাখতে হচ্ছে।' তাই শুনে হ্যালি উত্তেজিত হয়ে উঠছে, কিন্তু খারাপ রাস্তার জন্যে জোরে ঘোড়া ছোটাতে পারছে না। এমনিভাবে ঘণ্টাখানেক চলার পর তারা বেশ বড় একটা খামারবাড়িতে এসে পৌছল। খামারবাড়িটা সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত, সেখানে কেউ থাকে না। তারা স্পষ্টই বুঝতে পারল এখান থেকে সোজা যাবার আর কোনো উপায় নেই, কেননা পথটা মাঠের মধ্যে এই খামারবাড়িতে এসেই শেষ হয়েছে। স্যাম বলল, 'হুজুরকে কি আমি এ কথা আগে বলি নি? আমরা এই অঞ্চলে জন্মেছি, এখানেই বড় হয়েছি। এখানকার পথঘাট আমাদের ভালোই জানা।'

হ্যালি ধমকে উঠল, 'উল্লুক, এ কথা তুই আমাকে আগে বলিস নি কেন?'

'এ আপনি কী বলছেন হুজুর!' চোখ বড় বড় করে স্যাম অবাক হবার ভান করল। 'পথটা যে খারাপ আমি তো আগেই বলেছিলাম? আপনি কিন্তু আমার কথা বিশ্বাস করেন নি।'

কথাটা অবশ্য একদিক থেকে সত্যি। তাই কোনোরকমে রাগ সামলে রেখে হ্যালি আবার রাজপথের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। স্যাম আর অ্যান্ডি সকৌতুকে তাকে অনুসরণ করল।

এমনিভাবে নানান কারণে একের পর এক দেরি হতে থাকায় নদীর ধারের সেই গ্রাম্য সরাইখানার ছোট ঘরটায় হ্যারিকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে হ্যালি সদলবলে সেখানে পৌছল। আনমনে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে এলিজা বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। স্যাম ছিল সবার আগে হ্যালি আর অ্যান্ডি ছিল কিছুটা পেছনে। ফলে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এলিজার মূর্তিটা স্যামের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারে নি। চোখের পলক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তালপাতার টুপিটাকে মাথা থেকে খুলে স্যাম এমনভাবে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল যে এলিজা হঠাৎ চমকে উঠে সেখান থেকে সরে গেল। আর ঠিক তখনি ওরা তিন জন জানালার সামনে দিয়ে তীরবেগে সরাইখানার সামনের দরজার দিকে ছুটে গেল।

সেই মুহূর্তে কোনো অমানুষিক শক্তি যেন ভর করল এলিজার দেহে। ঘরের একটা দরজা ছিল নদীর দিকে। চকিতে হ্যারিকে তুলে নিয়ে সেই দরজা দিয়ে সে নদীর দিকে ছুটে গেল। ছুটতে ছুটতে নদীর পাড়ের নিচে অদৃশ্য হয়ে যাবার সময় পলকের জন্যে হ্যালি তাকে স্পষ্ট দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে স্যাম আর অ্যান্ডিকে চিৎকার করে ডাকতে ডাকতে হ্যালি ছুটল নদীর দিকে। সেই মুহূর্তে ওকে দেখে মনে হলো ত্রস্ত কোনো হরিণীর পেছনে ছোটা ভয়ঙ্কর একটা শিকারি কুকুরের মতো। এলিজা ছুটছে। প্রাণপণে ছুটছে। বিহ্বলতার সেই মুহূর্তে মাটিতে তার পা ঠেকছে কিনা সন্দেহ। কয়েক পলকের মধ্যেই সে একেবারে জলের কিনারে এসে পড়ল। তার ঠিক পেছনেই হ্যালি, স্যাম আর অ্যান্ডি। এলিজা হঠাৎ ভয়ার্তকণ্ঠে চিৎকার করে খরস্রোতা নদীতে ভাসমান একটা তুষার পিণ্ডের ওপর লাফ দিল। প্রকৃতিস্থ কোনো মানুষ হলে কোনোদিনই এ কাজ করতে সাহস পেত না। কিন্তু এলিজা তখন মানসিক ধৈর্য হারিয়ে ফেলে একেবারে মরিয়া

হয়ে উঠেছে। হ্যালি, স্যাম আর অ্যান্ডি তীরে দাঁড়িয়ে এলিজার কাণ্ড দেখে হাত তুলে চিৎকার করে উঠল। সবুজ শেওলাপড়া তুষারের বিশাল চাঁইটা এজিলার ভারে সহসা চিড় খেয়ে দুলে উঠল। এলিজা কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও ওটার ওপর দাঁড়িয়ে রইল না, তুষারের চাঁইটা ঘুরে স্রোতে ভেসে যাবার আগেই সে সামনেই অন্য আর একটাতে লাফিয়ে পড়ল। এমনিভাবে লাফিয়ে পিছলে ডিঙিয়ে একটা তুষারপিণ্ড থেকে আর একটা তুষারপিণ্ডের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে। পা থেকে জুতো মোজা আগেই খুলে গেছে, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে শুভ্র তুষারের ওপর। এলিজা কিন্তু সেদিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না, কিংবা কিছু অনুভবও করছে না। সে অস্পষ্ট একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই সে ওহিওর অন্যপারে গিয়ে পৌঁছল আর দেখল কে যেন তাকে ডাঙায় টেনে তোলার জন্যে সাহায্য করছে।

'তুই যেই হোস না কেন, বড় সাহসী মেয়ে তো!' লোকটা স্তব্ধ বিস্ময়ে এলিজার মুখের দিকে তাকিয়ে একটা কঠিন শপথ করল।

আগন্তুকের কণ্ঠস্বরে চোখ তুলে তাকিয়ে এলিজা লোকটাকে চিনতে পারল। এক সময়ে মিস্টার শেলবির বাড়ির কাছেই ভদ্রলোকের জমিজমা ছিল। 'মিস্টার সাইমস! আপনি আমাকে রক্ষা করুন ...' দয়া করে আমাকে কোথাও লুকিয়ে রাখুন।' সজলচোখে এলিজা মিনতি করল।

'কী ব্যাপার, তুমি শেলবির বাড়িতে কাজ করতে সেই মেয়েটা না?'

'হ্যাঁ, মিস্টার সাইমস। তিনি আমার সন্তান, এই শিশুটাকে ওই লোকটার কাছে বেচে দিয়েছেন!' কেন্টাকির পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা হ্যালির দিকে নির্দেশ করে এলিজা বলল, 'একে বাঁচাবার জন্যে আমি পালিয়ে এসেছি।'

'সত্যিই তুই বড় সাহসী মেয়ে। এমন সাহসী যারা আমি তাদের পছন্দ করি।'

নদীর খাড়া পাড় থেকে মিস্টার সাইমস এলিজাকে ওপরে উঠে আসতে সাহায্য করলেন। 'তোর জন্যে কিছু করতে পারলে সত্যিই আমি খুশি হতাম। কিন্তু আমার এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তোকে নিয়ে যেতে পারি। তুই বরং এক কাজ কর! ওইখানে যা। সেটাই তোর পক্ষে সবচাইতে ভালো হবে।' রাস্তা থেকে একটু দূরে, গ্রামের ভেতরে, সাদা রঙের বেশ বড় একটা বাড়ি দেখিয়ে মিস্টার সাইমস বললেন, 'ওরা লোক ভালো। কোনো ভয় নেই, ওরা তোকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। তাছাড়া এই ধরনের কাজে ওরা অভ্যস্ত। যদি কোনো অসুবিধে হয় বলিস, আমি তোকে পাঠিয়েছি।'

'আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার সাইমস। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।'

'না না, ওসব কথা বলিস না। আমি তোকে কোনো সাহায্যই করতে পারলাম না।'

'আপনি আমার যা উপকার করলেন, একমাত্র ঈশ্বরই তা জানেন', আন্তরিকতার সঙ্গেই এলিজা বলল।

'নারে, পাগলি মেয়ে, না।' এলিজার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে বৃদ্ধ সাইমস বললেন, 'তোর স্বাধীনতা তুই নিজে অর্জন করেছিস এবং তোকেই তা চিরকালের জন্যে আগলে রাখতে হবে। এর চাইতে বড় আমি আর কারুর কাছ থেকে কিছু আশা করি না।'

এলিজা হ্যারিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে দ্রুতপায়ে সেই বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল আর বৃদ্ধ সাইমস ওর গমন পথের দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলেন।

ওপারে দাঁড়িয়ে হ্যালি স্তম্ভিত হয়ে এই দৃশ্য দেখছিল। তাই গাছপালার আড়ালে এলিজা সম্পূর্ণ অদৃশ্য না হয়ে যাওয়া পর্যন্ত সে বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল, তারপর স্যাম আর অ্যান্ডির দিকে ফিরে বলল, 'সত্যিই ভাবা যায় না!'

স্যাম বলল, 'যাই বলুন হুজুর, কাজটা ও কিন্তু ভারি অদ্ভুতভাবে করল!'

'মেয়েটার ভেতরে নির্ঘাৎ সাতটা শয়তান আছে!' হ্যালি তখনো বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারে নি। 'বনবেড়ালের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এ-রকম ভয়ঙ্কর একটা নদী পার হয়ে গেল।'

'বাপরে বাপ, সে কী যে সে লাফ!' এমনভাবে কথা বলে স্যাম হাসতে লাগল যে হাসতে হাসতে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

'এই উজবুক, দাঁড়া, তোর হাসি আমি বার করে দিচ্ছি!' চাবুক উঁচিয়ে হ্যালি হুঙ্কার ছাড়ল। কিন্তু ধরতে পারার আগেই স্যাম আর অ্যান্ডি পিছলে সরে গেল, তারপর ছুটতে ছুটতে সোজা ঘোড়ার পিঠের ওপর।

'বিদায় হুজুর। গম্ভীর গলায় স্যাম বলল, 'গিন্নিমা হয়তো এতক্ষণ আমাদের কথা ভেবে ভেবে সারা হচ্ছেন। তাছাড়া লিজিকে খোঁজার জন্যে আশা করি কর্তার আর আমাদেরকে দরকার হবে না। চল অ্যান্ডি, এবার আমরা ফিরে যাই।' এই বলে স্যাম অ্যান্ডির পাঁজরায় খোঁচা মারল, তারপর ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। দূর থেকে অস্পষ্ট ভেসে আসছে তাদের মিলিত হাসি আর ঘোড়ার খুরের শব্দ।

আট

সেনেটর বার্ড

সাইমস সাদা রঙের যে বড় বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েছেন, এই বাড়িটা মিস্টার বার্ড নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন সেনেটরের। খুব সুন্দর সাজানো-গোছানো ঘর। ভেতরের বসার ঘরটা চুলার তাপে উত্তপ্ত, এই চরম শীতে দারুণ আরামদায়ক। টেবিলের ওপর রাখা

ঝকঝকে চায়ের কাপ আর পেয়ালা পিরিচে লাল একটা আভা পড়ে ঝিকমিক করছে। কিছুটা রোগার ওপর ছিপছিপে চেহারায় মিসেস বার্ড যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি তিনি মিষ্টি স্বভাবের। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর তার আশ্চর্য মিষ্টি আর সুরেলা কণ্ঠস্বর। কয়েক দিনের অনুপস্থিতির পর স্বামীকে কাছে পেয়ে মিসেস বার্ড যে খুশি হয়েছেন, সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল।

'তোমার শরীর ভালো আছে তো জন?'

'শরীর আমার এমনিতে খুব ভালোই আছে মেরি, শুধু অসম্ভব ক্লান্তি, আর মাথাটা সামান্য ধরে আছে। আমার মনে হয় তোমার হাতের এক কাপ চা পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' হাসতে হাসতে মিস্টার বার্ড বললেন।

কাপে চা ঢেলে মিসেস বার্ড সবে যখন স্বামীর দিকে এগিয়ে দিচ্ছেন, বহুদিনের পুরোনো চাকর কুজো এসে বলল, 'মা, একবার যদি রান্নাঘরে আসেন খুব ভালো হয়।'

'চলো যাচ্ছি।'

মিসেস বার্ড প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুজোর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। মিস্টার বার্ড চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে ভাবলেন নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে।

একটু পরেই দরজার ওপাশ থেকে স্ত্রীর কণ্ঠস্বর শোনা গল, 'জন! জন! এদিকে একবার এসো না।'

খবরের কাগজটা রেখে দিয়ে মিস্টার বার্ড ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। রান্নাঘরে গিয়ে তিনি যে দৃশ্য দেখলেন অবাক না হয়ে পারলেন না। কৃষাঙ্গী একটি তরুণী দুটো চেয়ারের ওপর মূর্ছিত হয়ে পড়ে রয়েছে। বরফের কণায় ভরা ছিন্নভিন্ন পোশাক, একটা পায়ে জুতো নেই, মোজা দুটোই ছেঁড়া, ক্ষতবিক্ষত পায়ের গোড়ালি থেকে রক্ত ঝরছে। সুন্দর, অসম্ভব করুণ, অথচ পাথরে খোদা ওর আশ্চর্য মুখখানা ভালো করে লক্ষ করার পর মিস্টার বার্ড বুঝতে পারলেন এ মেয়েটি নিগ্রো। কিন্তু মানুষ কতো ক্লান্ত আর মরিয়া হলে তবেই এমন অবস্থা হতে পারে। কথাটা ভাবতেই মিস্টার বার্ড শিউরে উঠলেন। করুণায় ভরে উঠল তাঁর সারা মন। বজ্রাহাতের মতো দরজার সামনেই তিনি নির্নিমেষ চোখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর স্ত্রী আর নিগ্রো পরিচারিকা ডিনা মেয়েটির মূর্ছা ভাঙাবার চেষ্টা করছে। অদূরে বুড়ো কুজো শিশুটাকে কোলের ওপর বসিয়ে পা থেকে জুতো মোজা খুলিয়ে হাত দিয়ে ঘঁষে ঘঁষে তার হিম হয়ে যাওয়া পায়ের পাতা দুটো গরম করার চেষ্টা করছে।

'বেচারি মেয়েটার অবস্থা সত্যিই খুব কাহিল', সস্নেহে ডিনা বলল। 'আলো দেখেই বোধহয় ও এখানে এসেছিল। আমাকে জিজ্ঞেস করল একটু আগুন পোয়াতে পারবে কিনা। আমি সবে ওকে জিজ্ঞেস করতে যাব কোথা থেকে আসছে, তার আগেই দেখি আগুন পোয়াতে পোয়াতে হঠাৎ মূর্ছা গেল। হাত দুটো তো দেখে মনে হচ্ছে কখনো ভারি কাজ করতে হয় নি।'

কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর এলিজা ধীরে ধীরে চোখ মেলল। তার উদাস সেই কালো চোখের দৃষ্টিতে কোনো অভিব্যক্তি নেই। কিন্তু পরক্ষণেই যন্ত্রণার ম্লান রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল তার সারা মুখে, চকিতে ছিটকে উঠে বেদনার্ত স্বরে সে বলল, 'হ্যারি। আমার হ্যারি কোথায়? ওরা কি তাকে নিয়ে গেছে?'

হ্যারি তখনই কুজোর কোল থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল।

'ও, আমি এখানে!' হ্যারির নরম চুলের মধ্যে মুখ ঢুবিয়ে এলিজা পরম তৃপ্তিতে চোখ বন্ধ করল।

'বেচারি!'

মিসেস বার্ডের অস্ফুট ধ্বনিতে চকিতে মুখ তুলে এলিজা বলল, 'আপনি আমাদের রক্ষা করুন, ম্যাডাম। এই শিশুটিকে কিছুতেই ওদের ছিনিয়ে নিতে দেবেন না।'

'ভয়, নেই, এখানে তোমার কেউ কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ।' আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে মিসেস বার্ড বললেন।

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।' কথাটা বলেই এলিজা দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। হ্যারি বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল মায়ের দিকে। মিসেস বার্ড নানাভাবে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে শান্ত করলেন। আগুনের কাছেই তার জন্যে একটা শয্যা পেতে দেওয়া হলো। এলিজা অবিলম্বে হ্যারিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়ল।

মিস্টার এবং মিসেস বার্ড আবার সেই ভেতরের বসার ঘরটাতে ফিরে এসেছেন।

দুজনেই তখন নিজের নিজের ভাবনায় মগ্ন। মিসেস বার্ড তাঁর ফেলে রাখা বোনার কাঁটা দুটো তুলে নিলেন, মিস্টার বার্ড চোখ বুলিয়ে চললেন খবরের কাগজটার ওপর। একসময়ে কাগজটা সরিয়ে রেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মেয়েটা কে কিছু জানতে পেরেছ?'

'ঘুম ভাঙলেই জানতে পারব।'

'আমার মনে হয় ওর কিছু গরমের পোশাক লাগবে।'

'একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।' বুনতে বুনতেই মিসেস বার্ড জবাব দিলেন।

বেশ কিছুক্ষণের জন্যে নেমে এল নিটোল নিস্তব্ধতা।

ঘণ্টা দুয়েক পরে ডিনা এসে জানাল মেয়েটির ঘুম ভেঙেছে। সে গিন্নিমার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'চলো, যাচ্ছি।'

মিস্টার এবং মিসেস বার্ড দুজনেই রান্নাঘরে গেলেন।

আগুনের ধারে ছোট একটা টুলে বসে এলিজা গনগনে শিখাটার দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে রয়েছে। আগের উন্মত্ত ভাবটা কেটে গিয়ে এখন তাকে অনেক বেশি শান্ত আর করুণ দেখাচ্ছে।

'তুমি আমাকে ডাকছিলে?' কোমলস্বরে মিসেস বার্ড জিজ্ঞেস করলেন। 'আশা করি এখন তোমার নিশ্চয়ই একটু ভালো লাগছে।'

জবাবের পরিবর্তে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে এলিজা কাতর চোখে এমনভাবে তাকাল যে ভদ্রমহিলার চোখে জল এসে গেল। উনি বললেন, 'তোমার এখানে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আমরা তোমার বন্ধু। কোত্থেকে আসছ, কী চাও বলো?'

'আমি কেন্টাকি থেকে আসছি।'

'কখন বেরিয়েছিলে?' এবার মিস্টার বার্ডই প্রশ্ন করলেন।

'কাল রাত্তিরে।'

'তুমি এখানে কেমন করে এলে?'

'বরফের ওপর দিয়ে নদী পেরিয়ে।'

'বরফের ওপর দিয়ে নদী পেরিয়ে!' ঘরের প্রতিটি মানুষই একসঙ্গে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল।

'হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করেছেন।' মৃদু অথচ দৃঢ়ভাবে এলিজা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করল। 'ওরা ছিল আমার ঠিক পেছনেই। তাই এভাবে পালিয়ে আসা ছাড়া আমার আর অন্য কোনো উপায় ছিল না।'

'কিন্তু এখন নদীর চেহারা যে কী ভয়ঙ্কর আপনি ভাবতেও পারবেন না, মা!' ভয় জড়ানো স্বরে কুজো বলল। 'বরফের চাঁইগুলোতে এখন ভাঙন ধরেছে। বড় বড় চাঙড়গুলো ফাটছে, ঘুরছে, তারপর তীরের মতো স্রোতের বেগে ভেসে যাচ্ছে।'

'জানি', মৃদুস্বরে এলিজা বলল। 'নদীটা যে পেরিয়ে আসতে পারব, আমি নিজেই ভাবতে পারি নি। কিন্তু তখন আমার মরা বাঁচার কথা একবারও মনে পড়ে নি। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করেছেন। লোকে জানে না যে নিজে থেকে চেষ্টা করলে ঈশ্বর কতো সাহায্য করেন।'

মিস্টার বার্ড জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি ক্রীতদাসী?'

'হ্যাঁ, স্যার। আমি একজন কেন্টাকিবাসীর ক্রীতদাসী।'

'তিনি কি তোমার সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন?'

'না, স্যার। মনিব হিসেবে তিনি সত্যিই খুব দয়ালু।'

'তাহলে তোমার মনিবানি কি তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন?'

'না, স্যার। তাঁর মতো মিষ্টি স্বভাবের মহিলা এ পৃথিবীতে আর কেউ আছেন কিনা আমার জানা নেই।'

মিস্টার বার্ড খুবই অবাক হলেন।

'তাহলে তাঁদের অমন সুন্দর আশ্রয় ছেড়ে বিপদের এতো ঝুঁকি নিয়ে তুমি পালিয়ে এলে কেন?'

মিসেস বার্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে এলিজা ম্লানস্বরে বলল, 'কোনো মা ছাড়া আমার ব্যথা আর কেউ বুঝতে পারবে না। আমার এই একটাই মাত্র সন্তান। আমার গর্ব, আমার শোকের সান্ত্বনা। একে ছাড়া একা আমি একটা রাতও কাটাতে পারব না। আমার মনিব একে অন্য একটা লোকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন জানতে পেরে আমি ছেলেটাকে বুকে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি। মনিবের দুজন চাকরকে সঙ্গে নিয়ে সেই দাস-ব্যবসায়ীটা আমার পেছনে তাড়া করেছিল। ছুটতে ছুটতে আমি নদীর জলে বরফের ওপর লাফিয়ে পড়ি। তারপর কী করে যে নদী পেরিয়ে এসেছি আমি নিজেই জানি না, শুধু এইটুকু জানি একটা লোক আমাকে ডাঙায় টেনে তুলেছিল।'

এলিজার কথায় তখন অনেকেরই চোখে জল এসে গিয়েছিল।

একটু বিরতির পর মিস্টার বার্ড আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে তুমি কেন বলছিলে যে তোমার মনিব খুব দয়ালু?'

'আমার মনিব সত্যিই খুব দয়ালু। কিন্তু দেনার দায়ে উনি বাধ্য হয়েছিলেন আমার ছেলেটাকে বিক্রি করে দিতে। মনিবানি অনেক আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু কোনো উপায় ছিল না।'

'তোমার স্বামী নেই?'

'আছে, কিন্তু সে অন্য একটি লোকের ক্রীতদাস। তার মনিবটি খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির। মনিবটি তার সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে। তাকে শাসিয়ে রেখেছে খুব শিগগিরই দক্ষিণ দেশে বিক্রি করে দেবে। আমার মনে হয় তাকে আর কোনোদিনও দেখতে পাব না।'

শান্ত, ম্লানস্বরে কথাগুলো বললেও এলিজার দীর্ঘায়ত কালো চোখ দুটোর দিকে তাকালে স্পষ্টই বোঝা যায় তার বুকের অতলে কোথায় যেন একটা চাপা ক্ষোভ জমে রয়েছে।

মিসেস বার্ড জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন তুমি কোথায় যেতে চাও?'

'কানাডায়। কিন্তু আমি জানি না জায়গাটা কোথায়। ওটা কি এখান থেকে অনেক দূরে?'

'তুমি যতটা ভাবছ, তার চাইতে অনেক অনেক দূরে। তবে এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চয়ই ভেবে দেখব তোমাকে কতটা সাহায্য করতে পারি। ডিনা, আজ রাতের জন্যে তোমার ঘরে ওর একটা বিছানা করে দাও। তারপর কাল সকালে উঠে দেখা যাবে কী ব্যবস্থা করা যায়।'

স্বামী স্ত্রী দুজনে আবার বসার ঘরটায় ফিরে এলেন। মেয়েটার ব্যাপারে দুজনেই যে বিচলিত বোধ করছেন সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। পায়চারি থামিয়ে মিস্টার বার্ড এক সময় বললেন, 'যেভাবে হোক আজ রাতেই ওকে এখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। লোকটা নিশ্চয় দলবল নিয়ে কাল সকালেই এখানে হানা দেবে। মেয়েটা একা হলে হয়তো লুকিয়ে রাখা অসুবিধে হতো না, কিন্তু ওই বাচ্চাটাকে সামলে রাখা মুশকিল হবে। দরজা জানালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে কখন উঁকি-ঝুঁকি মারবে, তখন দুই জনেই ধরা পড়ে যাবে। আমার মনে হয় আজ রাতেই ওদের সরিয়ে ফেলা দরকার।'

কিন্তু জন, এতো রাত্তিরে সেটা কেমন করে সম্ভব? আর তুমি ওদের নিয়ে যাবেই বা কোথায়?' মিসেস বার্ড উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

'তুমি কিছু ভেব না, মেরি ওসব আমার বেশ ভালোই জানা আছে।'

কালক্ষেপণ না করে মিস্টার বার্ড আবার তার বুটজোড়া পায়ে গলাতে শুরু করলেন। মিসেস বার্ড স্পষ্টই বুঝতে পারলেন—স্বামী যখন একবার মনস্থির করে ফেলেছে, তখন আর কোনো শর্তেই তাকে ফেরানো যাবে না। তাই মিছিমিছি চেষ্টা না করে তিনি বরং স্বামীকে বাইরে বেরুনোর পোশাক পরতে সাহায্য করলেন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলাবন্ধটা ভালো করে আঁটতে আঁটতে মিস্টার বার্ড বললেন, 'ভ্যানক্রম্প নামে আমার একজন পুরনো মক্কেল আছে। ওই লোকটাও কেন্টাকির। সেখানে তার যত ক্রীতদাস-দাসী ছিল, সবাইকে মুক্তি দিয়ে সে এখানে একটা জায়গা কিনেছে। জায়গাটা এখান থেকে সাত মাইল দূরে পাহাড়ের ওপারে একটা জঙ্গলের মধ্যে। সেখানে যদি মেয়েটাকে একবার নিয়ে যেতে পারি তাহলে আর কোনো ভয় থাকবে না। কেননা ওদিকে তেমন একটা কেউ যায় না। তবে মুশকিল হচ্ছে এই রাতে আমি ছাড়া আর কেউ সেখানে গাড়ি চালিয়ে যেতে পারবে না।'

'কেন, কুজো তো খুব ভালো গাড়ি চালাতে পারে?'

'নিশ্চয়ই কুজো ভালো চালাতে পারে। কিন্তু রাস্তাটা খুব খারাপ। এতো বাঁকা, চড়াই-উৎরাই আর খানাখন্দে ভরা যে অচেনা লোকের পক্ষে এখন গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। হিসেবে একটু ভুলচুক হলেই নির্ঘাত মৃত্যু। আমি বহুবার ও পথে ঘোড়ায় চড়ে গেছি, তাই রাস্তা আমার জানা। ফলে আমাকেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

'তবু তুমি কুজোকে সঙ্গে নিয়ে যাও। ওইরকম একটা ভয়ঙ্কর পথে একা যেও না, লক্ষ্মীটি!' মিসেস বার্ড মিনতি করলেন।

'নিশ্চয়ই আমি কুজোকে সঙ্গে নিয়ে যাব। আর ভেবেছি ফেরার সময় অন্যপথে ফিরব, যাতে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। তাই ফিরতে আমার একটু দেরি হবে। তুমি যেন আবার আজেবাজে কিছু ভাবতে বসো না।'

'আচ্ছা গো, আচ্ছা। আমার কথা তোমাকে এখন ভাবতে হবে না। দাঁড়াও, আমি তোমার ওভারকোটটা এনে দিচ্ছি।'

ওভারকোটটা এনে মিসেস বার্ড নিজেই স্বামীকে পরিয়ে দিলেন।

'আমি কুজোকে গাড়িটা জুততে বলছি। তুমি বরং মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। আর যদি পার ওর সঙ্গে কিছু গরম জামা কাপড়ও দিয়ে দিও।'

প্রস্তুতিপর্ব মিটতে খুব একটা সময় লাগল না। মাথায় বনেট আর জড়ানো শাল গায়ে এলিজাকে দরজার সামনে দেখা গেল। মার কাঁধে মাথা রেখে হ্যারি ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে রয়েছে। অন্ধকারেই মিস্টার বার্ড ওদের তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠতে বললেন, তারপর নিজে গিয়ে বসলেন চালকের আসনে। কুজো দাঁড়িয়ে রইল পাদানিতে। বিদায়ক্ষণে মিসেস বার্ড এলিজার দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। এলিজা গাড়ির মধ্যে থেকে ঝুঁকে সুন্দর নরম হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে জড়িয়ে ধরল, কালো চোখের আয়তদৃষ্টি মেলে তাকাল মমতাময়ী মূর্তিটার দিকে—কিন্তু কয়েকবার চেষ্টা করেও সে কোনো কথা বলতে পারল না, কেবল কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠা ঠোঁট দুটো মৃদু নড়ে উঠল। অবশেষে অশেষ কৃতজ্ঞতায় ভরা এমন বেদনার্ত দৃষ্টিতে ঊর্ধ্বপানে সে তাকাল, যেকোনো মানুষের পক্ষে সে চোখের ভাষা ভোলা সম্ভব নয়। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে সে গাড়ির অন্ধকার কোণে নিজেকে হারিয়ে দিল। মিসেস বার্ড দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। গাড়িটা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল।

রাস্তাটা যে কী ভীষণ খারাপ তা একটু পরেই বোঝা গেল। সমতলভূমির তুলনায় পাহাড়ি পথটা অনেক বেশি সংকীর্ণ আর পঙ্কিল। তুষারে খানা-খন্দগুলো এমনভাবে ভরে রয়েছে, যে ওপর থেকে অন্ধকারে বোঝবার কোনো উপায় নেই। ফলে প্রতি মুহূর্তেই গাড়িটা হেলছে, দুলছে, চাকা থেকে বিশ্রী একটা ক্যাচ-কোঁচ শব্দ উঠছে। অবস্থা সব চাইতে সঙ্গীন হয়ে উঠছে যখন কোনো একটা চাকা গভীর গর্তের মধ্যে পড়ছে। গাড়িটা তখন এমনভাবে একপাশে হেলে পড়ছে, মনে হচ্ছে এই বুঝি উল্টে যাবে। কখনো কখনো ঘোড়ার পা এমনভাবে কাদার মধ্যে বসে যায় যে বেচারিরা টেনে তুলতেই পারছে না। যদিও কুজো পেছনের পাদানি থেকে ঘোড়াগুলোকে পরিচালনা করার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, তবু সম্ভবত ভয় পেয়ে ঘোড়াগুলো একেবারে সিঁটিয়ে রয়েছে। হ্যারি ঘুম থেকে জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করেছে। যখনই গাড়িটা একপাশে হেলে পড়ছে, দুজন দুজনের গায়ে আছড়ে পড়ছে, যখনই লাফিয়ে কোনো গর্ত পেরোবার চেষ্টা করছে, পেছনের আসনে দুজনে ছিটকে লাফিয়ে উঠছে। একবার তো মিস্টার বার্ড আর কুজোকে গাড়ি থেকে নেমে দুজনের যৌথ প্রচেষ্টায় পেছনের একটা চাকাকে গভীর গর্ত থেকে টেনে তুলতে হলো। আর একবার মিস্টার বার্ডের মাথা থেকে ছিটকে পড়া টুপিটাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করে তবে পাওয়া গেল। অন্ধকারে পিছল পাহাড়ি বাঁকগুলো সত্যিই বিপজ্জনক। এমনিভাবে বেশ কয়েক ঘণ্টা চলার পর, নানান দুর্ঘটনা এড়িয়ে ওরা যখন গন্তব্যে পৌঁছল, তখন প্রায় নিশান্তিকা। ঘোড়া দুটো রীতিমতো হাঁফাচ্ছে, ক্লান্ত শান্ত হয়ে হ্যারি আবার ঝিমিয়ে পড়েছে মার কোলের মধ্যে। নামার পর দেখা গেল গাড়িটা বিশাল একটা খামার বাড়ির সদর

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাড়ির মালিক বৃদ্ধ জন ভ্যান ট্রম্পকে জাগিয়ে তোলার জন্যে তেমন একটা কিছু ডাকাডাকি করতে হলো না। দরজা খুলে যিনি বেরিয়ে এলেন, ছ'ফুটেরও ওপর লম্বা বিশাল চেহারার ছোটখাটো একটা দৈত্য বললেও চলে। গায়ে পশুর লোমের তৈরি শিকারির লাল কামিজ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া পাকা চুল, গালে কয়েক দিনের না-কামান দাড়ি। সব মিলিয়ে এক নজরেই বোঝা যায় জন ভ্যান ট্রম্প অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এককজন মানুষ, যাঁর চেহারাটাই শুধু বিশাল নয়, হৃদয়টাও মহৎ।

লণ্ঠনের আলোটা তুলে ধরে মিটমিটে চোখে এমন রহস্যময় ভঙ্গিতে উনি আগন্তুকদের মুখের দিকে তাকালেন যে এমনটা ঘটবে তিনি আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। এবং সত্যিই, মিস্টার বার্ডকে ঘটনাটা তেমন বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বলার কোনো প্রয়োজনও হলো না।

সেই বুড়োটা তার সাত ছেলেকে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

'আশা করি হতভাগ্য এই মেয়েটা আর তার বাচ্চাটাকে সেই শয়তান লোকটার হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন।'

'আশা রাখি পারব।'

'বলা যায় না, হয়তো কালই সেই লোকটা দলবল নিয়ে এসে হাজির হতে পারে।'

হাসতে হাসতে ভ্যান ট্রম্প বললেন, আমার 'সাতটা ছেলে'। প্রত্যেকেই আমার মতো ছয় ফুটের ওপর লম্বা, চেহারাতেও কেউ কারুর চাইতে কম নয়। যদি ওদের সঙ্গে দেখা হয় বলবেন সেই বুড়োটা তার সাত ছেলেকে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে।

'ধন্যবাদ, মিস্টার ভ্যান ট্রম্প।'

গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়া হ্যারিকে নিয়ে এলিজা কোনোরকমে তার ক্লান্ত শ্রান্ত দেহটাকে বাইরে বার করে আনল। বৃদ্ধ লণ্ঠনের আলোটা তার মুখের ওপর ফেলতেই বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, নিজের অজ্ঞাতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল বেদনাসূচক অস্ফুট কয়েকটা ধ্বনি। রান্নাঘর সুসংলগ্ন ছোট একটা শোবার ঘরের দরজা খুলে উনি এলিজাকে ভেতরে যাবার ইঙ্গিত করলেন, তারপর লণ্ঠনটাকে রান্নাঘরের টেবিলের ওপর এমনভাবে রাখলেন যাতে শোবার ঘরটা স্পষ্ট দেখা যায়!

'এখানে তোমার কোনো ভয় নেই, মা। আশেপাশের যারা আমাকে চেনে, তারা খুব ভালো করেই জানে—আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে একটা মাছিও গলতে পারবে না।' উনুনের ওপরকার তাকে সাজিয়ে রাখা সারি সারি রাইফেলগুলোর প্রতি উনি নির্দেশ করলেন। 'তাছাড়া এসব ব্যাপারে আমি খুবই অভ্যস্ত। সুতরাং এটাকে তুমি নিজের বাড়ি মনে করেই এখন ঘুমিয়ে পড়।' দরজাটা উনি পেছন থেকে সন্তর্পণে বন্ধ করে দিলেন। 'মেয়েটা সত্যিই রূপসী আর স্বভাবটাও খুব নম্র। আমি জানি এই ধরনের মেয়েরা নিতান্ত বাধ্য না হলে কখনো বাড়ি থেকে পালায় না।'

মিস্টার বার্ড সংক্ষেপে ওর পালিয়ে আসার কারণ বর্ননা করলেন। বৃদ্ধ ভ্যান ট্রম্প প্রায় মাঝপথেই ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি জানি, মিস্টার বার্ড। এসব আমাকে আর কিছু বুঝিয়ে বলতে হবে না। সন্তানকে বাঁচাবার জন্যে যেকোনো মার পক্ষে এমন কাজ করাটাই স্বাভাবিক। আর ওরাও যে বুনো একটা হরিণীর পেছনে একপাল নেকড়ের মতো তাড়া করে ফিরবে, সেটাও অসম্ভব কিছু নয়। তবু মেয়েটাকে এখানে রেখে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

'আমি আপনাকে খুব ভালো করেই জানি মিস্টার ভ্যান ট্রম্প। আর সেই জন্যেই একটুও দ্বিধা না করে এতখানি পথ বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আমি এখানে ছুটে এসেছি।'

'আমার মনে হয় ভোরের আলো ফুটে না ওঠা পর্যন্ত আপনিও এখানে একটু বিশ্রাম নিয়ে যান।' আন্তরিকভাবেই বৃদ্ধ ভ্যান ট্রম্প আহ্বান জানালেন। 'আমি বরং স্ত্রীকে ডেকে দিচ্ছি, ও নিশ্চয়ই আপনার জন্যে একটা শয্যা করে দিতে পারবে।'

'না না, অসংখ্য ধন্যবাদ! ওকে আর কষ্ট করে ডাকার কোনো দরকার নেই। আমাকে এই রাতেই ফিরে যেতে হবে।'

'তাহলে চলুন আপনাকে একটা সোজা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। যে পথে এসেছেন তার তুলনায় এই পথটা অনেক ভালো আর সময়ও বাঁচিয়ে দিতে পারবে বেশ খানিকটা।'

এবার কুজোই গাড়িটা চালানোর দায়িত্ব নিল, মিস্টার ভ্যান ট্রম্প লণ্ঠন তুলে তাকে নির্দেশ দিতে লাগলেন। খামার বাড়ি অতিক্রম করে পথটা পাহাড়ের পিছনের ঢাল বেয়ে সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে সত্যিই তাঁরা প্রায় সমতল ভূমিতে নেমে এলেন। সেখান থেকে এবার কোন দিকে যেতে হবে, পথের নিশানা বাতলে দিয়ে বৃদ্ধ ভ্যান ট্রম্প বিদায় জানালেন। মিস্টার বার্ড দশ ডলারের একটা নোট বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'অনুগ্রহ করে এটা মেয়েটিকে দিয়ে দেবেন।'

'ও, আচ্ছা ... ঠিক আছে। বিদায়, মিস্টার বার্ড।'

'বিদায়, মিস্টার ভ্যান ট্রম্প।'

নয়

অজানার পথে

টম চাচার কুঠরির জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক টুকরো মেঘলা আকাশ। তখনো ভালো করে ভোর হয় নি। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। সমস্ত পরিবেশটা শোকতপ্ত মানুষের হৃদয়ের মতো কেমন যেন বিষণ্ন। উনুনের সামনে ছোট টেবিলটায় ক্লো-চাচি পরিষ্কার একটা শার্ট ইস্ত্রি করছে আর মাঝে মাঝেই হাত দিয়ে চোখের জল মুছছে।

কোলের ওপর বাইবেলখানা খুলে রেখে টম চুপচাপ বসে রয়েছে। কিন্তু আজ তার পড়ায় কিছুতেই মন বসছে না, বারবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে ঘুমন্ত ছেলেমেয়েগুলোর ওপর। বাইরে থেকে বোঝা না গেলেও, মনটা তার অসম্ভব কোমল আর ছেলেমেয়েদের ভালোও বাসে হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে। এ সময়ে উঠে ধীরে ধীরে শয্যার পাশে ছেলেমেয়েদের দিকে সে করুণ চোখে তাকিয়ে রইল, যেন বলতে চাইছে—'এই শেষ, আর কোনোদিনও দেখা হবে না।'

ক্লো আর কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, টেবিলের ওপর বসে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'তবু যদি জানতে পারতাম ওরা তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, লোক কেমন, তোমার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করবে, তাহলে নাহয় কথা ছিল ... কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছুই জানতে পারলাম না! গিন্নীমা তো বলছেন দু-এক বছরের মধ্যেই তোমাকে আবার ফিরিয়ে আনবেন। কিন্তু তার আগেই ওরা হয়তো তোমাকে খাটিয়ে খাটিয়ে মেরে ফেলবে। আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে দেখা হবে কিনা ঈশ্বরই জানেন।

'কিন্তু ক্লো, এখানে যে ঈশ্বর, যেখানে যাচ্ছি সেখানে সেই একই ঈশ্বর রয়েছেন।

'নিশ্চয়ই রয়েছেন। কিন্তু তবু কত ভয়ঙ্কর সব ঘটনাই তো ঘটে।'

'আমরা কিন্তু কেউই ঈশ্বরের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে পারি না, ক্লো।' স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার জেন্যই টম বলল। 'তবু তো ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ যে শুধু আমাকেই বিক্রি করা হয়েছে তোমাকে বা ছেলেমেয়েদের নয়। যা ঘটার শুধু আমারই ঘটবে, কিন্তু তোমরা এখানে নিরাপদে থাকতে পারবে। আমি জানি বিপদে জগদীশ্বর আমাকে সাহায্য করবেন।'

বুকের অতলে বিষণ্ণতার প্রচ্ছন্ন একটা রেশ থাকলেও টমের নিটোল বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরে কিন্তু তার আভাসটুকুও ধরা পড়ল না। টম এমনই এক ধরনের মানুষ, যার হৃদয় দুঃসাহসী কোনো পুরুষের মতো বিশাল, যে প্রিয়জনদের মুখ চেয়ে নিজের দুঃখকে হাসি মুখে সহ্য করতেও প্রস্তুত।

কিন্তু চিরকালই যে হাসিখুশি, সেই ক্লো-চাচির ধৈর্যের বাঁধ আজ ভেঙে গেছে। তাই কাঁদতে কাঁদতেই বেদনাহত স্বরে সে বলল, 'তবু আমি বলব, কর্তার উচিত হয় নি তোমাকে এভাবে বিক্রি করে দেওয়া। তুমি কোনো অন্যায় করো নি, কোনোদিন একটি বারের জন্যেও মুখের ওপর 'না' বল নি। নিজের বউ, ছেলেমেয়ের মুখের দিকে না তাকিয়ে তুমি গায়ের রক্ত জল করে ওঁর জায়গা জমি ব্যবসাপত্তর দেখাশোনা করেছ। ওনার উচিত ছিল অনেকদিন আগেই তোমাকে মুক্তি দেওয়া। তা না করে, কাউকে কিছু না জানিয়ে উনি আজ তোমাকে অচেনা একটা লোকের কাছে বিক্রি করে দিলেন। এখন তো দেখছি ঈশ্বর তোমার চাইতে ওঁকেই বেশি সাহায্য করছেন।

'ক্লো', টমের বুকের ভেতর থেকে কে যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'তুমি যদি আমাকে সত্যিই ভালোবাসো, তাহলে ও কথা আর একবারও উচ্চারণ করো না! বলা যায় না, হয়তো আমাদের দুজনের এই শেষ দেখা। তবু আমি তোমাকে মিনতি করছি—মনিবের বিরুদ্ধে তুমি আমাকে কিছু বলো না। ছেলেবেলা থেকে আমি ওঁকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি। ওঁকে আমি খুব ভালো করেই জানি। আজ ওঁর ব্যবহার তোমার খারাপ লাগছে। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত আমরা যেভাবে বেঁচেছি, উনি না চাইলে কোনোদিন কি

সেভাবে বেঁচে থাকাটা সম্ভব হতো? আমি জানি নিতান্ত বাধ্য না হলে উনি কখনই এ কাজ করতেন না।'

'হয়তো তোমার কথাই ঠিক, তবু আমি বলব উনি কাজটা ঠিক করেন নি।'

'মাথার ওপর ঈশ্বর আছেন, যিনি সবকিছুই দেখছেন। ওঁর দৃষ্টি এড়িয়ে এ পৃথিবীতে কোনোকিছুই ঘটে না।'

'কথাটা ঠিক, তবু মেয়েমানুষের মন তাতে স্বস্তি পায় না। অবশ্য এখন আর কথা বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই' ক্লো-চাচি উঠে পড়ল। 'তোমার প্রিয় কয়েকটা খাবার বানিয়ে রেখেছি। সারা দিনে পেটে কিছু পড়বে কিনা কে জানে।'

সেদিনের জন্যে মিসেস শেলবি ক্লো-চাচিকে ছুটি দিয়েছিলেন। তাই আগের দিন রাত থেকে সে স্বামীর সবচাইতে প্রিয় খাবারগুলো বানিয়ে রেখেছিল, রান্না করেছিল সবচেয়ে ভালো মুরগিটা। উনুনের ওপরকার তাকে সাজানো ছিল যে রহস্যময় বোয়েমগুলো, বিশেষ কোনো উৎসব ছাড়া সেগুলোকে পাড়ার কথা কেউ কোনোদিন ভাবতেই পারত না, আজ ক্লো নির্দ্বিধায় সেগুলোকে নামিয়ে আনল।

টম খেতে বসল বটে, কিন্তু তার খাওয়ার কোনো ইচ্ছে ছিল না। তাই একরকম না খেয়েই সে উঠে পড়ল। খাবারের অবশিষ্টাংশ শেষ করল তার ছেলেমেয়েরা। ইতিমধ্যেই তারা ঘুম থেকে জেগে উঠেছিল এবং সুস্বাদু খাবারের মোহে ব্যাপারটার গুরুত্ব তেমন অনুভব করতে পারে নি। তাদেরই একজন একসময়ে হঠাৎ বলে উঠল, 'মিসেস শেলবি আসছেন।'

'উনি কিছুই করতে পারবেন না। মিছিমিছি এসে কী লাভ', ক্লো নিজের মনেই গজগজ করতে লাগল।

মিসেস শেলবি ঘরে ঢুকলেন। ক্লো ওঁর জন্যে একটা চেয়ার পেতে দিল। আজ তার ব্যবহার ইচ্ছাকৃতভাবেই কিছুটা রুক্ষ। কিন্তু মিসেস শেলবি সেসব কিছু লক্ষই করলেন না। এখন ওঁকে রীতিমতো ম্লান আর উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে।

'টম, আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি ...' কথাটা উনি শেষ করতে পারলেন না, কান্নার আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল কণ্ঠস্বর। রুমালখানা চেপে ধরলেন দাঁতের ফাঁকে।

এবার ক্লোও আর নিজেকে সামলে রাখতে পারল না, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। ভেতরের চাপা ক্ষোভটা যেন অশ্রুবিন্দু হয়ে টুপটাপ টুপটাপ ঝরে পড়তে লাগল মাটিতে।

'টম', একসময় নীরবতা ভেঙে মিসেস শেলবিই প্রথম বলে উঠলেন, 'তোমাকে দেবার মতো আমার কিছুই নেই। আর সামান্য কিছু টাকাপয়সা যদি তোমাকে দিইও, ওরা কেড়ে নেবে। কিন্তু ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমি শপথ করছি—তুমি যেখানেই যাও না কেন, আমি তোমার খোঁজ খবর নেব এবং আর্থিক অবস্থা একটু স্বচ্ছল হলেই আবার তোমাকে ফিরিয়ে আনব। তুমি মন খারাপ করো না, ঈশ্বরের ওপর আস্থা রেখ।'

ছোটদের মধ্যে থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, 'মিস্টার হ্যালি আসছেন!'

এবং তার কথা শেষ হতে না হতেই দরজায় একটা লাথির শব্দ শোনা গেল, খোলা দরজার সামনে দেখা গেল হ্যালির রুক্ষ মূর্তিটাকে। একেই শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে, তার ওপর ভোর-রাত থাকতে এতখানি পথ তাকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে হয়েছে, ফলে তার মেজাজ রয়েছে বিগড়ে।

চড়া গলায় বলল, 'এই নিগার, তৈরি হয়েছিস?' তারপরেই মিসেস শেলবিকে দেখে টুপি খুলে অভিবাদন জানাল।

টম প্রস্তুত হয়েই ছিল। কোনো কথা না বলি স্ত্রীর গুছিয়ে দেওয়া ভারী পেঁটরাটা সে কাঁধে তুলে নিল। তারপর নুতন মনিবের পেছন পেছন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ক্লো তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে অদূরে দঁড়িয়ে থাকা গাড়িটা পর্যন্ত এগিয়ে দিল।

মিসেস শেলবি হ্যালির সঙ্গে কথা বলতে বলতেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং এমন আগ্রহ ভরে উনি কথাগুলো বলছিলেন যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হ্যালিকে তার জবাব দিতে হচ্ছিল। মিসেস শেলবির প্রকৃত ইচ্ছে ছিল টমের বিদায়ক্ষণটিকে যতটা সম্ভব বিলম্বিত করে রাখা। ইতিমধ্যে বাড়ির অন্যান্য চাকর-বাকররা সব গাড়ির সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। শুধু প্রধান পরিচারক হিসেবে নয়, তাদের অভিভাবক হিসেবেও তারা টমকে যে কী অসম্ভব শ্রদ্ধা করত—তাদের সহানুভূতি আর বেদনা জড়ানো মুখগুলো না দেখলে কোনোদিনই বিশ্বাস করা যেত না। মেয়েরা আর ছোটরা নীরবে চোখের জল ফেলছে। সবচেয়ে আশ্চর্য—ক্লো-চাচির চোখে তখন এক ফোঁটাও জল নেই।

চাকর-বাকারদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে হ্যালি গাড়ির কাছে পৌছে টমকে বলল, 'এই, ওঠ।'

টম গাড়িতে ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হ্যালি আসনের তলা থেকে একজোড়া বেড়ি বার করে টমের পায়ে পরিয়ে দিল। এতে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ মনে মনে খুবই আঘাত পেল।

মিসেস শেলবি বারান্দা থেকে বললেন, 'আমি আপনাকে সুনিশ্চিতভাবে এই আশ্বাস দিতে পারি মিস্টার হ্যালি, আপনার এই সাবধানতা অবলম্বনের কোনো প্রয়োজন নেই।'

'সত্যি বলতে কী, জানেন ম্যাডাম, একবার এখান থেকে পাঁচশো ডলার খুইয়েছি, এখন আমি আর নতুন করে কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজি নই।'

টম চাপাস্বরে ক্লোকে বলল, 'যাবার সময় মাস্টার জর্জের সঙ্গে দেখা হলো না। মনটা সত্যিই খুব খারাপ লাগছে। তুমি ওকে আমার ভালোবাসা জানিও।'

দু-তিন দিন আগে কয়েকজন বন্ধুরা মিলে জর্জ কোথায় যেন বেড়াতে গেছে। টমের এই দুর্ভাগ্যের কথা সে বিন্দুবিসর্গও জানে না। মিস্টার শেলবিও কী যেন একটা ব্যবসায়িক কাজে খুব ভোরে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। আর যাই হোক, তাঁর সব চাইতে পুরনো আর বিশ্বস্ত ক্রীতদাস টমের বিদায়ক্ষণে উপস্থিত থাকার মতো মনের জোর তাঁর ছিল না। তাই আগে থাকতেই তিনি মনে মনে পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন। এমন সময়ে গ্রাম থেকে ফিরবেন যখন সমস্ত ব্যাপারটা মিটে যাবে।

গাড়িতে উঠে হ্যালি ঘোড়ার পিঠে চাবুক চালাল। গাড়িটা চলতে শুরু করল। বিষণ্ন চোখে, অথচ মাথা উঁচু করে টম শেষবারের মতো চারদিকে তাকাল।

ধূলিধূসর পথে গাড়িখানা ছুটে চলেছে। পথের দুধার থেকে এক-এক করে মিলিয়ে যাচ্ছে টমের পরিচিত দৃশ্যাবলি। এ সময়ে মিস্টার শেলবির জমির সীমানা পেছনে ফেলে গাড়িখানা রাজপথে উঠল। তাপরেও প্রায় মাইলখানেক পথ দিয়ে হ্যালি হঠাৎ একটা কামারশালার সামনে গাড়িটা দাঁড় করাল। পুরনো একজোড়া হাতকড়া বার করে কামারশালায় নিয়ে গিয়ে বলল, 'এদুটো একটু বাড়িয়ে দাও তো, হে। ওই লোকটার কব্জির তুলনায় বড্ড ছোট হচ্ছে।'

চোখ তুলে তাকাতেই কামার অবাক হয়ে গেল। 'এ যে দেখছি শেলবিদের টম! আশা করি মিস্টার শেলবি ওকে নিশ্চয়ই বিক্রি করেন নি?'

'হ্যাঁ, করেছে।' হ্যালি চটে উঠল।'

'সত্যি, এ স্বপ্নেও ভাবা যায় না! তবে আমি আপনাকে জোর করে বলতে পারি স্যার, ওকে হাতকড়া পরাবার কোনো দরকার হবে না। ওর মতো সৎ আর বিশ্বস্ত লোক ...'

'রাখো তো বাপু তোমার সৎ আর বিশ্বস্ত। ওরাই সবার আগে চোখে ধুলা দিয়ে খুব সহজে সটকে পড়ে। যার জন্যে পায়ে বেড়ি থাকা সত্ত্বেও হাতকড়াটা না পরানো পর্যন্ত আমি কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছি না। তুমি আর মিছিমিছি সময় নষ্ট না করে হাতকড়াটা বাড়িয়ে দাও তো দেখি।'

দোকানের বাইরের বেঞ্চিতে টম বিষণ্ন মুখে চুপচাপ বসে রয়েছে। হঠাৎ সে ঝড় উড়িয়ে দ্রুতবেগে ছুটে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল এবং বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝে ওঠার আগেই মাস্টার জর্জ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল, তারপর গভীর আবেগে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

'এটা অত্যন্ত হীন, নীচ কাজ! যে যাই বলুক, আমি পরোয়া করি না। আমি স্পষ্টই বলব—এ অত্যন্ত হীন, জঘন্য অপরাধ! আমি যদি বড় হতাম, ওঁরা কোনোদিনই এ কাজ করতে পারতেন না।' বেদনায় ক্ষোভে জর্জ শেলবির গলার স্বর তখন কাঁপছে।

'মাস্টার জর্জ, তুমি এসে খুব ভালোই করেছ। যাবার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি বলে আমার সত্যিই খুব খারাপ লাগছিল।'

নাড়াচাড়ায় সামান্য একটু শব্দ হতেই জর্জের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল টমের পায়ে পরানো বেড়ি দুটোর ওপর।

'এ কী! দাঁড়াও, আজ আমি বুড়ো শকুনটাকে মেরেই ফেলব।'

প্রচণ্ড ক্ষোভে ঘুসি পাকিয়ে তেড়ে যাবার আগেই টম জর্জের হাত ধরে টান দিল। 'না না, জর্জ; লক্ষ্মীটি ... শান্ত হও, আমার কথা শোনো। তুমি যদি লোকটাকে চটিয়ে দাও তাহলে আমার সত্যিই কোনো উপকার হবে না, বরং আরো ক্ষতিই হবে।'

'বেশ, তোমার মুখ চেয়েই আমি ওকে কিছু বললাম না। কিন্তু সত্যিই বল তো, ব্যাপারটা কি অপমানকর নয়? তুমি বিশ্বাস করো টম চাচা, এসবের আমি কিছুই জানতাম না। বাড়িতে আমাকে কেউ কিছু বলে নি। লিঙ্কনদের সঙ্গে না গেলে আমি এমনটা কখনো ঘটতে দিতাম না। সমস্ত বাড়ি একেবারে লণ্ডভণ্ড করে তবে দিতাম।'

'সেটা কিন্তু সত্যিই করা উচিত হতো বলে আমার মনে হয়, মাস্টার জর্জ।'

'তুমি যাই বলো, আমি কিছুতেই ছেড়ে কথা কইতাম না! তাছাড়া এটা সত্যিই লজ্জাকর।'

'ছিঃ, মাস্টার জর্জ ... লক্ষ্মীটি, এমন করো না। তোমার সঙ্গে হয়তো আমার আর কখনো দেখা হবে না ...'

'না না, ওকথা বলো না, টম চাচা!' দোকানের দিকে পিছন ফিরে জর্জ অদ্ভুত রহস্যময় ভঙ্গিতে বলল। 'টম চাচা, তোমার জন্য আমি এই ডলারটা নিয়ে এসেছি।'

'এটা আমি তোমার কাছ থেকে নেওয়ার কথা কখনো ভাবতে পারি না, মাস্টার জর্জ।'

'কিন্তু এটা তোমার নিতেই হবে। আমি ক্লো চাচিকে বলেছি, ক্লো চাচি বলেছে এটার মধ্যে একটা ছেঁদা করে শক্ত সুতো দিয়ে তোমার গলায় বেঁধে দিতে, তাহলে আর কেউ দেখতে পাবে না। নাহলে জানতে পারলে ওই শকুনটা তোমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে। সত্যি, ইচ্ছে করছে শয়তানটাকে একেবারে গুলি করে মেরে ফেলতে!'

'না মাস্টার জর্জ, না; এতে আমার কোনো লাভ হবে না।'

'তুমি জানো না, টম চাচা; আমার কিছুতেই রাগ যাচ্ছে না।' কথা বলতে বলতেই জর্জ টমের গলায় ডলার সমেত সুতোটা বেঁধে দিল। 'নাও, এবার তোমার কোটের বোতমটা এঁটে দাও। এটা যখনই তোমার নজরে পড়বে, মনে পড়বে আমি তোমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ক্লো-চাচিকেও বলেছি তোমার কোনো ভয় নেই। বাবা যতদিন না তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আমি তাঁকে একেবারে অতিষ্ঠ করে ছাড়ব।'

'না মাস্টার জর্জ, তুমি বাবাকেও এ সম্পর্কে কিছু বলো না।'

'কেন, টম চাচা, এর মধ্যে খারাপের তো কিছু নেই?'

'হয়তো নেই। কিন্তু আমি চাই তুমি খুব ভালো ছেলে হও। মার কথা শুনবে, দুরন্তপনা করবে না। একটা জিনিস মনে রেখ, ঈশ্বর সব ভালো জিনিসই দুবার করে দেন, কিন্তু মা দেন জীবনে মাত্র একবার। তুমি যদি একশো বছরও জীবিত থাক, তাহলে তোমার মার মতো অমন ভালো মানুষ আর একজনও দেখতে পাবে না। তুমিই তাঁর একমাত্র আশা-ভরসা, তাঁর সন্তান। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি—তুমি ঠিক তাঁর মতোই সুন্দর আর ভালো ছেলে হয়ে ওঠো, যাতে বাবা মা একদিন তোমার জন্যে গর্ববোধ করতে পারেন।'

'তুমি দেখো টম চাচা, কথা দিচ্ছি, আমি সত্যিই খুব ভালো হব।'

জর্জের সুন্দর কোঁকড়োনো চুলে হাত বোলাতে বোলাতে টম বলল, 'এই তো লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা। আর গুরুজনদের কখনো অশ্রদ্ধা করো না।'

'কিন্তু তাঁরা যদি কোনো অন্যায় করেন?'

'না জর্জ, তবু তুমি তাঁদের কখনো অমান্য করো না।'

এমন সময় হ্যালি কামারশালা থেকে হাতকড়া নিয়ে ফিরে এল।

তাকে দেখেই জর্জ বড়দের মতো গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'এই যে সাহেব, শুনছেন। আপনি টম চাচার সঙ্গে যে ধরনের ব্যবহার করেছেন, আমি বাবা মার কাছে গিয়ে সব বলে দেব।'

নিতান্ত তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতেই হ্যালি জবাব দিল, 'স্বচ্ছন্দে গিয়ে বলতে পার।'

'সারা জীবন ধরে জন্তু-জানোয়ারের মতো মানুষ কেনা-বেচা করতে আপনার লজ্জা করে না? আমার তো মনে হয় কাজটা সত্যিই জঘন্য।'

'তোমার পূর্বপুরুষরা যখন ক্রীতদাস কেনা-বেচা করত তখন যদি দোষের না হয়ে থাকে, আমার বেলাতেই বা তা দোষের হতে যাবে কেন? তাছাড়া তোমার বাবা যখন বেচলেন তখন কোনো দোষের হলো না, আর আমার কেনার বেলাতেই যত দোষ!'

'বড় হলে এ কাজ আমি কখনো করব না। নিজেকে একজন কেন্টাকিবাসী হিসেবে ভাবতে আমার সত্যিই লজ্জা করছে।' কথাগুলো বলে জর্জ সোজা গিয়ে তার ঘোড়ায় উঠল, তারপর পেছন ফিরে তাকিয়ে বলল, 'বিদায়, টম চাচা!'

'বিদায়, মাস্টার জর্জ!' প্রশংসার চোখে তাকিয়ে টম সস্নেহে জবাব দিল। 'জগদীশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!'

জর্জ ঘোড়া ছুটিয়ে দিতেই টমের সামনে থেকে তার সুকুমার মুখখানা অদৃশ্য হয়ে গেল। তার ঘোড়ার খুরের শব্দ যতক্ষণ শোনা গেল, টম নির্নিমেষ চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল, যেন ঘোড়ার খুরের ওই শব্দটাই টমের প্রিয় আবাসভূমির শেষ স্মৃতিচিহ্ন। এক সময়ে সেই শব্দটাও মিলিয়ে গেল, কিন্তু তার বুকের কাছে তখনো রয়েছে একটা উষ্ণ স্থান, যেখানে কিশোরের নরম দুটো হাত বেঁধে দিয়েছে ওই ডলারটাকে। বুকের ওপর সেই জায়গাটা টম হাত দিয়ে নিবিড় করে স্পর্শ করল।

গাড়িতে উঠে হ্যালি টমের হাতে হাতকড়া দুটো পরিয়ে দিয়ে বলল, 'এখন তোকে যে কথাটা বলতে চাই খুব ভালো করে মন দিয়ে শুনে রাখ—তুই যদি বাঁকা পথে যাস, আমিও বাঁকা পথ ধরব। কেননা নিগারদের সবরকম চালাকিই আমার জানা আছে, আমার চোখে তুই ধুলো দিতে পারবি না। তবে আমার সঙ্গে তুই যদি ভালো ব্যবহার করিস, আমিও তোর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করব। কেননা আমি সাধারণত নিগারদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করি না। কী বললাম বুঝতে পেরেছিস?'

কোনো কথা না বলে টম নীরবে শুধু ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

দশ

ছদ্মবেশ

বিকেল গড়িয়ে গিয়ে এখন প্রায় সন্ধ্যে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। কেন্টাকি প্রদেশের এ গ্রাম্য-সরাইখানায় একজন বৃদ্ধ মুসাফির প্রবেশ করলেন। ভেতরের পানকক্ষটায় দেখলেন বেশ ভিড়। ওদের অধিকাংশই ভবঘুরে ধরনের মানুষ, বিশ্রী আবহাওয়ার জন্যেই তারা এখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। ঘরের ভেতরে কয়েকটা জায়গায় আগুন জ্বলছে আর

www.alorpathsala.org

চারপাশ দিয়ে কেউ বসে রয়েছে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে। অধিকাংশেরই পরনে শিকারির পোশাকের ওপর বর্ষাতি, মাথায় তালপাতার ঢোলা টুপি। ঘরের এককোণে কতকগুলো রাইফেল আর বারুদের থলি সাজানো রয়েছে। ভিড়ের মধ্যে দিয়েই নিগ্রো পরিচারকরা ব্যস্ত পায়ে যাওয়া আসা করছে। একপাশে একটা বিজ্ঞাপনকে ঘিরে কয়েকজন ভিড় জমিয়েছে দেখে বৃদ্ধ মুসাফির, মিস্টার উইলসন, পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, 'জিনিসটা কী?'

লোকটা সংক্ষেপে জবাব দিল, 'পালিয়ে যাওয়া একটা নিগ্রোর বিজ্ঞাপন।' মিস্টার উইলসন হাতের ছোট ব্যাগ আর ছাতাটা একটা চেয়ারের ওপর রেখে পকেট থেকে চশমাটা বার করলেন তারপর খুব সন্তর্পণে ওটা নাকের ওপর এঁটে ধীরে ধীরে ভিড় ঠেলে সামনের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বিজ্ঞাপনটা পড়তে লাগলেন।

"জর্জ হ্যারিস নামে আমার একজন মুলাটো ভৃত্য পালাইয়া গিয়াছে। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, ছ'ফুট লম্বা, মাথায় হালকা বাদামি রঙের ঘন-কোঁকড়ানো চুল। অসম্ভব বুদ্ধিমান, চমৎকার ইংরেজি বলিতে পারে, লিখিতে পড়িতেও জানে। সম্ভবত শ্বেতকায় কোনো পুরুষের ছদ্মবেশে সে পালাইতে চেষ্টা করিবে। তাহার পিঠে ও কাঁধে গভীর ক্ষতচিহ্ন এবং তাহার ডান হাতে 'এইচ' অক্ষরটি উল্কিতে খোদাই করা আছে।

তাহাকে জীবিত ধরিয়া দিতে পারিলে চারশত ডলার পুরস্কার দিব। তাহাকে যে হত্যা করা হইয়াছে, সে বিষয়ে যথাযথ প্রমাণ দিলে ওই একই পরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে।"

ভীষণ অবাক হয়ে মিস্টার উইলসন আর একবার বিজ্ঞাপনটার ওপর চোখ রাখলেন, তারপর নীরবে ব্যাগ আর ছাতাটাকে চেয়ারের নিচে চালান করে দিয়ে চোখ বুজে চুপচাপ বসে রইলেন।

তাঁর পাশে বসা পশুপালকদের মতো দেখতে রোগা লিকলিকে চেহারার একটি লোক থলি থেকে তামাক বের করে নলে ঠাসতে ঠাসতে সশব্দে আগুনের মধ্যে থুতু ফেলল। থুতু ফেলার সেই বিশ্রী শব্দে বৃদ্ধ চমকে উঠলেন, 'কী ব্যাপার!'

'কিছু না, আমি থুতু ফেললাম।' নিস্পৃহ গলায় লোকটা জবাব দিল। 'যে ওই বিজ্ঞাপনটা দিয়েছে সে যদি আমার সামনে উপস্থিত থাকত, আমি ঠিক এমনি ভাবেই তার মুখের ওপরে থুতু ফেলতাম। সত্যি, নিজেকে একজন কেন্টাকিবাসী হিসেবে ভাবতে আমার নিজেরই লজ্জা করছে।'

'এক দিক থেকে কথাটা অবশ্য সত্যি।' বৃদ্ধ উইলসন সোজা হয়ে বসলেন।

তামাকের নলটা ধরিয়ে নিয়ে লোকটা গলগল করে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল, তারপর থলিটা বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'একটু তামাক চলবে নাকি?'

'না, ধন্যবাদ আমি ধূমপান করি না।'

'এ রকম বিশ্রী আবহাওয়ায় আমার আবার তামাক না হলে মেজাজ ঠিক থাকে না। তার ওপর বিজ্ঞাপনটা পড়ে মেজাজটা আরো খিচড়ে গেল। দেখে তো মনে হচ্ছে ছেলেটি খুবই বুদ্ধিমান আর মনিবটি তার সঙ্গে রীতিমতো নিষ্ঠুর ব্যবহার করত।'

'হ্যাঁ ঠিক তাই।'

নির্দ্বিধায় বৃদ্ধকে সমর্থন করতে দেখে লোকটি উৎসাহিত হয়ে উঠল। আমারও কিন্তু অল্পবয়েসী অনেকগুলো নিগ্রো চাকর আছে। আমি সব সময়েই তাদের বলি, যেটা করবি মন দিয়ে করিস আমি কখনো তোদের পেছনে লেগে থাকব না বা দেখতেও আসব না,

কিন্তু আমি লক্ষ করেছি ওরা সেই কাজগুলো ঠিক গুছিয়ে করে রেখে দিয়েছে। আমি সবসময়েই এমন ব্যবহার করি যেন ওরা স্বাধীন, যখন যা খুশি করবে, যেখানে ইচ্ছে যেতে পারে। যদি কোথাও কোনো কাজে কয়েকদিনের জন্যে আটকে পড়ি সেই জন্যে ওদের যেখানে খুশি যাবার অনুমতিপত্রও দেওয়া আছে। কিন্তু সবচেয়ে মজার ব্যাপার, আজ পর্যন্ত একটা নিগ্রো চাকরও কখনো খারাপ কিছু করে নি ... এমন কী সবচেয়ে তেজি ঘোড়া আর পাঁচ শো ডলারেরও বেশি টাকা সঙ্গে নিয়ে ঠিক ঘরে ফিরে এসেছে। আমি জানি ওদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে ওরা খুব ভালো, আর কুকুরের মতো ব্যবহার করলে ওরা আপনার সঙ্গে ঠিক সেই রকমই ব্যবহার করবে।'

'নিশ্চয়ই', উইলসন বললেন, 'বিজ্ঞাপনের ওই জর্জ হ্যারিস ছেলেটিকে আমি খুব ভালো করেই জানি। অবশ্য যাকে আমি চিনি সেই ছেলেটিই যদি এ হয় তাহলে বলব—ছেলেটি শুধু বুদ্ধিমান নয়, প্রতিভাবানও বটে। ছেলেটি প্রায় ছয় বছর আমার চট তৈরির কারখানায় কাজ করেছে। যেমন সুন্দর তার ব্যবহার, তেমনি কর্মী হিসেবে ছিল অসাধারণ দক্ষ। নিজে মাথা খাটিয়ে শন পরিষ্কার করার ভারি চমৎকার একটা যন্ত্রও আবিষ্কার করেছিল। ওর আবিষ্কার করা যন্ত্রটা আজকাল অনেক কারখানাই ব্যবহার করছে। কিন্তু ওর মনিব, যে এই বিজ্ঞাপনটা দিয়েছে, লোকটা একটা হাড়-বজ্জাত। তার একজন নিগ্রো ক্রীতদাস বুদ্ধিতে তাকে ছাড়িয়ে যাবে এটা তার কিছুতেই সহ্য হলো না। আমার অনেক উপরোধ অনুরোধ, কাকুতি-মিনতি, এমন কি বেতন দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও লোকটা জর্জকে কারখানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে আগাছা নিড়ানির কাজে লাগিয়ে দিল। শুধু তাই নয়, কারণে অকারণে তাকে নিষ্ঠুরের মতো মারধরও করত ...'

'নিশ্চয়ই', নাক দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পশুপালক বলল, 'না হলে কাঁধে-পিঠের ক্ষতচিহ্ন আসবে কোত্থেকে।'

'লোকটা যদি অসম্ভব নীচ না হতো, জর্জকে ভাড়া খাটিয়েই ও অনেক পয়সা রোজগার করতে পারত।'

'ইস্ ও-রকম একটা প্রতিভাবান ছেলে পেলে আমি তাকে মাথায় করে রাখতাম।' পশুপালকের কণ্ঠস্বরে আফশোসের সুর ফুটে উঠল। 'আসলে কি জানেন, নিগ্রোরাও যে মানুষ এই কথাটা অনেকে বুঝতে চায় না।'

ভেতরে যখন এই ধরনের আলাপ আলোচনা চলছে, সরাইখানার বাইরে তখন ঘোড়ায় টানা একটা এক্কা এসে থামল। এক্কার নিগ্রো চালককে সঙ্গে নিয়ে একজন তরুণ ভেতরে প্রবেশ করতেই সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তার ওপর।

আগন্তুক অত্যন্ত দীর্ঘকায়, রীতিমতো সুপুরুষ চেহারা, গায়ের রঙ অনেকটা স্প্যানিয়ার্ডনের মতো। মাথায় একরাশ কোঁকড়ানো ঘন কালো চুল, অত্যন্ত উজ্জ্বল ধরনের আশ্চর্য সজীব, কুচকুচে কালো দুটো চোখ, তীক্ষ্ণ নাক, সুসংবদ্ধ পাতলা ঠোঁট। সুন্দর পরিপাটি পোশাকের মধ্যেও একটা রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে উপস্থিত সকলেরই মনে ধারণা হলো—লোকটা অনন্যসাধারণ।

অনায়াস ভঙ্গিতে কয়েক পা এগিয়ে এসে আগন্তুক মাথা থেকে টুপি খুলে সবাইকে অভিবাদন জানাল, নিগ্রো পরিচারককে ইঙ্গিতে ট্রাঙ্কটা মেঝেতে নামিয়ে রাখার কথা বলে সে সোজা সরাইওয়ালার কাছে গিয়ে নিজের নাম বলল—হেনরি বাটলার, ওক্‌ল্যান্ডস্, শেলবি কাউন্টি। তারপর অনেকটা নির্লিপ্তের ভঙ্গিতেই বিজ্ঞাপনটার কাছে গিয়ে পড়তে লাগল।

পড়া শেষ হতে না হতেই তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নিগ্রো ভৃত্যটিকে সে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা জিম, তোমার কি মনে হয় না আমরা বার্নানে ঠিক এইরকম একটা লোককে দেখেছি?'

'হ্যাঁ, স্যার। কিন্তু তার হাতটা ...'

'না সেটা দেখি নি বটে, তবে বলা যায় না, হয়তো সেও হতে পারে।' অলস ভঙ্গিতে দীর্ঘ একটা হাই তুলে হেনরি বাটলার সরাইওয়ালার কাছে গিয়ে তাকে আলাদা একটা ঘর দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করল। 'আমাকে এখুনি কয়েকটা জরুরি চিঠি লেখার কাজ শেষ করতে হবে।'

সরাইওয়ালা তখুনি তার অনুরোধ রাখার জন্যে কয়েকজন নিগ্রো ভৃত্যকে ওপরতলায় পাঠালেন ঘরটা সাজিয়ে গুছিয়ে আগুন জ্বেলে ঠিকঠাক করে দেয়ার জন্যে।

হেনরি বাটলার ঘরের মাঝখানে একটা চেয়ারে বসে পাশের লোকটির সঙ্গে গল্প করতে লাগল।

আগন্তুক সরাইখানায় প্রবেশ করার পর থেকেই কারখানার মালিক, মিস্টার উইলসন কেমন যেন একটা অস্বস্তিকর কৌতূহল অনুভব করছিলেন। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছিল—হেনরি বাটলার নামক এই আগন্তুকটিকে তিনি যেন কোথায় দেখেছেন, কিন্তু কোথায় দেখেছেন সেটাই স্পষ্ট মনে করতে পারছেন না। মনের অনেক গভীরে খুঁজেও তিনি কূল-কিনারা করতে পারলেন না হেনরি বাটলারের সঙ্গে তাঁর কোথায় পরিচয় হয়েছিল। অথচ আগন্তুক যখনই কোনো কথা বলছে, বৃদ্ধ চমকে তার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। আর যখনই তার শান্ত স্থির কালো চোখের দৃষ্টির সঙ্গে চোখাচোখি হচ্ছে, উনি চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিচ্ছেন। অবশেষে হঠাৎ একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই উনি এমন পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকালেন যে আগন্তুক মনে মনে শঙ্কিত না হয়ে উঠে পারল না। তাই তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে সে বৃদ্ধের কাছে উঠে এল।

চিনতে পারার ভঙ্গিতে হাতটা বাড়িয়ে সে বলল, 'আশা করি আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার উইলসন? ক্ষমা করবেন, প্রথমে আমি আপনাকে ঠিক চিনতে পারি নি। মনে হচ্ছে আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন। আমি শেলবি কাউন্টির হেনরি বাটলার।'

'ও, হ্যাঁ হ্যাঁ ... নিশ্চয়ই!' স্বপ্নাবিষ্ট মানুষের মতোই মিস্টার উইলসন কথাগুলো বললেন।

এমন সময় একটি নিগ্রো চাকর এসে খবর দিল ঘরটা সাজানো হয়ে গেছে।

'জিম, ট্রাঙ্কটা ওপরে নিয়ে যাও, আমি আসছি।' তারপর বৃদ্ধের দিকে ফিরে আগন্তুক বলল, "মিস্টার উইলসন, যদি কিছু মনে না করেন, অনুগ্রহ করে কি একবার আমার ঘরে আসবেন? আপনার সঙ্গে জরুরি দু-একটা কথা আছে।'

কোনো জবাব না দিয়ে মিস্টার উইলসন এমনভাবে আগন্তুককে অনুসরণ করতে লাগলেন যেন ঘুমের মধ্যে হেঁটে চলা কোনো মানুষ। বারান্দা দিয়ে ওরা বেশ বড় একটা ঘরে প্রবেশ করল। কেবল জ্বালা আগুনে ঘরটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে। তরুণ সন্তর্পণে দরজায় চাবি দিয়ে চাবিটা নিজের পকেটে রেখে দিল, তারপর বুকের ওপর হাত দুটো জড়ো করে রেখে টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে সোজা তাকাল বৃদ্ধের মুখের দিকে। স্তব্ধ বিস্ময়ে উইলসন বলে উঠলেন, 'জর্জ তুমি!'

'সত্যি, আমি ভাবতেও পারি নি!'

'ছদ্মবেশে আমি আত্মগোপন করেছি। বাদাম গাছের ছাল দিয়ে গায়ের রঙ হলুদ করেছি, কলপ দিয়ে কালো করেছি চুলের রঙ। ফলে বিজ্ঞাপনে দেওয়া চেহারার বর্ণনার সঙ্গে আমার তেমন কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ও, জর্জ! তবু আমি বলব তুমি ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুঁকি নিয়ে খেলা করছ। আমি তোমাকে কখনই এ ধরনের কাজ করার পরামর্শ দিতে পারি না।'

'আমি নিজের দায়িত্বেই এ বিপদের ঝুঁকি নিয়েছি, মিস্টার উইলসন।' এবার জর্জের ঠোঁটের সেই ম্লান হাসিটা কেমন যেন প্রচ্ছন্ন একটা বিদ্রূপে পরিণত হলো।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, জর্জের বাবা একজন শ্বেতাঙ্গ, মা হতভাগ্য নিগ্রো ক্রীতদাসী, অসামান্য রূপের জন্যে যাকে কামনার শিকার হতে হয়েছিল। মায়ের তরফ থেকে জর্জ কেবল হালকা একটু বাদামি রঙ আর উজ্জ্বল একজোড়া কালো চোখ পেয়েছিল, বাকি সবটুকুই সে পেয়েছিল অজ্ঞাত পরিচয় তার বাবার কাছ থেকে। তাই একজন শ্বেতাঙ্গের ছদ্মবেশে নিজের পরিচয় গোপন রাখতে জর্জ প্রয়াসী হয়েছিল। কিন্তু জর্জের এই দুঃসাহসিকতায় ধর্মভীরু আর আইন-শৃঙ্খলা মেনে-চলা বৃদ্ধটি যে মনে মনে বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন, সেটা তাঁর অস্থির ভঙ্গি দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল।

'জর্জ, সত্যিই আমি দুঃখিত, তবু না বলে পারছি না, নিজের দেশের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে তোমার এভাবে পালিয়ে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।'

'নিজের দেশ!' জর্জ হ্যারিস হেসে উঠল।

'কবরখানা ছাড়া আমাদের আবার নিজেদের দেশ কোথায়, স্যার? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি উনি যেন সেইখানেই আমাকে স্থান দেন!'

'না না, এভাবে বলো না, জর্জ। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করা।'

'আমি জানি, মিস্টার উইলসন। তবু না বলে পারছি না, যদি ঈশ্বরের সঙ্গে কখনো দেখা হতো, আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম, মুক্তি চাওয়াটা কি অপরাধ? স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে আমি কি কোনো অন্যায় করেছি?'

'আমি তোমার মনোভাব বুঝতে পারছি, জর্জ। আমি জানি তোমার মনিব মিস্টার হ্যারিস, তোমার সঙ্গে খুবই নিষ্ঠুরের মতো আচরণ করেছেন। তবু একজন সচেতন মানুষ হিসেবে আমি কিছুতেই তোমারই পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে সমর্থন করতে পারছি না।'

চওড়া বুকের ওপর হাত রেখে জর্জ একই ভঙ্গিতে টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, এখন শুধু বিদ্রূপের হাসিতে ঠোঁট দুটো একটু বেঁকে উঠল।

'আচ্ছা মিস্টার উইলসন, যদি কখনো এমন হতো, একদল রেড ইন্ডিয়ান এসে হঠাৎ আপনাকে জোর করে ধরে নিয়ে অনেক দূরে নির্জন কোনো একটা জায়গায় সারা জীবনের মতো বন্দি করে রাখল, তখন আপনি কী করবেন? পালাবার কি কোনোরকম চেষ্টা করবেন না? ধরুন দীর্ঘদিন বন্দি থাকার পর হঠাৎ দলছুট কোনো ঘোড়া কিংবা অপ্রত্যাশিত একটা সুযোগ এসে গেল আপনার হাতের সামনে, তখনো কি চুপ করে বসে থাকবেন? পালাবার কোনোরকম চেষ্টাই করবেন না?'

সেই মুহূর্তে মিস্টার উইলসন কোনো জবাব দিতে পারলেন না, আনমনে হাতের ছাতাটা নিয়ে বারবার নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। তারপর একসময় মৃদুভাষে বললেন, 'জর্জ, তুমি তো জানো, আমি তোমাকে বরাবরই বন্ধুর মতো ভালোবাসতাম এবং যা কিছু

বলতে চেয়েছি সব তোমারই ভালোর জন্যে। এখন আমার মনে হচ্ছে তুমি সত্যিই ভয়ঙ্কর এক বিপদের ঝুঁকি নিয়েছ। ওরা নিশ্চয়ই এত সহজে তোমাকে নিষ্কৃতি দেবে না, যেভাবেই হোক ধরার চেষ্টা করবে। আর একবার যদি ধরতে পারে, তোমার কপালে ভোগান্তির শেষ থাকবে না। মারতে মারতে একেবারে আধমরা করে নদীর ওপারে বিক্রি করে দেবে।'

'মিস্টার উইলসন, আমি সব জানি', দৃঢ় স্বরে জর্জ বলল, 'আর সব জেনেশুনেই আমি এই বিপদের ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়েছি। কিন্তু এখন আমি সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই আছি। এই দেখুন!' ওভারকোটের বোতাম খুলে জর্জ দুটো পিস্তল আর বেশ বড় একটা ভাঁজ-করা ছুরি দেখাল। জীবিত অবস্থায় ধরে নিয়ে গিয়ে ওরা আমাকে কোনোদিনই দক্ষিণদেশে বিক্রি করে দিতে পারবে না। আর যদি তেমন কোনো ঘটনা কখনো ঘটে, ছ-ফুটের মতো জমির ব্যবস্থা আমি তার আগেই করে নিতে পারব, কেন্টাকিতে আর কোনোদিনও ফিরে আসব না।'

'এসব বড় ভয়ঙ্কর কথা জর্জ! নিজের হাতে তোমার দেশের আইন ভাঙতে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না।'

'আবার বলছেন আমার দেশ। আপনার দেশ আছে মিস্টার উইলসন, কিন্তু আমার মতো যে ক্রীতদাসী মায়ের গর্ভে জন্মেছে তার আবার দেশ কোথায়? আর যে দেশের আইন আমরা তৈরি করি নি, তার প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র সমর্থন নেই, আমাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ আইন শুধু আমাদের ধ্বংস করার জন্যে, আমাদের দমিয়ে রাখার জন্যে।' ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে জর্জ মিস্টার উইলসনের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল।

'আশা করি আপনি নিশ্চয়ই মনে করতে পারেন, এর আগে আমি কখনো আপনার ঃ

'তারপর?'

'বুড়ো মনিবের সঙ্গে মিস্টার হ্যারিসের যোগাযোগ ছিল। উনিই আমার বড়বোনকে কিনেছিলেন। হঠাৎ কেন জানি পছন্দ হয়ে যাওয়ায় মিস্টার হ্যারিস আমাকে আবার বুড়ো মনিবের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। মনে মনে খুশি হয়েছিলাম। অন্তত একজন বন্ধুকে আমার কাছে পাব, যার সঙ্গে দুটো মনের কথা কইতে পারব। রূপে গুণে বড় আপা ছিল ঠিক আমার মায়ের মতো। খুব ভালো লিখতে-পড়তেও পারত। প্রথম প্রথম আমি কিছু বুঝতে পারি নি, কিন্তু পরে একদিন আবিষ্কার করলাম দরজা বন্ধ করে মিস্টার হ্যারিস প্রায়ই আমার বড় আপাকে চাবুক মারতেন। চাবুকের প্রতিটা শব্দ ছুরির তীক্ষ্ণ ফলার মতো এসে বিঁধত আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে। আমি নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতাম, কিন্তু কোনো সাহায্যই করতে পারতাম না। এবার আপনি বলতে পারেন, কেন, কেন ওকে অকারণে অমনভাবে চাবুক মারা হতো? মিস্টার হ্যারিস ওর কাছ থেকে যা চাইতেন, ও তা দিতে রাজি হতো না। ও যেকোনো মানুষের মতো অত্যন্ত সাধারণভাবেই বাঁচতে চাইত। কিন্তু আপনাদের দেশে ক্রীতদাসী মেয়ের বাঁচার জন্যে কোনো আইন নেই। বাগে আনতে না পেরে অবশেষে একদিন দেখলাম দাসব্যবসায়ীদের অন্যান্য ক্রীতদাসদের সঙ্গে আমার বড় আপাকেও শেকলে বেঁধে অর্লিয়েন্সের হাটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিক্রি করে দেওয়ার জন্যে। সেই ওর সঙ্গে আমার শেষ দেখা! বাবা নেই, মা নেই, ভাই নেই, বোন নেই, আশেপাশে এমন একটাও মানুষ নেই যে আমাকে কুকুরের চাইতে একটু বেশি ভালো মনে করবে। ছোটবেলায় সারারাত জেগে আমি একা-একা কাঁদতাম। খিদে বা চাবুকের জন্যে নয়, কাঁদতাম আমার মার জন্যে, আমার বড় আপার জন্যে। এ পৃথিবীতে এমন একটা

লোক ছিল না যে আমাকে একটু ভালোবাসবে। আপনার কারখানায় আসার আগে পর্যন্ত কেউ আমার সঙ্গে একটু ভালো করে কথাও বলে নি। সেই তুলনায় আপনার কারখানাতেই আমার জীবনের সবচাইতে সুখের দিনগুলো কেটেছে। আপনিই প্রথম আমার সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করেছেন, আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। আপনার চেষ্টাতেই লেখাপড়া শিখেছি। একমাত্র ঈশ্বরই জানেন এর জন্যে আমি আপনার কাছে কত কৃতজ্ঞ! আপনার ওখানে না থাকলে আমি কোনোদিনই এলিজাকে খুঁজে পেতাম না। আপনি তো আমার স্ত্রীকে দেখেছেন। ও যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি মিষ্টি ওর স্বভাব। ওর ভালোবাসা পেয়েই আমি প্রথম উপলব্ধি করতে পারলাম আমি একজন মানুষ এবং এখনো বেঁচে আছি। কিন্তু আমার সুখ মনিবের সহ্য হলো না। উনি আমাকে বন্ধুবান্ধব, প্রিয়জন আর যা যা ভালোবাসতাম সবকিছু থেকে সরিয়ে নিয়ে এলেন। কিন্তু কেন? সে শুধু নোংরা আর কদর্যতার মধ্যে আমাকে পিষে ফেলার জন্যে, আমাকে শেখানোর জন্যে যে আমি একজন নিগ্রো ক্রীতদাস ছাড়া আর কিছুই নই।'

জর্জ এবার চেয়ার ছেড়ে উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল। ততক্ষণে চোখের জল শুকিয়ে গিয়ে তা চাপা ক্রোধে ঝিকমিক করছে। মাঝে মাঝে আপনা থেকেই শক্ত হয়ে উঠছে হাতের মুঠো। উদ্দীপ্ত আবেগে সে আবার বলে চলল, 'তা সত্ত্বেও আমি সবকিছু মুখ বুঝে সহ্য করতে রাজি ছিলাম। কিন্তু এলিজাকে ত্যাগ করে অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে থাকার জন্যে উনি এমন পীড়াপীড়ি শুরু করলেন যে ব্যাপারটা আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। ঈশ্বর বা মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাদের দেশের আইনই ওঁকে এই অন্যায় আচরণ করার প্রেরণা যুগিয়েছে। আপনাদের দেশের আইনই আমার মা, বোন, স্ত্রী, এমন কী আমার নিজের হৃদয়কেও ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। আপনাদের দেশের আইনই মানুষকে এমন শক্তিশালী করে তুলেছে যে কেন্টাকির একটা লোকও ওর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস পায় নি। এই আইনকে আপনি বলেন আমাদের দেশের আইন? না স্যার, আমার যেমন বাবা নেই, তেমনি আমার কোনো দেশও নেই। তাই আমি চলেছি অন্য একটা দেশের খোঁজে। শুধু শান্তিতে চলে যাওয়া ছাড়া আমি আপনাদের দেশের কাছ থেকে আর কিছুই চাই না। কানাডায় যদি একবার পৌছতে পারি, সে দেশের আইন আমাকে আশ্রয় দেবে, আর তাকেই আমার দেশের আইন বলে মেনে নেব। কিন্তু কেউ যদি আমার স্বাধীনতা অর্জনের পথে বাধা দিতে আসে, আমি ছেড়ে কথা কইব না, কেননা এখন আমি মরিয়া হয়ে উঠেছি। মুক্তির জন্যে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্তও যুদ্ধ করতে রাজি আছি। আপনাদের পূর্বপুরুষরা স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করেছিলেন। সেটা যদি তাঁদের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হয়ে থাকে, তাহলে আমার পক্ষেই বা এটা অন্যায় হবে কেন?'

'ঠিক আছে জর্জ, আর তোমার পথে বাধা সৃষ্টি করতে চাই না।' হলদে রেশমি একটা রুমালে মুখ মুছতে মুছতে মিস্টার উইলসন উত্তেজিত স্বরে বললেন। 'শুধু বৃদ্ধ মানুষ হিসেবে তোমাকে একটা অনুরোধ করব, খুব সাবধানে থেকো আর অকারণে খুনখারাপি করো না। তুমি তো জানো, কারুর গায়ে হাত দেওয়াটা আমি একদম পছন্দ করি না।'

'আপনার অনুরোধ আমি চিরকাল স্মরণ রাখব, মিস্টার উইলসন।'

'তোমার স্ত্রী কোথায়?'

'বাচ্চাটাকে নিয়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। এ পৃথিবীতে ওর সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে কিনা তাও জানি না!'

'আশ্চর্য, এও কী সম্ভব! ও রকম দয়ালু একটা পরিবারের আশ্রয় ছেড়ে ...'

'দয়ালু পরিবারও ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে এবং আপনাদের দেশের আইনই মার বুক থেকে দুধের শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে মনিবের ঋণ পরিশোধ করার জন্যে বিক্রির অনুমতি দেয়।'

'সব কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে ... কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারছি না ..' কথা বলতে বলতেই পকেট হাতড়ে বৃদ্ধ এক তোড়া নোট বার করে জর্জের দিকে এগিয়ে দিলেন, 'এগুলো তুমি রেখে দাও।'

'না স্যার, আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন, সে-জন্যে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আপনার টাকা আমি নিতে পারব না। তাছাড়া এর জন্যে হয়তো আপনি বিপদেও পড়তে পারেন। আমার কাছে যা টাকা আছে, মনে হয় চালিয়ে নিতে পারব।'

'না জর্জ, এ টাকা তোমারই বরং। আমিই তোমাকে ঠিক দেওয়ার সুযোগ করে উঠতে পারি নি। সুতরাং তুমি আর না করো না, বাবা।'

জর্জ এবার আর সত্যিই 'না' করতে ভরসা পেল না। হাত বাড়িয়ে নোটগুলো মিস্টার উইলসনের কাছ থেকে নিয়ে সে পকেটে রেখে দিল।

'এ ভাবে তুমি কদ্দূর যাবে ঠিক বুঝতে পারছি না! তোমার সঙ্গে ওই ছেলেটি কেন?'

'আমার বন্ধু। ছেলেটি সত্যিই খুব খাঁটি। বছরখানেক আগে ও কানাডায় পালিয়ে গিয়েছিল। সেখানে ও শুনতে পায় ওর মনিব ওর ওপর এত ক্রুদ্ধ হয়েছে যে ওর বুড়ো মাকে নির্মমভাবে চাবুক মেরেছে। সেখান থেকে ও ছুটে এসেছে মাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। সুযোগ পেলে মাকে নিয়েই পালিয়ে যাবে।'

'মার সঙ্গে কি ওর দেখা হয়েছে?'

'না, এখনো হয় নি। তবে সুযোগ খুঁজছে। আমার সঙ্গে ওহিও পর্যন্ত গিয়ে যেসব বন্ধুরা আমাকে সাহায্য করবে তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে ও আবার ফিরে আসবে।'

'সত্যিই তোমরা ভয়ঙ্কর একটা আগুন নিয়ে খেলছ!'

জর্জের চাপা ঠোঁটে ফুটে উঠল বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ হাসি।

স্তব্ধ বিস্ময়ে মিস্টার উইলসন ওর সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন।

'তোমার এখন চেনাই যায় না, জর্জ। মনে হয় তুমি যেন অন্য কোনো মানুষ।'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই, মিস্টার উইলসন। আগে ছিলাম ক্রীতদাস, এখন আমি স্বাধীন।'

'বলা যায় না জর্জ; তুমি যেকোনো মুহূর্তে ধরা পড়তে পার।'

'যদি তাই ঘটে, জানবেন করবে সব মানুষই সমান আর স্বাধীন, মিস্টার উইলসন।'

'তোমার সাহস দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছি জর্জ! কিন্তু তুমি ঠিক এই সরাইখানাতে এসে উঠলে কেন?'

'সরাইখানাটা এত কাছে যে ওরা কোনোরকম সন্দেহই করবে না। ওরা আমাকে সাধারণত দূরের পথে বা সরাইখানাগুলোতে খুঁজবে। ওই জিমের মনিব এখানে থাকে না। কাজেই কেউ ওকে চিনতে পারবে না। ওর আশা সবাই প্রায় ছেড়েই দিয়েছে। তার ওপর ওই বিজ্ঞাপনটার সঙ্গে আমার চেহারারও কোনো মিল নেই।'

'কিন্তু তোমার হাতের দাগটা?'

দস্তানা খুলে জর্জ প্রায় শুকিয়ে-আসা একটা গভীর ক্ষত চিহ্ন দেখাল।

'দিন পনেরো আগে মিস্টার হ্যারিস এটা আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। ওর একটা বদ্ধ ধারণা হয়েছিল আমি একদিন নিশ্চয় পালাব।' মুচকি হেসে দস্তানাটা আবার পরতে পরতে জর্জ বলল 'ব্যাপারটা বেশ আকর্ষণীয় মনে হচ্ছে, তাই না মিস্টার উইলসন?'

'ঠাট্টা রাখ, বাবা। সব দেখে শুনে এমনিতেই আমার বুকের রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে।'

'এত বছর আমার বুকের রক্তও জমাট বেঁধে ছিল, এখন টগবগ করে ফুটছে।' একটু নীরবতার পর জর্জ আবার বলল, 'কাল সকালে ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই আমি এখান থেকে চলে যাব। আশা করছি সন্ধ্যে নাগাদ ওহিওতে পৌছে যাব। পলাতক নিগ্রোরা সাধারণত যা করে, এ ক্ষেত্রে আমি কখনই তা করব না। আমি দিনের বেলাতেই পথ চলব, রাত্তিরে আশ্রয় নেব সবচাইতে নামী কোনো সরাইখানায়। সুতরাং, বিদায়, মিস্টার উইলসন। আর কোনোদিন আপনার সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানি না। যদি কখনো জানেন আমি ধরা পড়েছি, তাহলে জানবেন আমি মারাও গেছি।'

খাড়া পাহাড়ের মতো একেবারে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে জর্জ হাতটা বাড়িয়ে দিল। মিস্টার উইলসন আন্তরিক ভঙ্গিতে করমর্দন করলেন, তারপর খুব সর্তকে থাকার জন্যে অনুরোধ করে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

বিষণ্ন মনে জর্জ বৃদ্ধের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল, হঠাৎ তার একটা কথা মনে হতেই সে বলল, 'শুধু আর একটা কথা, মিস্টার উইলসন।'

'কী, বলো?'

'আপনি আমার সঙ্গে প্রকৃত খ্রিস্টানের মতোই ব্যবহার করেছেন। আমি শুধু আপনার কাছে ছোট্ট একটা অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইব, মিস্টার উইলসন।'

নতমুখে একটু নীরব থাকার পর জর্জ ধীরে ধীরে বলতে লাগল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি ভয়ঙ্কর একটা বিপদের ঝুঁকি কাঁধে নিয়ে চলেছি। যদি মরিও এ পৃথিবীতে আমার জন্যে কাঁদার আর কেউ থাকবে না। খুন করে ওরা যদি আমাকে কুকুরের মতো মাটির নিচে পুঁতে রাখে, আমার হতভাগ্য স্ত্রী ছাড়া আর সবাই আমার কথা ভুলে যাবে। কেবল ওকেই সারাজীবন বিলাপ করে কাটাতে হবে। অনুগ্রহ করে এই পিনটা যদি ওকে পাঠিয়ে দিতে পারেন খুব ভালো হয়। বড়দিনে ও এটা আমাকে উপহার দিয়েছিল। বলবেন জীবনের শেষ দিনটা পর্যন্ত আমি ওকে ভালোবেসেছিলাম। আপনি কি অনুগ্রহ করে এই উপকারটা করবেন?'

'নিশ্চয়ই ... নিশ্চয়ই দেব, বাবা!' কাঁপা কাঁপা গলায় বৃদ্ধ বললেন, কান্নায় তখন রুদ্ধ হয়ে এসেছে তাঁর কণ্ঠস্বর। তিনি হাত বাড়িয়ে পিনটা নিলেন।

'ওকে আমার শেষ ইচ্ছেটা জানাবেন, বলবেন যদি ও পারে, যেন কানাডায় চলে যায়। ওর মনিবানি যত ভালো হোক, আর ওকে যতই ভালোবাসুক না কেন, দাসত্বের পরিণতি দুঃখ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। ওকে বলবেন আমাদের ছেলেটা স্বাধীন, তাকে যেন স্বাধীন কোনো মানুষেরই মতো গড়ে তোলে, যাতে আগামী দিনে আমার মতো তাকে কষ্ট পেতে না হয়। এই কথাটা কি ওকে অনুগ্রহ করে বলবেন, মিস্টার উইলসন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ ... বলব, বাবা ... অবশ্যই বলব! ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি নিশ্চয়ই জীবিত থাকবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমাদের মতো দুঃসাহসী ছেলেদের ঈশ্বর নিশ্চই সাহায্য করবেন।'

'ঈশ্বর আছেন কিনা আমি জানি না', হতাশার সঙ্গে ম্লান বেদনা মেশা এমন অদ্ভুত একটা ভঙ্গিতে জর্জ কথাগুলো বলল যে বৃদ্ধ অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'সারা জীবন চলার পথে এত অন্যায়-অবিচার দেখেছি যে ঈশ্বর আছেন বলে আমার বিশ্বাস হয় না। আপনি খ্রিস্টান, তাই আমার মনোভাব আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না ...'

'না না, জর্জ, দোহাই তোমার, ও কথা বলো না!' মিস্টার উইলসন যেন আঁতকে উঠলেন। 'আমি বলছি, তুমি বিশ্বাস করো ... ঈশ্বর আছেন।'

'হয়তো আছেন, আছেন আপনাদের জন্যে। কিন্তু আমাদের জন্যে কি সত্যিকারের কোনো ঈশ্বর আছেন?'

'ঈশ্বর একটাই, বাবা। আলো আর অন্ধকার জড়ানো মেঘের মধ্যে ন্যায়ের সিংহাসনের ওপর তিনি প্রতিষ্ঠিত। তাঁকে তুমি ভুলো না, তাঁর ওপর বিশ্বাস রেখো, তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। আমি বলছি, দেখো, একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে।'

প্রচ্ছন্ন একটা তিক্ততা সত্ত্বেও ধর্মভীরু সরল মানুষটার নিষ্করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে জর্জ রূঢ় কিছু বলতে সাহস পেল না, তাই শান্তস্বরে শুধু ছোট্টো করে বলল, 'ধন্যবাদ, মিস্টার উইলসন। আপনার কথাটা আমি অবশ্যই ভেবে দেখব।'

এগার

নিলাম

তীব্রবেগে গাড়িটা ছুটে চলেছে। হ্যালি আর টম, সিটের দুদিকে দুজন বসে যে যার নিজের চিন্তায় ডুবে রয়েছে। একই গাড়ি, একই আসন, দুজনের একই চোখ, কান হাত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, একই দৃশ্য ওদের দুজনের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে। অথচ দুজনের মানসিক চিন্তাধারা কী আশ্চর্য রকমেরই না ভিন্ন!

হ্যালি ভাবছে লম্বা-চওড়ায় টমের দেহখানা, যত বড়, এখনই তাকে বাজারে বিক্রি করা উচিত, না খাইয়ে-পরিয়ে আর একটু মোটা করে বাজারে নিয়ে যাওয়া উচিত? ছেলে-মেয়ে বুড়ো ক্রীতদাসের সংখ্যা আপাতত কম থাকায় হাটে এখন ওদের চাহিদা খুব। ঠিক দামে টমকে বিক্রি করতে পারলে সেই দামে সে দু-তিনটে ক্রীতদাস কিনতে পারবে। তাছাড়া মানুষ হিসেব সে যে কত বড়, আজ সবাই তা দেখবে! অন্য ব্যবসায়ীরা যখন তাদের ক্রীতদাসদের শেকলে বেঁধে নিয়ে যায়, আমি তখন টমের পায়ে শুধু বেড়ি আর হাতে হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছি! যদিও এখনো পর্যন্ত বেচারা কিছু করে নি, তবু নিগ্রো জাতটাকে বিশ্বাস করা সত্যিই খুব কঠিন। আর ঠিক সেই জন্যেই আমার মানবতা, আমার সাহসকে ওরা বাহবা না দিয়ে পারবে না!

আর টম ভাবছে তার জরাজীর্ণ পুরনো বাইবেল থেকে পড়া যিশুর বাণীগুলো, যে বাণীর আলোকে সে তার হতোদ্যম বিষণ্ণ আত্মাটাকে হৃদয়ের অতল অন্ধকার থেকে টেনে তুলতে পারবে।

একসময়ে হ্যালি পকেট থেকে কয়েকটা খবরের কাগজ বার করে বিজ্ঞাপনগুলো গভীর মনোযোগরে সঙ্গে পড়তে লাগল। হ্যালি লেখাপড়া বেশি জানত না তাই সাবলীল ভঙ্গিতে সে পড়তে পারছিল না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাকে বানান করে করে পড়তে হচ্ছিল। বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করল এই বিজ্ঞাপনটি :

নিগ্রো ক্রীতদাস বিক্রয় আদালতের নির্দেশক্রমে ব্লুচারফোর্ড স্টেটের সম্পত্তি নিলামে বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থ পাওনাদার ও উত্তরাধিকারদের প্রদান করা হইবে। সেই হেতু ২০ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার, কেন্টাকির ওয়াশিংটন শহরে, আদালত-প্রাঙ্গণের সম্মুখে যে সমস্ত নিগ্রো ক্রীতদাসদের নিলামে বিক্রয় করা হইবে, তাহাদের নাম ও বয়স : হ্যাগার ৬০, জন ৩০, বেন ২১, সাউল ২৫, অ্যালবার্ট ১৪।

কার্যনির্বাহক
স্যামুয়েল মরিস
টমাস ফ্লিন্ট

বিজ্ঞাপনটা দুয়েকবার পড়ার পর, হাতের কাছে কথা বলার আর কাউকে না পেয়ে হ্যালি টমকে বলল, 'আমাকে এই নিলামটা একবার দেখে আসতে হবে। দামে পোষালে কিনব। তোরও তখন দু-চার জন সঙ্গী হয়ে যাবে। আমরা এখান থেকে সোজা যাব ওয়াশিংটনে। সেখানে তোকে জেল-ফটকে আটকে রেখে আমি পরের দিন নিলামটা ঘুরে আসব।'

কোনো জবাব না দিয়ে টম নীরবে কথাগুলো শুনে গেল। তার মনে হলো সেদিন নিলামে আরো কত লোকের যে কপাল ভাঙবে সে শুধু ওরাই বলতে পারবে। স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, বাবা-মা সন্তান ছেড়ে ওরা পাড়ি দেবে দূরের দেশে। তখন তার মতো ওরাও ঠিক এমনিভাবে বেদনায় মুষড়ে পড়বে। কোনো অন্যায় না করা সত্ত্বেও চোর বদমাইশ গুণ্ডা আর খুনীদের সঙ্গে ওদেরকেও আটকে রাখা হবে জেল-ফটকে।

সারাদিন চলার পর সন্ধ্যেবেলায় ওরা পৌঁছে গেল ওয়াশিংটন শহরে। টমের থাকার ব্যবস্থা হলো জেলখানায় আর অন্যজন গেল সরাইখানায়।

পরের দিন বেলা এগারোটার সময় আদালত প্রাঙ্গণের সামনে রীতিমতো ভিড় জমে উঠেছে। ক্রেতা, বিক্রেতা উভয় ধরনের লোকই ঘোরাফেরা করছে, চেঁচাচ্ছে আর অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন জীবন্ত পণ্যগুলোকে নিলামে তোলা হয়। যে-সব নিগ্রো ক্রীতদাসদের নিলাম তোলা হবে তারা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নারী পুরুষ সব একসঙ্গে বসে রয়েছে আর নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে কথা বলছে।

ব্লুচারফোর্ড সম্পত্তির জন্যে যে নিগ্রোগুলোর বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল, ওরা বসে রয়েছে ভিন্ন একটা দলে। আদালত প্রাঙ্গণে পৌঁছে হ্যালি বীরদর্পে সেই দলটার দিকে এগিয়ে গেল। প্রায় বৃদ্ধা হয়ে আসা, অথর্ব ক্রীতদাসী হ্যাগারের দিকে সে ফিরেও তাকাল না, কিন্তু ক্রীতদাসদের মধ্যে যার বয়স সবচেয়ে বেশি, সেই জনকে জোর করে দাঁড় করিয়ে মুখ ফাঁক করে তার দাঁত দেখল, পিঠ বাঁকিয়ে পিঠের হাড় শক্ত কিনা পরখ করল, বিভিন্ন জায়গায় মাংসপেশি টিপে টিপে পরীক্ষা করল। এমনিভাবে একের পর এক দলের সবকটা ক্রীতদাসকে সে যাচাই করল, সব চাইতে পছন্দ হলো চৌদ্দ বছর বয়সের অ্যালবার্টকে। পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সে যতই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল, খুশিতে তার চোখ দুটো ততই ঝিকিয়ে উঠল।

সম্ভবত হ্যালির মনোভাব বুঝতে পেরেছে বুড়ি হ্যাগার। সে বলল, 'আমাকে ছাড়া ওকে বিক্রি করা হবে না, স্যার। ওরা বলেছে আমার ছেলে আর আমাকে একইসঙ্গে বিক্রি করা হবে। চোখে খুব একটা ভালো দেখতে না পেলেও আমি অনেক কাজ করতে পারি।'

ওর কথার কোনো জবাব না দিয়ে হ্যালি একটু দূরে, একটা ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল। মুখে চুরুট, হাত দুটো পকেটে ঢোকানো, মাথার টুপিটা হেলানো রয়েছে একপাশে।

'ওদের দেখে কেমন মনে হলো, স্যার?' পাশের দাঁড়ান লোকটি হ্যালিকে জিজ্ঞেস করল। এমনভাবে ও কথাটা বলল, যেন হ্যালির মতামতের ওপর ওর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

'বেশ ভালোই।' উপেক্ষার ভঙ্গিতে হ্যালি হালকা করে জবাব দিল, 'তবে আমি শুধু ওই ছেলেটার ওপরেই আগ্রহী।'

'বুড়ির সঙ্গে ছাড়া ওরা নাকি ছেলেটাকে বিক্রি করবে না।'

'আরে রাখেন সাহেব, কে ওই হতচ্ছাড়া বুড়িটাকে কিনতে যাবে?'

'তাহলে আপনি ওই বুড়িটাকে কিনছেন না?'

'পাগল হয়েছেন আপনি। আমি কি এতই বোকা যে আধমরা বেতো বুড়িটাকে কিনতে যাব?'

এমন সময় ভিড়ের মাঝ থেকে একটা গুঞ্জন শোনা গেল, হাঁকনদারকে দেখা গেল ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতে। ফাঁকা একটা জায়গায় টেবিল পেতে হাতুড়ি পিটিয়ে শুরু হয়ে গেল হাঁক-ডাক। খোলা বাজারের দাস-ব্যবসার চাইতে নিলামে কিছুটা সস্তাই মনে হলো। অপ্রত্যাশিত কম দামে হ্যালি দুটো নিগ্রো ক্রীতদাস পেয়ে গেল। এবার নিলামে চড়ানো হলো কিশোর অ্যালবার্টকে। বুড়ি হ্যাগার ছেলের হাতটা টেনে ধরে চিৎকার করতে লাগল, 'আমাকেও ওর সঙ্গে নিলামে চড়ানো হোক মাস্টার ... আমাদের দুজনকেই একসঙ্গে চড়ানো হোক ...'

'সর, সর এখান থেকে! তোরটা পরে ডাকা হবে।'

হাঁকনদার ঠেলে ওকে সামনে থেকে সরিয়ে দিল। বুড়ি পাগলের মতো চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু ওর মর্মভেদী আর্তনাদ তেমন কারুর কানেই পৌঁছল না। অ্যালবার্টের জন্যে দর আর উত্তেজনা তখন উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে, দু'জন ডাক দিয়ে চলেছে সমানে। বড় বড় সজল চোখে অ্যালবার্ট স্পষ্ট করে কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই হ্যালি তাকে কিনে নিল।

বুড়ি তখন হ্যালির পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। 'আমাকেও ওর সঙ্গে কিনে নিন স্যার ... নইলে আমি সত্যিই মরে যাব!'

'আমি কিনি বা না-কিনি, তুই এমনিতেই মরবি। যা, ভাগ এখান থেকে!' হ্যালি লম্বা এক লাথি মারল।

বুড়ি চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করার আগেই তাকে নিলামে তোলা হলো এবং সেই লোকটা, যে একটু আগে হ্যালির সঙ্গে কথা বলছিল, বুড়ি হ্যাগারকে জলের দামে কিনে নিল।

মুহূর্তের জন্যে মাকে একবার দেখতে পেয়ে অ্যালবার্ট কান্নাভেজা গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার জন্যে তুমি কিছু ভেবো না, মা! ওরা বলছিল তুমি নাকি খুব ভালো মনিবই পেয়েছ।'

'তাতে আমার কিছু এসে যায় না রে, সোনামণি। আমি আর তোকে কোনোদিনও দেখতে পাব না!'

'তুমি কেঁদো না, মামণি, লক্ষ্মীটি!'

'সোনা আমার, সোনা রে ...'

বুড়ি হ্যাগারের বুকফাটা আর্তনাদ এবার সবারই কানে এসে বিঁধল। হ্যালি তাড়াতাড়ি হাতকড়া পরিয়ে, হাতকড়ার মধ্যে দিয়ে একটা শেকল গলিয়ে ক্রীতদাস তিনটেকে জেলখানার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর তার পণ্যগুলোকে নিয়ে, হ্যালি ওহিরও একটা স্টিমারের গিয়ে উঠল। পথের মাঝে মাঝে হ্যালির কয়েকজন দালাল তার জন্যে আরো কিছু দাসদাসী কিনে রেখেছিল। ফেরিঘাট থেকে সেগুলোকেও স্টিমারে তোলা হলো। স্টিমারে হ্যালি ছাড়া আরো কয়েকজন দাসব্যবসায়ী ছিল। বলা বাহুল্য, অন্যান্য মালপত্রের সঙ্গে জীবন্ত পণ্যগুলো রইল নিচের ডেকে।

লা বেল রিভিয়ের, স্টিমারের নামটাই যে শুধু সুন্দর তাই নয়, দেখতেও বেশ সুন্দর। যেমন ঝকঝকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তেমনি মজবুত। জল কেটে তরতর করে এগিয়ে চলেছে। মাথার ওপর রোদ ঝলমলে নীলাকাশ, দুপাশে একটু পরপরই বদলে যাচ্ছে মনোরম সব দৃশ্যাবলি। মাস্তুলের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা হাওয়ায় পত্ পত্ করে উড়ছে। ওপরের ডেকে শ্বেতাঙ্গ যাত্রীরা মনের আনন্দে নদীর দুপারের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের বিয়োগব্যাথায় কাতর হ্যালির লোকজনেরা বিষণ্ন মুখে নিচের ডেকে বসে রয়েছে আর নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে কথা বলছে।

মাঝে মাঝে হ্যালি এসে সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছে, 'এই, ভদ্রলোকের মতো সব চুপচাপ বসে থাকবি। গোলমাল করেছিস কি মুশকিলে পড়বি।'

হ্যালি চলে যেতেই ওরা আবার সুখ-দুঃখের কথা পাড়ছে।

'সত্যি, আমার এত খারাপ লাগছে', শেকলবাঁধা হাতে টমের হাঁটু আঁকড়ে ধরে জন বলল, 'আসার সময় স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো না। এ সবের ও বিন্দু-বিসর্গও জানে না। বেচারি নিশ্চয়ই খুব ভাববে!'

টম জিজ্ঞেস করল, 'ও কোথায় থাকে?'

'খুব কাছেই, একটা সরাইখানায় ঝিয়ের কাজ করে। জানি না ওর সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হবে কি না!'

টম কোনো জবাব দিল না, শুধু তার বুকের অতল থেকে বেরিয়ে এল একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস!

ওপরের ডেক থেকে ভেসে আসছে শ্বেতাঙ্গ বাবা-মা স্বামী-স্ত্রী ভাই-বোনদের মুখর কলহাস্য। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা রঙিন প্রজাপতির মতো চারপাশে ঘুরছে, বেড়াচ্ছে, খেলছে, হাসছে।

'জানো মামণি, আমি এক্ষুনি দেখে এলাম', নিচে থেকে উঠে আসা ফুটফুটে একটা ছোট ছেলে তার মাকে বলল, 'এই স্টিমারেই একজন দাসব্যবসায়ী রয়েছে! সে অনেকগুলো ক্রীতদাস কিনেছে।'

'ওমা, তাই নাকি!' মা সত্যিই খুব অবাক হলেন।

'কী ব্যাপার, কী হয়েছে?' পাশের মহিলাটি জিজ্ঞেস করলেন।

'নিচের ডেকে কয়েকজন ক্রীতদাস রয়েছে।' মা বললেন।

ছেলেটি অমিত উৎসাহে বলে উঠল, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওদের প্রত্যেকের হাতে শেকল বাঁধা রয়েছে।'

'সত্যি, আমাদের দেশে যে এখনো দাসপ্রথা রয়েছে, ভাবতেও লজ্জা করে!' হাই তুলতে তুলতে পাশের মহিলাটি বললেন।

ছেলেটি আবার দৌড়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল।

জল কেটে তরতরিয়ে এগিয়ে চলেছে লা বেল রিভিয়ের। ডেকের উপর পুরুষরা ঘুরছে, কেউবা কুর্সিতে গা এলিয়ে দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছে, নয়তো ধূমপান করছে। মেয়েরা বুনছে, ছোটরা খেলছে।

পরের দিন কেন্টাকির ছোট শহরে স্টিমারটা কিছুক্ষণের জন্যে থামল। কী যেন একটা জরুরি কাজে হ্যালি নেমে গেল। একটু পরে সে যখন আবার ফিরে এল, তার সঙ্গে এল একটি কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা। মহিলাটির পরনে বেশ সুন্দর ভদ্র পোশাক, কোলে ছোট্ট একটা শিশু। নিগ্রো চাকরটা মেয়েটির পেঁটরাটা যথাস্থানে পৌছে দিয়ে নেমে যেতেই, ইঞ্জিনের প্রচণ্ড গর্জনে কাঁপিয়ে বাঁশি বাজিয়ে স্টিমার ছেড়ে দিল।

নিচের ডেকে মালপত্তর আর বাকস পেঁটরার মধ্যে দিয়ে পথ করে মেয়েটি নিগ্রো দাসদাসীদের জায়গায় গিয়ে বসল, তারপর হঠাৎ কেঁদে ওঠা শিশুটিকে শান্ত ও পরিচর্যার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

একটু পরে হ্যালি এসে চাপা স্বরে মেয়েটিকে কী যেন বলতে লাগল। টম লক্ষ করল মেয়েটার মুখখানা মেঘের মতো ক্রমশই কালো হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

'আমি আপনার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।' রাগতস্বরে মেয়েটি বলে উঠল। 'আপনি মিছেমিছি আমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছেন।'

'আমার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহলে এটা দেখো।' পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে হ্যালি মেয়েটাকে দেখাল। 'তোমাকে যে বিক্রি করা হয়েছে এটা তার দলিল। এতে তোমার মনিব নিজে হাতে সই করেছেন এবং আমি তাকে গুণে গুণে নগদ টাকা দিয়েছি। সুতরাং আমি যে তোমাকে মিছেমিছি বোকা বানাবার চেষ্টা করছি না, এটা তারই প্রমাণ।'

'আমি বিশ্বাস করি না মনিব আমাকে ঠকাবেন' রীতিমতো উত্তেজিত স্বরে মেয়েটি পুনরায় বলল, 'সুতরাং এটা কখনো সত্যি হতে পারে না।'

'বেশ, আমার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহলে যেকোনো ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করো। উনিই তোমাকে বলে দেবেন এতে কী লেখা আছে। এই যে শুনুন, অনুগ্রহ করে একটু শুনবেন ...' অদূরে একজন শ্বেতাঙ্গকে দেখে হ্যালি ডাকল। যদি কিছু মনে না করেন, এতে কী লেখা আছে মেয়েটাকে একটু পড়ে শুনিয়ে দিন না। ও কিছুতেই আমার কথা বিশ্বাস করতে চাইছে না।'

'এ-তো দেখছি জন ফসডিকের সই করা একটা বিক্রয়-দলিল। উনি লুসি নামে একটি ঝি আর তার বাচ্চাটাকে মিস্টার হ্যালি নামে এক ভদ্রলোককে বিক্রি করে দিয়েছেন।'

হ্যালি সদর্পে ঘোষণা করল, 'কী, এবার বিশ্বাস হলো তো?'

দুহাতে কান চেপে লুসি আর্তনাদ করে উঠল। 'না না, এ সত্যি নয় কখনো সত্যি হতে পারে না। উনি নিজে মুখে বলেছেন আমাকে লুসিভিলে পাঠাচ্ছেন। ওখানে যে সরাইয়ে আমার স্বামী চাকরি করে, সেখানে আমাকে রাঁধুনির কাজে ভাড়া খাটাবার জন্যে পাঠাচ্ছেন। উনি যে মিথ্যে বলবেন আমি বিশ্বাস করি না।'

শান্ত স্বভাবের মিষ্টভাষী সেই ভদ্রলোক ধীরে ধীরে বললেন, 'কিন্তু উনি যে তোমাকে বিক্রি করে দিয়েছেন, সেটা সত্যি। অন্তত এই দলিলে তাই-ই লেখা আছে।'

'ও দলিলের কোনো দাম নেই।' দৃঢ়স্বরে কথাগুলো বলেই লুসি নদীর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইল।

স্টিমারটা তার স্বাভাবিক গতিতে এগিয়ে চলেছে। প্রথম গ্রীষ্মের ঝিরঝিরে মিষ্টি একটা বাতাস বইছে। তার মন্দ মধুর পরশে দেহ-মন একেবারে জুড়িয়ে যায়। রৌদ্র-দীপ্ত বিচ্ছুরিত সোনালি তরঙ্গমালার দিকে লুসি অপলক তাকিয়ে রয়েছে। ওপরের ডেক থেকে আসছে শিশুদের মুখর কলহাস্য,, কিন্তু হৃদয়টাকে মনে হচ্ছে যেন একটা অনড় পাথরের মতো। বাচ্চাটা জেগে উঠে ওর কোলের মধ্যে খেলা করছে আর সত্যিই জেগে আছে কিনা তা পরখ করার জন্যে যেন কচি হাতে বারবার মার চিবুকে আঘাত করছে। এক সময়ে যেন হঠাৎ নির্ঝরের স্বপ্ন ভেঙে মা শিশুটিকে নিবিড় করে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরল। তখনই ওর মসৃণ চিবুক বেয়ে নেমে এল অশ্রুধারা। তারপর ধীরে ধীরে একসময়ে ওকে অনেকটা শান্ত মনে হলো।

লুসির বাচ্চাটা অসম্ভব ছটফটে, মাকে মুহূর্তের জন্যেও স্থির থাকতে দিচ্ছে না, সবসময়েই কোল থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

তাই দেখে নিচের ডেকে তার ক্রীতদাস-দাসীদের তদারক করতে আসা অন্য একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক বললেন, 'বাঃ, ছেলেটি ভারি সুন্দর দেখতে তো! কত বয়স এর?'

লুসি ছোট্ট করে জবাব দিল, 'সাড়ে দশ মাস।'

ভদ্রলোক শিস দিতে দিতে পকেট থেকে একটা টফি বার করে বাচ্চাটার দিকে বাড়িয়ে ধরলেন, বাচ্চাটা সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে ওটা নিয়েই মুখে পুরে দিল।

ভদ্রলোক গাল টিপে বাচ্চাটাকে আদর করলেন। 'দারুণ বিচ্ছু তো! এরই মধ্যে সব বুঝে ফেলেছে।'

পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে আপন মনে শিস দিতে দিতে ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন রেলিং-এর দিকে। সেখানে একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে হ্যালি ধূমপান করছিল। ভদ্রলোক হ্যালির কাছ থেকে দেশলাইটা চেয়ে নিয়ে একটা চুরুট ধরালেন।

'ধন্যবাদ।' রেলিং-এ হেলান দিয়ে ভদ্যলোক হ্যালির দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। 'আপনার সংগ্রহ তো বেশ ভালোই দেখছি।'

'এর জন্যে কম দৌড়-ঝাঁপ করতে হয় নি।'

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তেই হ্যালি মাথা দুলিয়ে সায় দিল।

'আমার মনে হয় খামারের কাজে ওকে বিক্রি করলে বেশ ভালোই দাম পাওয়া যাবে।'

'আমারও তাই মনে হয়।' হ্যালি বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল। 'যদিও শুনেছি মেয়েটা রান্না কাজে খুব দক্ষ, তবুও ওর আঙ্গুলগুলো দেখে মনে হচ্ছে তুলো তোলার কাজে আরো বেশি দক্ষতা দেখাতে পারবে।'

'কিন্তু সেক্ষেত্রে মুশকিল হবে ওর বাচ্চাটাকে নিয়ে। অতটুকুন দুধের বাচ্চাকে নিয়ে তুলো তুলতে যাওয়া আদৌ সম্ভব হবে না।'

'সে তো বটেই। সুযোগ পেলে আমি প্রথমেই চেষ্টা করব বাচ্চাটাকেও কোথাও বিক্রি করে দিতে।'

'ইচ্ছে করলে আপনি বাচ্চাটাকে আমার কাছে বিক্রি করতে পারেন।'

'স্বচ্ছন্দে।' মুখে বললেও হ্যালি খুব একটা উৎসাহ দেখাল না।

এর পরেই শুরু হয়ে গেল দরাদরির পালা। অবশেষে হ্যালি পঁয়তাল্লিশ ডলারে বাচ্চাটাকে বিক্রি করতে রাজি হলো। এ সম্পর্কে লুসি কিছুই জানতে পারল না।

হ্যালি জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোথায় নামবেন?'

'লুসিভিলে।'

'ভালোই হবে। আমরা যখন ওখানে পৌছব, তখন সন্ধ্যে হয়ে যাবে। বাচ্চাটাও ঘুমিয়ে পড়বে .. সেই ফাঁকে সরিয়ে ফেলতে হবে। কাজটা এমন গোপনে করতে হবে যাতে ওর মা কিছু জানতে না পারে। আমি আবার কান্নাকাটি একদম পছন্দ করি না ...' বিক্রয় দলিল লিখে দেওয়ার পর ভদ্রলোক টাকা মিটিয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

লুসিভিলের জেটিঘাটে যখন স্টিমার ভিড়ল, উতরানো সন্ধ্যার নিবিড় একটা প্রশান্তি নেমে এসেছে চারদিক জুড়ে। বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই লুসি চুপচাপ বসে ছিল। বাচ্চাটা

এখন ঘুমে একেবারে কাদা। লুসিভিলের নাম কানে যেতেই লুসি বাচ্চাটাকে দুটো প্যাকিং বাক্সের মাঝে সন্তর্পণে শুইয়ে রেখে রেলিং-এর ধারে গেল, তারপর রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে জেটিঘাটে ভিড় করে দাঁড়ানো হোটেল পরিচালকদের মধ্যে ওর স্বামীকে ব্যাকুল আগ্রহে খুঁজতে লাগল। অথচ ওর আর শিশুটির মাঝে যাওয়া-আসার পথটা এখন যাত্রীদের ভিড়ে একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই অবকাশে সেই ভদ্রলোক চুপিচুপি বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলেন।

একটু পরে প্রচণ্ড শব্দে গর্জন করে, ধোঁয়া ছেড়ে স্টিমার চলতে শুরু করল। একটু একটু করে জেটিঘাটটা সরে যেতে লাগল দূরে।

একসময়ে লুসি ওর জায়গায় ফিরে এল। দেখল বাচ্চাটা নেই, কেবল হ্যালি সেখানে বসে রয়েছে।

লুসি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল। 'কী ব্যাপার! বাচ্চাটা কোথায়?'

'লুসি, তোমার বাচ্চাটা নেই। একদিন না একদিন তুমি যখন সবই জানতে পারবে, তখন আর তোমার কাছে গোপন করে কোনো লাভ নেই। তুমি যাচ্ছ দক্ষিণ দেশে, সেখানে তোমার বাচ্চাটাকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। তাই ওকে আমি এখানকার একটা লোকের কাছে বেচে দিয়েছি। ভদ্রলোক খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবারের। তোমার চাইতে অনেক বেশি যত্ন নিয়ে ওঁরা ওকে মানুষ করবেন।'

লুসি কাঁদল না বা চিৎকার চেঁচামেচি করল না, এমন কী একটা কথাও বলল না। শেলটা সোজা গিয়ে বিঁধেছে ওর হৃৎপিণ্ডের একেবারে মাঝখানে।

অবসন্ন দেহে ও বসে পড়ল। হাত দুটো শিথিলভাবে পড়ে রইল কোলের ওপর। সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু কোনো কিছুই ওর চোখে পড়ছে না। ওপরের যা কিছু শব্দ, ইঞ্জিনের গর্জন আর জলের ছলছলাৎ আর্তনাদ মিশে একাকার হয়ে স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট ওর কানে এসে প্রবেশ করছে। দুঃখ, বেদনা আর হতাশায় লুসি একেবারে পাথরের মতো নিস্পন্দ নিথর।

'আমি জানি লুসি, মা হিসেবে প্রথম প্রথম তোমার খুবই কষ্ট হবে', সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে হ্যালি নরম গলায় বলল। 'কিন্তু তোমার মতো দেখতে-শুনতে ভালো, চটপটে একটা মেয়ের পক্ষে ...'

'স্যার, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, এখন আমার সঙ্গে একটা কথাও বলবেন না।'

লুসির কণ্ঠস্বরে এমন অদ্ভুত একটা ক্রোধ মেশানো ছিল যে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী স্পষ্টই বুঝতে পারল, এখন আর মিছেমিছি ওকে ঘাঁটিয়ে কোনো লাভ হবে না, বরং সময়ই ওকে সান্ত্বনা দিতে পারবে। তাই কোনো কথা না বলে হ্যালি উঠে পড়ল আর লুসি বাচ্চার পরিত্যক্ত জামায় মুখ ঢেকে চুপচাপ বসে রইল।

এই ঘটনার শুরু থেকে শেষপর্যন্ত টম সমস্ত ব্যাপারটাই নীরবে লক্ষ করেছিল এবং এরপর পরিণতি যে কী হতে পারে তাও তার অজানা ছিল না। যদিও আইনসঙ্গত ব্যবসায় এ ধরনের ঘটনা প্রায়ই ঘটে, তবু তার মনে হলো এর চাইতে নিষ্ঠুর বর্বরতা আর কিছু হতে পারে না। অথচ তার মতো অতি তুচ্ছ একজন মানুষের পক্ষে এর বিরুদ্ধে কিছুই করার ছিল না, কেবল মেয়েটির দুঃখে নিজের হৃদয়কে নিভৃতে রক্তাক্ত করে তোলা ছাড়া।

ধীরে ধীরে টম মেয়েটির কাছে গিয়ে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে কিছু বলতেই লুসি ডুকরে উঠল, চোখের কোল বেয়ে নেমে এল জলের ধারা। বাইবেল সম্পর্কিত টমের কোনো কথাই ওর কানে গেল না, যেন ক্রোধে কান দুটো বধির হয়ে গেছে, শোকে পাথর হয়ে গেছে বুকটা।

ক্রমে ক্রমে রাত্রি নামল। ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চারদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। শুধু শোনা যাচ্ছে মৃদু তরঙ্গোচ্ছ্বাস। সুন্দর, বড় বড় চোখ দুটো মেলে দিয়ে লুসি আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু সেখান থেকেও কোনো সান্ত্বনার বাণী ওর কানে এসে পৌঁছচ্ছে না।

একটা প্যাকিং বাকসের ওপর নিজেকে টানটান করে মেলে দিয়ে টম মেয়েটির চাপা বিলাপ শুনতে শুনতে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাঝ রাত্তিরে তার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো তার পাশ দিয়ে কালো মতন কী যেন একটা চলে গেল এবং তারপরেই ঝপ করে জলে কিছু একটা পড়ার শব্দ শুনতে পেল। টম চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল মেয়েটির জায়গাটা খালি। তাড়াতাড়ি উঠে সে বৃথাই চারদিকে খুঁজে দেখল। তখন বুঝতে পারল হতভাগিনী মেয়েটা শেষপর্যন্ত চিরদিনের মতো শান্তি লাভ করেছে, এখন আর কোনো বেদনাই ওর হৃদয়কে স্পর্শ করতে পারবে না! চোখের নিমেষে এতবড় একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল, অথচ নদীর ঊর্মিল স্রোত আগেরই মতো মনের আনন্দে নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে।

উজ্জ্বল সূর্যালোকিত ভোরে হ্যালির ঘুম ভেঙে গেল। সজীব মালপত্রগুলোর খোঁজখবর নিতে এসে দেখল মেয়েটি নেই।

'কী ব্যাপার মেয়েটা গেল কোথায়?' টমকে সে জিজ্ঞেস করল।

টম বলল, 'জানি না।'

'নিশ্চয়ই রাত্তিরে ও অন্য কোনো ইস্টিশনে নেমে যায় নি। কেননা স্টিমারটা যখনই কোথাও থেমেছে, আমি কড়া নজর রেখেছি। আসলে তোদের কাউকে আমি এক ফোঁটাও বিশ্বাস করি না।'

টম নীরবে কথাগুলো শুধু শুনেই গেল, কোনো জবাব দিল না।

হ্যালি তখন বাকস গাঁটরি উল্টিয়ে স্টিমারের আগপাশ-তলা তন্নতন্ন করে খুঁজল, কিন্তু কোথাও লুসিকে খুঁজে পেল না। শেষে ফিরে এসে টমকে বলল এবার সত্যি কথাটা বল তো। আমি তোকে কাল রাত চারটে অব্দি জেগে বসে থাকতে দেখেছি, তারপর আর দেখি নি। এর মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ঘটেছে, যা তুই জানিস।'

'স্যার শেষ রাতের দিকে মনে হলো কে যেন আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। আর তখনই ঘুমটা ভেঙে গেল। তারপরেই জলে কী যেন একটা পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম এর বেশি আমি আর কিছুই জানি না।'

লুসির মৃত্যুতে হ্যালি বিস্মিত বা আদৌ মর্মাহত হলো না। শুধু পকেট থেকে ছোট খাতাটা বার করে মেয়েটির নামের পাশে লিখে রাখল, 'ক্ষতি'। মৃত্যুর চাইতে বরং এই ক্ষতির জন্যেই সে মনে মনে অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল।

বারো

ইভানজেলিন

মিসিসিপি নদী। দুপারের দৃশ্য এখন এমনই বদলে গেছে, মনে হয় যেন একটা অন্ধ কোনো দেশ। ওহিও নদী এসে পড়েছে এই মিসিসিপির বুকে এবং দুটো নদীর মিলিত ঘোলা জলভারা জোয়ারে ফুলে ফেঁপে পাগলের মতো ছুটে চলেছে সাগরের দিকে। এখানে নদী এমনই চওড়া যে পারাপার চোখে পড়ে না। স্টিমারটা নানা জায়গা থেকে যাত্রী আর পণ্য বোঝাই করতে করতে এগিয়ে চলেছে। এখন তাতে আর স্টিমারটাতে তিল ধারণের জায়গা নেই।

কোমল কোনো স্বপ্নের দেশ পেরিয়ে আসা এটা যেন একটা বাস্তব পৃথিবী। তার বেলাশেষের সূর্যটা তখন ঢলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। সমুদ্রের মতো সীমাহীন সেই নদীর জলে সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে। নদীতীরে বাতাসে কেঁপে ওঠা বেতবন আর ঝাঁকড়া সাইপ্রেসের শাখাগুলো রক্তিম একটা আভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আপন খেয়ালে এগিয়ে চলা স্টিমারের উপচে ওঠা ভিড়ের মধ্যে আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু টমকে দেখা যাচ্ছে ডেকের নিভৃত এক কোণে তুলোর একটা গাঁটরির ওপর বসে তার বাইবেলখানা মন দিয়ে পড়ছে। হ্যালির মতো লোকও এই কদিনে বিশ্বাস করে তার হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়েছে। প্রথম প্রথম সতর্ক দৃষ্টিতে দিনরাত তার ওপর কড়া নজর রাখত, কিন্তু কোথাও সামান্যতমও কোনো ত্রুটি চোখে পড়ে নি। এখন টম যেখানে খুশি যায়, প্রতিটা সালাসীর সঙ্গে গল্পগুজব করে, স্বেচ্ছায় হাসি মুখে তাদের সাহায্য করে। ওরাও টমকে ভালোবেসে ফেলেছে ঠিক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো। যখন করার মতো আর কিছুই থাকে না, টম তখন ডেকের নিভৃত একটা কোণে তুলোর গাঁটরির ওপর বসে বাইবেল পড়ে।

নিউ অর্লিয়েন্সে পৌছতে তখনো প্রায় একশ মাইল পথ বাকি কি তার চাইতেও বেশি। নদীটা বয়ে চলেছে প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু একটা মালভূমির ওপর দিয়ে। ফলে মাইলের পর মাইল চারপাশের গ্রাম, ক্ষেত খামার, ঘর বাড়ি, দুর্গের উত্তুঙ্গ চূড়া, জীবনের সমস্ত মানচিত্রটাই স্পষ্ট চোখে পড়ে।

টম দেখতে পাচ্ছে দূরের ক্ষেত-খামারের ক্রীতদাসরা কাজ করছে। আরো দূরে তাদের সারি সারি কুঠরি আর মাঝে মাঝে তাদের প্রভুদের প্রাসাদোপম সব অট্টালিকা। তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মন ছুটে যাচ্ছে সুদূর কেন্টাকি প্রদেশের সেই খামারবাড়িটায়, যেখানে সারি সারি প্রাচীন বিচগুলো গাঢ় ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মনিবের বাড়ির প্রশস্ত আঙিনার ওপারে মাল্টিফ্লোরা আর বিগনোনিয়া দিয়ে ঘেরা ছোট একটা কুঠরি। সেখানে আশৈশব যাদের সঙ্গে খেলেছে, সেই সব সঙ্গীদের পরিচিত মুখগুলো ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠছে, দেখতে পাচ্ছে ঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত তার স্ত্রীকে, শুনতে পাচ্ছে খেলায় মত্ত ছেলেমেয়েদের মুখর কলহাস্য। মনে হচ্ছে সবচেয়ে ছোট ছেলেটা যেন তার কোলের ওপর বসে পাখির মতো অনর্গল বকবক করে চলেছে। বুকের ভেতরটা সহসা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠতেই সমস্ত দৃশ্যটা যেন বদলে গেল এবং তখনই আবার দেখতে পেল নদীতীরে বাতাসে কেঁপে ওঠা বেতবন আর ঝাঁকড়া সাইপ্রেসের শাখাগুলো রক্তিম একটা আভায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ইঞ্জিনের যান্ত্রিক শব্দ তাকে খুব সহজ করেই জানিয়ে দিল, জীবনের সুখ চিরকালের মতো বিদায় নিয়ে চলে গেছে।

মনের এমনি একটা অবস্থায় যে কেউ তার স্ত্রী বা বাচ্চাদের কাছে চিঠি লিখতে পারে, কিন্তু টম লিখতে পারে না। তার কাছে ডাকঘরের কোনো অস্তিত্বই নেই, এমন কী তার আর এই বিচ্ছেদের মাঝের অন্তরীপটাতে যোগাযোগের জন্যে অন্তরঙ্গ কথার ছোট্ট কোনো সেতুও নেই। তাই নিজের মনে অন্তরঙ্গ কথার মালাগুলো গাঁথতে গাঁথতে কখনো অনবধানেই খোলা বাইবেলের জীর্ণ পাতাতে টুপটাপ ঝরে পড়ে দু-এক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু। তখনই আবার চমকে উঠে সে পড়ায় মন দেয় :

"অযথা তোমার মনকে কষ্ট পেতে দিও না। আমার পিতার ভবনে অজস্র বাসকক্ষ রয়েছে। আমি তারই একটিতে তোমার জন্য জায়গা করে দেব।"

স্টিমারের যাত্রীদের মধ্যে সেন্ট ক্লোয়ার নামে অল্প বয়েসী এক ভদ্রলোকও চলেছেন অর্লিয়েন্সে। তাঁর সঙ্গে রয়েছে পাঁচ-ছয় বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে আর একজন মহিলা। মহিলাটি সম্ভবত তাঁর কাছে আত্মীয়া এবং এঁর ওপরেই রয়েছে মেয়েটিকে দেখাশোনা করার ভার।

রঙিন প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়ানো ছোটদের ভিড়ের মধ্যেই টম বহুবার মেয়েটিকে দেখেছে। কিন্তু মেয়েটি এমনই অদ্ভুত যে একবার দেখলে ওকে আর কোনো দিনই ভোলা যাবে না। চঞ্চল মেয়েটাকে যে শুধু দেখতে সুন্দর তাই নয়, ওর লাবণ্যউজ্জ্বল দেহখানা মনে হয় যেন আশ্চর্য মিষ্টি একটা স্বপ্নে গড়া। পুরাণের কোনো দেবীর মতো ওর মুখখানা এমনই অনিন্দ্য সুন্দর যে এ পৃথিবীর বিষণ্নতম মানুষও ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কোথাও কোনো খুঁত নেই। ছোট হলেও, ওর গ্রীবাভঙ্গিমাটা সত্যিই দেখার মতো। মাথায় দীঘল একরাশ সোনালি চুল গাঢ় মেঘের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। ঘন পল্লব ঘেরা টানাটানা গভীর দুটো নীল চোখ। প্রকৃতপক্ষে স্বর্গীয় সুষমামাখা

মুখ আর টলটলে নীল চোখ দুটোই ওকে অন্যান্য বাচ্চাদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে রেখেছে, যার জন্যে বার বার সবার দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে ওর ওপর। ও যে অসম্ভব চঞ্চল বা বিষণ্ন, তা নয়, বসন্ত বাতাসের মতো কোথাও এক জায়গায় স্থির থাকতে পারছে না। গোলাপি ঠোঁটের কোণে সবসময়েই ছড়িয়ে রয়েছে আধ-ফোটা একটা হাসি, যেন সুন্দর একটা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে গান গাইতে গাইতে ও একাই হেঁটে চলেছে।

পরীদের মতো ও সবসময়েই সাদা পোশাক পরে, যেখানে খুশি যায়, যার সঙ্গে খুশি গল্প করে। স্টিমারের বিপজ্জনক জায়গাগুলো ও যখন হেলায় অতিক্রম করে, কালিঝুলি মাখা রুক্ষ হাতগুলো ওর দিকে বাড়ানোই থাকে, যদি কোনো বিপদ ঘটে! ইঞ্জিনে কয়লা-যোগানদার থেকে শুরু করে খালাসি, কুলি-কামিনরা পর্যন্তও ওর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসে। টমের কাছে ওই ছোট মেয়েটির অস্তিত্ব অনেকটা স্বর্গীয়। সে যখনই ওর দীঘল সোনালি চুল আর অতল নীল চোখ দুটো দেখতে পায়, তার মনে হয় বাইবেল থেকে এইমাত্র কোনো দেবদূত যেন নেমে এসেছে।

মেয়েটি প্রায়ই নিচের ডেকে, যেখানে হ্যালির শৃঙ্খলিত ক্রীতদাস-দাসীরা রয়েছে, সেখানে আসে, ওদের মধ্যে দিয়ে পথ করে হেঁটে যায়, এমনভাবে নীরবে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, যেন গভীর বেদনায় একেবারে ম্লান হয়ে গেছে। কখনো কখনো ভারী শেকলটা ও ফুলের মতো মসৃণ হাতে স্পর্শও করে দেখে, তারপর করুণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নতমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যায়। কখনো আবার হঠাৎই কোঁচড় ভর্তি টফি, বাদাম আর কমলা নিয়ে এসে সবাইকে ভাগ করে দেয়।

টম গভীর আগ্রহে মেয়েটিকে লক্ষ করতো কিন্তু ঠিক ভাব জমাবার মতো সুযোগ বা সাহস হয়ে ওঠে নি। চেরি ফলের বীচি দিয়ে টম সুন্দর সুন্দর সব ঝুড়ি, বুনো বাদাম দিয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত যত মুখ আর খেলনা বানাতে পারত। টমের নিপুণ দক্ষতা ছিল নানা ধরনের বাঁশি বানানোর কাজে। একসময়ে এগুলো সে বানাতে মাস্টার জর্জ আর পাড়াপড়শীদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে। এখন করে নিজেরই সময় কাটানোর জন্যে।

মেয়েটি এমনই চঞ্চল আর লাজুক যে ওকে বশে আনা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। একদিন টম একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসে খেলনা বানাচ্ছে, মেয়েটি তার পাশে এসে বসল। তারপর নিজের মনেই ছোট্ট একটা ক্যানারি পাখির মতো মিষ্টি গলায় অনর্গল বকে যেতে লাগল। এক সময়ে টম কয়েকটা খেলনা ওকে উপহার দিল। এতে মেয়েটি খুবই লজ্জা পেল, কিন্তু একটু পরে দুজনের মধ্যে বেশ ভাব জমে উঠল।

মেয়েটির আস্থা অর্জন করতে পারার পর টম জিজ্ঞেস করল, 'খুকুমনি, তোমার নামটা কী আমাকে বললে না-তো?'

'ইভানজেলিন সেন্ট ক্লোয়ার। সবাই আমাকে ইভা বলে ডাকে। তোমার নাম কী?'

'আমার নাম টম। কেন্টাকিতে ছোটরা আমাকে টম চাচা বলে ডাকত।'

'তাহলে আমিও তোমাকে টম চাচা বলে ডাকব, কেননা তোমাকে আমার সত্যিই খুব ভালো লাগে।' টমের কোলের ওপর ঝুঁকে ইভা বলল, 'তুমি কোথায় যাবে, টম চাচা?'

'আমি তো জানি না, কুমারী ইভা'

'তুমি জানো না?'

'সত্যিই আমি জানি না, ইভা। ওরা আমাকে কারুর কাছে বেচার জন্যে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোথায়, কার কাছে তা আমি বলতে পারব না।'

'আমার বাবা কিনতে পারেন', কিছু না ভেবেই ইভা বলল। 'আমাদের বাড়িতে তুমি খুব আনন্দে থাকতে পারবে। আমি আজই বাবাকে বলব।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, সোনামণি।'

ইতিমধ্যে স্টিমার ছোট একটা জাহাজঘাটে এসে থামল। এখানে কাঠ তোলা হবে। বাবার গলা শুনতে পেয়েই ইভা দৌড়ে চলে গেল। টমও উঠে পড়ল স্বেচ্ছায় কাঠ তোলার কাজে খালাসিদের সাহায্য করার জন্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

অন্যান্য যাত্রীদের মধ্যে ইভাও ওর বাবার সঙ্গে রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে কাঠ তোলা দেখছে। কাঠ তোলা শেষ হবার পর সিঁড়িটা তুলে নেওয়া হলো। জাহাজঘাটা থেকে স্টিমারটা সবে সরতে শুরু করেছে, জলের মধ্যে চাকাটা দুতিন পাক ঘুরছে কিনা সন্দেহ, হঠাৎ কীভাবে যেন টাল সামলাতে না পেরে ইভা সোজা গিয়ে পড়ল নদীর মধ্যে। হকচকিয়ে কিছু বুঝতে না পেরে নদীর জলে ঝাঁপ দিতে যেতেই, অন্যান্য যাত্রীরা মিস্টার সেন্ট ক্লেয়ারকে আটকে রাখল। কেননা ওরা আগেই লক্ষ করেছিল মেয়েটিকে উদ্ধারের জন্যে আর একজন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ইভা নদীতে পড়ে যাবার সময় টম ছিল নিচের ডেকের একেবারে সামনেই। সুতরাং মেয়েটা জলে পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও চিলের মতো ছোঁ মেরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নদীতে। তার মতো সাঁতার-জানা বলিষ্ঠ কোনো মানুষের পক্ষে কাজটা আদৌ কঠিন ছিল না। পড়ার পরক্ষণে মেয়েটাকে জলের ওপর ভেসে উঠতে দেখেই টম ক্ষিপ্রগতিতে সাঁতরে গিয়ে ওকে ধরে ফেলল, তারপর সাঁতরাতে সাঁতরাতে নিয়ে এল স্টিমারের ধারে। তখন অজস্র মানুষ নির্দ্বিধায় তাদের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে টমকে সাহায্য করার জন্যে। অল্পক্ষণের মধ্যেই ইভার সিক্ত, অবচেতন দেহটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো মেয়েদের কেবিনে। সবার আন্তরিক মিলিত প্রচেষ্টায় ইভা সুস্থ হয়ে উঠল।

পরের দিন, স্টিমার নিউ অর্লিয়েন্সের কাছাকাছি এসে পড়ায় যাত্রীদের মধ্যে জিনিসপত্র গোছগাছ করার ধুম পড়ে গেল, যাতে জেটিঘাটে স্টিমার ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিচে নামতে পারে। খালাসি আর কেবিনের পরিচারিকারাও ব্যস্ত হয়ে পড়ল স্টিমারটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার কাজে।

নিচের ডেকে টম চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। বার বার তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ছে রেলিং-এর ধারে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে বাবার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইভানজেলিনের ওপর। অন্য দিনের তুলনায় ওর মুখখানাকে যা কেবল একটু ম্লান মনে হচ্ছে, তাছাড়া গতকালের দুর্ঘটনার আর কোনো চিহ্নই নেই। ওর বাবাকেও দেখতে ঠিক ইভার মতো। একমাথা কোঁকড়ানো সোনালি চুল, স্বচ্ছ নীল দুটো চোখ, প্রতীভাদীপ্ত মুখটায় সবসময়ই জড়িয়ে রয়েছে মিষ্টি একটা হাসি।

'টমকে যদি আমি কিনতে চাই', হ্যালিকে উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কত টাকায় বিক্রি করতে পারবেন?'

হ্যালি বলল, 'খুব একটা লাভ না করে আমি তেরোশো ডলারেই ছেড়ে দিতে পারি।'

'দামটা কি বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছে না, মিস্টার হ্যালি?'

'সত্যি বিশ্বাস করুন, আমার একটুও লাভ থাকবে না। শুধু আপনার মেয়ে বায়না ধরেছে বলেই আমি ওই দামে ছেড়ে দিতে রাজি হচ্ছি। অন্য কেউ হলে টমের মতো এমন বিশ্বাসী, নম্র, বলিষ্ঠ চেহারার একজন ক্রীতদাসের জন্যে আমি দেড় হাজারের একটা কানাকড়িও কম করতাম না।'

এমন সময় ইভা বাবার গলা জড়িয়ে তার কানে কানে বলল, 'টমকে তুমি কিনে নাও, বাপি। টাকার জন্যে ভেব না। আমি জানি তোমার অনেক টাকা আছে। ওকে আমি চাই।'

হাসতে হাসতে মিস্টার সেন্ট ক্লেয়ার জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি ওকে নিয়ে কী করবে, মামণি? গল্প শুনবে, না কাঁধে উঠে ঘোড়ায় চড়বে, নাকি অন্য কোনো খেয়াল আছে?'

'আমি ওকে সুখী করতে চাই, বাপি।'

নিটোল কয়েকটা মুহূর্তের জন্যে সেন্ট ক্লেয়ার অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর ছোট্ট করে বললেন, 'আচ্ছা, তাই হবে।'

হ্যালির চাওয়া দামেই সেন্ট ক্লেয়ার টমকে কিনতে রাজি হয়ে গেলেন। হ্যালি পকেট-বই থেকে মিস্টার শেলবির সই করা দলিলখানা বের করে সেন্ট ক্লেয়ারের হাতে দিল। সেন্ট ক্লেয়ার নিতান্ত অবহেলায় সেটা নিয়ে পকেটে রেখে দিলেন।

হ্যালি তখন ইভার হাত ধরে টমের কাছে গিয়ে হাসতে হাসতে বলল 'টম তোমার নতুন মনিবের দিকে তাকিয়ে দেখ তো পছন্দ হয়েছি কিনা?'

টম মুখ তুলে তাকাতেই ইভার পাশে ওর বাবাকেও দেখতে পেল। সুন্দর মুখে অহমিকার কোনো চিহ্ন নেই, বরং মেয়েকে খুশি করতে পেরে উনি যেন নিজেই খুশি হয়েছেন। আনন্দে টমের দুচোখে তখন জল এসে গিয়েছিল। কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।'

'আমিও তাই আশা করি। তোমার নাম কী?'

'টম।'

'আচ্ছা টম, তুমি ঘোড়ার গাড়ি চালাতে পার?'

'পারি, স্যার। আগের মনিবের ওখানে আমি বহুদিন ঘোড়ার গাড়ি চালিয়েছি।'

মাকে ওই কাজেই দেব। কিন্তু সাবধান, কখনো মদ খেয়ে যেন আবার মাতলামি করো।'

টম মনে মনে বিস্মিত এবং আহত না হয়ে পারল না, তবু সংযত স্বরেই সে বলল, 'মদ আমি খাই না।'

'বাঃ, শুনে খুশি হলাম।'

ইভা বলল, 'আমাদের ওখানে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না, টম চাচা। আমার বা খুব ভালো। কাউকে কিচ্ছু বলেন না।'

'বাবার সম্পর্কে তোমার এই মনোভাবের জন্যে অসংখ্য ধন্যবাদ।' কথাটা বলে সেন্ট ক্লেয়ার হাসতে হাসতে সেখান থেকে চলে গেলেন।

তের

টমের নতুন মনিব

সেন্ট ক্লেয়ার যেহেতু আমাদের বিনম্র নায়ক, টমের জীবন সমাজের উঁচু স্তরের কিছু মানুষের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে, এখানে তাঁদের সংক্ষিপ্ত একটা পরিচয় দেওয়া দরকার।

আগাস্টিন ক্লেয়ার লুসিয়ানার অত্যন্ত ধনী একজন আবাদকারীর সন্তান। এক সময় সেন্ট ক্লেয়ারদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন ক্যানাডিয়ান। আগাস্টিনরা মাত্র দুভাই, চেহারা, চরিত্র এবং মানসিকতায় দুজনের মধ্যে সামান্যতমও কোনো মিল ছিল না। এক ভাই ভারমন্টের সমৃদ্ধশালী জমিদারিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, অন্য ভাই রয়ে গেছে লুসিয়ানার এই পৈত্রিক জমিদারিতে। আগাস্টিনের মা ছিলেন হিউগ্যান্ট ধর্মাবলম্বী ফরাসি একটি পরিবারের মেয়ে, যে পরিবারটা বহুকাল আগে থেকেই লুসিয়ানায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছিল।

চেহারা আর স্বভাবের দিক থেকে আগাস্টিন মায়েরই আদল পেয়েছিল। ছোটবেলা থেকে আগাস্টিন ছিল অসম্ভব খেয়ালি আর লাজুক প্রকৃতির। চাষাবাদ দেখার চাইতে পড়াশোনার ওপরেই তার ঝোঁক ছিল সবচাইতে বেশি। কলেজে পড়াশোনার সময়েই অত্যন্ত সরল, উন্নতমনা আর আশ্চর্য রূপসী একটা মেয়ের প্রেমে পড়ে এবং মেয়েটিকে পাবার জন্যে প্রায় পাগল হয়ে ওঠে। কিন্তু মেয়েটির বাবা-মা রাজি না হওয়ায় ওদের দুজনের সম্পর্ক ভেঙে যায়। পরবর্তী কালে মেরি নামে যে মেয়েটির সঙ্গে আগাস্টিনের বিয়ে হয়, সে মেয়েটিও রীতিমতো রূপসী এবং অগাধ পৈত্রিক ধনসম্পদের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। কিন্তু বিবাহিত জীবনে আগাস্টিন সুখী হতে পারে নি। বিশেষ করে ইভানজেলিনের জন্মের পর থেকে ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যে মেরিকে প্রায়ই শয্যাশায়ী হয়ে পড়তে হয় এবং কখনো কখনো অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় সপ্তাহে তিনদিন বিছানা ছেড়ে নড়তেই পারে না। ফলে সংসারের যাবতীয় কাজের ভার চাকর-বাকরদের হাতে। ওরাও প্রশ্রয় পেয়ে যা খুশি তাই করে। বলার কেউ নেই, ইভাকে সত্যিকারের দেখাশোনা করার নেই কেউ। সেই জন্যেই আগাস্টিন সেন্ট ক্লেয়ার ভারমন্টে গিয়েছিলেন কুমারী ওফেলিয়াকে নিয়ে আসার জন্যে।

কুমারী ওফেলিয়া আগাস্টিন সেন্ট ক্লেয়ারের সম্পর্কে চাচাতো বোন। বয়সে তাঁর চাইতেও কয়েক বছরের বড়। দুজনেরই শৈশব কেটেছে ইংল্যান্ডের ভারমন্টে। কুমারী

www.alorpathsala.org

ওফেলিয়া ছোট ভাইটিকে অসম্ভব ভালোবাসতেন। তাই যখন শুনলেন ইভাকে দেখাশোনা করার কেউ নেই, বিশেষ করে আগাস্টিনের স্ত্রীর অসুস্থতার জন্যে অত বড় একটা সংসার ডুবতে বসেছে। কেননা সংসারের প্রতি ভাইয়ের উদাসীনতা, আর অগোছালো স্বভাবের কথা ওঁর অজানা ছিল না, তাই উনি আর আগাস্টিনের মুখের ওপর কিছুতেই না করতে পারলেন না। তাছাড়া ওঁর মনে হয়েছিল ইভার মতো মেয়ে এ পৃথিবীতে সত্যিই খুব কম দেখা যায়।

কুমারী ওফেলিয়া আর আগাস্টিন সেন্ট ক্লেয়ার, দুজনের মধ্যে মানসিকতার সুন্দর একটা মিল থাকলেও স্বভাবের দিক থেকে ওফেলিয়া কিন্তু ভাইয়ের ঠিক বিপরীত। ওঁনার সবকিছুই চলে ঘড়ির কাঁটা ধরে, কাজের ধারার মধ্যেও বিশৃঙ্খলার কোনো স্থান নেই। চেহারাটা যেমন সহজ স্বাভাবিক, উজ্জ্বল কালো চোখে তাকানোর ভঙ্গিটাও তেমনি সহজ। সবার মুখের ওপরেই স্পষ্ট কথা বলেন, সরাসরি কারুর মুখের দিকে যখন তাকান, মনে হয় যেন তার ভেতরটা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। ফলে অনেকেই ওঁকে যেমন সমীহ করে, তেমনি অনেকে আবার এড়িয়ে চলতে পারলেই বেঁচে যায়।

ইভাদের গাড়িটা এসে থামল প্রাসাদোপম বিরাট একটা অট্টালিকার সামনে। মুর এবং ফরাসি স্থাপত্যরীতিতে তৈরি কারুকার্য করা এই বাড়িটা বেশ পুরনো আমলের। ভেতরে প্রকাণ্ড একটা আঙ্গিনা। আঙ্গিনার মধ্যে দিয়ে বেশ খানিকটা গেলে তবে গাড়ি বারান্দা। উল্টো দিকে সম্পূর্ণ মর্মর পাথর দিয়ে বাঁধানো একটা ফোয়ারা, তাতে অবিশ্রান্ত ধারায় ফিনকি দিয়ে উঠছে রূপালি জলস্রোত। নিচে কাচের মতো স্বচ্ছ জলে খেলে বেড়াচ্ছে দ্যুতিবিচ্ছুরিত সব রঙিন মাছ। ফোয়ারার চারপাশে মোজাইক করা পথ। পথের ওপরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফল আর ফলের বাগান, মাঝে মাঝে আশ্চর্যসুন্দর সুন্দর সব মর্মর পাথরের মূর্তি। গাড়িবারান্দার সামনেই ফুলে ফুলে ছাওয়া দুটো কমলার গাছ গাঢ় দু-টুকরো ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভেসে আসছে আরবীয় জুঁই আর রাজকীয় গোলাপের মিষ্টি খুশবু। সব মিলিয়ে সমস্ত পরিবেশটা যে শুধু কাব্যিক তাই নয়, রীতিমতো স্বপ্নিলও বটে।

বারান্দার নিচে এসে গাড়িটা থামতে না থামতেই ইভা খাঁচা খোলা পাখির মতো বিপুল আনন্দে কলকলিয়ে উঠল, 'দেখো আমাদের বাড়িটা সুন্দর নয়, তুমি বলো?'

ওফেলিয়া ওর গালটা টিপে দিয়ে আদর করে বললেন, 'সত্যিই খুব সুন্দর, মামণি।'

গাড়ির পেছন থেকে টমই প্রথম নিচে নেমে চারদিকে তাকাল। মনে মনে কিছুটা অবাক হলেও বাইরে কিন্তু সে আগেরই মতো শান্ত, স্থির। তাই আগাস্টিন ঠাট্টার সুরে বললেন, 'কী টম, আমাদের বাড়িটা তোমার পছন্দ হয়েছে তো?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

ইতিমধ্যে ঘোড়ার গাড়ির শব্দ পেয়ে দাস-দাসীরা সব ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে বয়স্ক একজন চাকরকে আগাস্টিন বললেন, 'অ্যাডলফ, আমরা ভেতরে যাচ্ছি, তুমি জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে তুলে রেখো আর আস্তাবলের ওপরের ঘরটায় টমের থাকার ব্যবস্থা করে দিও।'

ওরা পৌছবার আগেই ইভানজেলিন ডানা মেলা পাখির মতো দৌড়ে ভেতরে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে চুমু খেল।

'মা, মামনি, আমি এসে গেছি।'

গা এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকা শীর্ণ চেহারার অত্যন্ত রূপসী একটি মহিলা কোনোরকমে অল্প একটু উঠে বসল।

'এসে গিয়ে খুব ভালো করেছ, মামণি। কিন্তু বেশি দুষ্টুমি করো না। আমার ভীষণ মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।'

'আমি টিপে দেব, মামণি?'

'না, তোমাকে কিছু করতে হবে না।'

মার কথা শেষ হতে না হতেই ইভা অন্য একটি মহিলাকে ঘরে ঢুকতে দেখে তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

'ও মামি, তুমি!'

মহিলাটিও ইভাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আদর করল।

এমন সময় ওফেলিয়াকে নিয়ে আগাস্টিন ভেতরে প্রবেশ করলেন। 'মেরি, দেখো কাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।'

'ও, মিস ওফেলিয়া! কেমন আছ?' মেরি হাতটা বাড়িয়ে দিল।

পাপড়ির মতো মসৃণ হাতটা নিজের মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে ওফেলিয়া বললেন, 'ভালো। কিন্তু তোমার শরীরটা তো দেখছি খুবই ভেঙে গেছে।'

'হ্যাঁ, অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই সারাতে পারছি না।'

'এখন আর তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না', কিছুটা গর্বিত স্বরেই আগাস্টিন বললেন। 'অনেক সাধ্য-সাধনা করে আমার নিউ ইংল্যান্ডে বাস্তববাদী বোনটাকে ধরে আনতে পেরেছি। এখন থেকে ঘর-সংসার আর ইভার যা কিছু দায়িত্ব থাকবে ওফেলিয়ারই ওপরে। তুমি একটু স্বস্তিতে বিশ্রাম নিতে, পারবে।'

মেরি ম্লান ঠোঁটে হাসল। 'এখন এসব কথা থাক মামি', একটু আগে ইভা যার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন লাল পোশাকপরা বেশ লম্বা, সুন্দর চেহারার সেই পরিচারিকাটির দিকে তাকিয়ে মেরি বলল, 'মিস ওফেলিয়ার ঘরটা তুমি দেখিয়ে দাও। উনি খুব ক্লান্ত, একটু বিশ্রাম নেবেন। দেখো যেন ওঁর কোনোরকম অসুবিধে না হয়।'

টমরা এসে পৌঁছনোর কয়েকদিন পরে মেরি কুমারী ওফেলিয়া আর ইভানজেলিন বসে রয়েছে প্রাতরাশের টেবিলে, পরিচারিকা এসে চায়ের সাজসরঞ্জাম সব নিয়ে গেল।

'আসলে কী জানেন, মিস ওফেলিয়া', ম্লানস্বরে মেরি বলল, 'এই চাকর-বাকররাই আমার কাল হয়েছে। ওদের জন্যেই আমার শরীর দিন দিন এমন ভেঙে যাচ্ছে।'

ওফেলিয়া কিছু বলতে যাবার আগেই ইভা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে তুমি ওদের কেন রেখেছ, মামণি?

'কেন রেখেছি আমি নিজেই জানি না। ছোটবেলা থেকে এমন একটা অভ্যেস হয়ে গেছে যে ওদের ছাড়া আমার আবার একটা দিনও চলে না।' মেরি সেন্ট ক্লেয়ার আরাম কুর্সিটায় হেলান দিয়ে বসে ওফেলিয়ার দিকে তাকাল। 'সত্যি বলতে কী জানেন, ক্রীতদাসদের জাতটাই হলো অকৃতজ্ঞ। এই মামির কথাই ধরুন না কেন। এতটুকু বয়েস থেকে ও আমার বাপের বাড়িতে মানুষ হয়েছে। শুধু খাওয়াপরা কেন, কোনো কিছুরই অভাব আমি রাখি নি। ওর আবার রুটি মুখে রোচে না, সাদা চিনি দিয়ে কফি ছাড়া কখনো চা খায় না, আর ওর জামা-কাপড়ের ড্রয়ার খুললে আপনার তাক লেগে যাবে। আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, বাবার হাতে দুএকবার ছাড়া ও জীবনে কখনো চাবুক খায় নি। অথচ ও এমন স্বার্থপর আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। যখন আমার শরীর খুব

খারাপ হয়, রাত্তিরে এক ফোঁটাও ঘুমোতে পারি না। ও কিন্তু মোষের মতো পড়ে পড়ে ঘুমায়। এই গত রাত্তিরের কথাই ধরুন না কেন, একবার ডেকে তুলতে গিয়ে আমার যা অবস্থা হলো, তারপর ওকে ডাকতে আমার আর সাহস হয় নি।'

ইভা বলল, 'কিন্তু ও তো বছরের পর বছর তোমার পাশে বসে রাত্তির জেগেছে, মামণি?'

'ও, মামি তোমার কাছে এসব অভিযোগ করেছে বুঝি!'

'না না, মামি কোনো অভিযোগ করে নি। এমনিই গল্প করতে করতে ও বলেছে কোনো কোনোদিন রাত্তিরে তুমি খুব কষ্ট পাও।'

'হ্যাঁ, আমার কষ্টে ও তো দিনরাত একেবারে গলে যাচ্ছে।'

বোনা থামিয়ে ওফেলিয়া বললেন, 'মামি যদি না পারে তার বদলে জেন কিংবা রোজাও তো দু'একটা রাত জাগতে পারে?'

'আপনি জানেন না দিদি, ওরা সবকটা সমান। এ বাড়িতে দেখার বা বলার কেউ নেই বলে ওরা অসম্ভব অলস হয়ে গেছে। কেন, মামিরই বা অসুবিধেটা কোথায় আপনি বলুন? ইচ্ছে থাকলে দিনের বেলায় ঘুমিয়ে রাত্তিরেও ঠিকই জেগে থাকতে পারত। কিন্তু এ বাড়ির প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে ও এমন হয়ে গেছে যে ইচ্ছে করেই তা করে না।'

'ওর কি স্বামী আছে?' বোনা থেকে মুখ না তুলেই ওফেলিয়া জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ, স্বামী আর দুটো বাচ্চা আছে, বিয়ের পর আমি ওকে এখানে নিয়ে আসি। বাবা ওর স্বামীকে কিছুতেই ছাড়তে পারলেন না। ওর স্বামী আমাদের ওখানে কামারের কাজ করে। আর মামির বাচ্চা দুটো এমনই নোংরা যে আমি ইচ্ছে করেই ওদের এখানে আনতে দিই নি। প্রথম প্রথম ও কিন্তু এতটা স্বার্থপর ছিল না, কিন্তু এখন ঘুমোতে পারলে আর কিছু চায় না। আপনি জানেন না দিদি, ও বসে বসে, এমন কী হাঁটতে হাঁটতেও ঘুমাতে পারে।'

'মামণি' চেয়ার ছেড়ে আস্তে আস্তে উঠে ইভা নরম হাতে মার গলাটা জড়িয়ে ধরে মিষ্টি করে বলল, 'তুমি যদি রাগ না কর, আমিও তো তোমার পাশে দুএকটা রাত জেগে থাকতে পারি। তুমি দেখো, আমি একটুও দুষ্টুমি করব না।'

মেয়ের সোনালি চুলে হাত বুলোতে বুলোতে মেরি হাসল। 'দুষ্টুমির জন্যে না, মামণি। ছোটরা রাত জাগতে পারে না। ছোটদের রাত জাগা উচিতও নয়।'

'তুমি বিশ্বাস করো, মামণি।' আহ্লাদি সুরে ইভা বলল, 'বিছানায় শুয়ে অনেকদিন আমি একা একা রাত জেগে থেকেছি, আমার একটুও কষ্ট হয় নি।'

'কেন শুধু শুধু এমন রাত জেগে থাক?'

'এমনিই রোজ রাত্তিরে আমি অনেককিছু ভাবি, কোনো কোনো দিন রাত্তিরে আমার একদম ঘুম আসে না।'

'না না, এমন করো না, এ অভ্যেসটা খুব খারাপ। ঠিক আছে, তুমি বরং এখন খেলতে যাও। তাছাড়া বড়দের এসব কথা তোমার শুনতে নেই।'

কোনো কথা না বলে ইভা মা আর ফুপুর গলা জড়িয়ে ধরে ফুলের পাপড়ির মতো মিষ্টি ঠোঁটে চুমু দিয়ে ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ইভা চলে যাবার পর মেরি ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস যেলল। 'মাঝে মাঝে ইভার জন্যে আমার সত্যিই খুব ভাবনা হয় ...'

'না না, ওর জন্যে তুমি কিছু ভেবো না', ওফেলিয়া দ্রুত বাধা দিলেন। 'ইভা খুব ভালো মেয়ে। ওর মতো সুন্দর মেয়ে আমি আর একটাও দেখি নি।'

'যাই বলুন, ইভা কিন্তু অদ্ভুত। ও ঠিক আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক।'

'ওর যত ভাব সব ওই ক্রীতদাস-দাসীদের সঙ্গে, তা সে ছোট হোক বা বড়ই হোক। ওদের সঙ্গেই ওর শোয়া-বসা, খেলাধুলো, গল্প-গুজব সব। ওদের সঙ্গে যে আমাদের একটা তফাৎ আছে, সেটা আমি ওকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। আর ওর বাবাও এসব দেখেও দেখে না।'

'ইভা এখন ছোট, ওর এসব বুঝতে না যাওয়াই তো ভালো।' কুমারী ওফেলিয়া প্রতিবাদ না করে পারলেন না।

সম্ভবত ওর কথাটা মেরির মনঃপূত হলো না, তাই কিছুটা ক্ষুব্ধস্বরেই ও বলল, 'ইভা না হয় ছোট, কিন্তু ওর বাবা তো আর ছোট নয়। ওর বাবাই ওকে প্রশ্রয় দেয় সবচাইতে বেশি। তাছাড়া চাকর-বাকরদের কখনো কিছু বলে না। এতে আস্কারা পেয়ে পেয়ে ওরা একেবারে মাথায় চড়ে বসেছে। এ বাড়িতে ওরা যার যা খুশি তাই করে। আর আমি যদি এ সম্পর্কে কিছু বলতে যাই, এমনভাবে বুঝিয়ে দেবে যেন সব দোষ আমারই। অথচ দিনের পর দিন ওরা যে একেবারে অলসের বেহদ্দ হয়ে যাচ্ছে সেদিকে কারুর নজরই নেই।'

'আবার ওদের কুড়েমি সম্পর্কে সেই পুরনো রেকর্ডটা বাজাতে শুরু করেছ তো?' খবরের কাগজটার খোঁজে এসে আগাস্টিন স্ত্রীর শেষ কথাগুলো শুনতে পেয়ে হাসতেই হাসতেই মন্তব্য করলেন।

'আমি তোমাকে কতবার বলেছি না তুমি কখনো এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবে না।'

'আমার ধারণা ছিল, আমি বেশ ভালো কথা বলতে পারি। ঠিক আছে, তোমার যখন পছন্দ নয়, তুমি যেভাবে চাইবে আমি সেইভাবেই বলব।'

ঠোঁট ফুলিয়ে মেরি বলল, 'আমাকে তুমি রাগাবে না বলে দিচ্ছি।'

'বেশ তুমি যখন চাও না, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই রাগাব না।' আগাস্টিন সেন্ট ক্লেয়ার আপন মনে শিস দিতে দিতে খবরের কাগজখানা তুলে নিলেন।

'আমি তো তোমাকে বহুবার নিষেধ করেছি আগাস্টিন, আমার সামনে কখনো এমন বিশ্রীভাবে শিস দেবে না। এতে আমার সত্যিই খুব মাথা ধরে।'

'ওহো! আমি একদম ভুলেই গিয়েছিলাম। তুমি আর কী কী যেন আমাকে নিষেধ করেছিলে?'

'আচ্ছা, আমার প্রতি তোমার কি একটুও সহানুভূতি নেই?' মেরি করুণ চোখে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল।

'কে বললে নেই?' একই ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে আগাস্টিন জবাব দিলেন। 'তুমি যে আমার অনুযোগকারিণী!'

'এভাবে কথা বললে আমি কিন্তু সত্যিই রেগে যাব, আগাস্টিন।'

'বেশ তো, কীভাবে কথা বললে তুমি খুশি হবে আমাকে বলো।'

www.alorpathsala.org

এমন সময় বাইরের আঙ্গিনা থেকে ভেসে এল খুশিতে উপচে ওঠা মিষ্টি হাসির কলতান। সেন্ট ক্লেয়ার উঠে গিয়ে জানলার রেশমি পর্দাটা সরিয়ে দিলেন। বাইরের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে তিনি ইঙ্গিতে ওফেলিয়াকে কাছে ডাকলেন।

জানলা দিয়ে স্পষ্ট দেখা গেল আঙ্গিনার ওপারে, গাছের গুড়ির চারপাশে শেওলাপড়া বাঁধানো বেদিটার ওপর টম নিশ্চল হয়ে বসে রয়েছে আর তার জামার প্রতিটা বোতামঘর জুঁইফুল দিয়ে সুন্দর করে সাজানো হয়েছে। টমের গলাতেও ঝুলছে বেশ বড় একটা রক্ত গোলাপের মালা। ইভা তার কোলের ওপর বসে হাততালি দিয়ে হাসতে হাসতে একেবারে লুটিয়ে পড়ছে।

'ইস্, টম চাচা, তোমাকে এখন যা অদ্ভুত দেখাচ্ছে না!'

টম ইভার আনন্দ দেখে মুচকি মুচকি হাসছে।

আগাস্টিন চাপাস্বরে বললেন, 'সত্যি ওফেলিয়া, চোখ বুঝে ভাব তো একবার, নিঃস্ব রিক্ত এইসব মানুষদের জীবনে যদি শিশুরা না থাকত, তাহলে ওদের জীবনটা কী দুর্বিষহ হয়ে উঠত বল তো? আমাদের কাছে শিশুরা যেমন আমাদের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি, ওদের কাছে ওদের শিশুরাও ঠিক তেমনি প্রতিচ্ছবি। হয়তো এই ইভাকে দেখেই টম এখন তার নিজের ছেলে-মেয়েদের কথা ভাবছে। আর ইভার কাছে টম সত্যিকারের একজন নায়ক। যার গল্প ওর কাছে রূপকথা, যার গান ওর কাছে স্বর্গীয়, যার পকেটের টুকিটাকি খেলনা ওর কাছে দামি দামি রত্নের চাইতেও মূল্যবান। আর ইভা টমের জন্যে মালা গাঁথবে বলে সব চাইতে ভালো রক্ত গোলাপগুলোকেই নির্বাচন করে নিয়েছে। এর চাইতে সুখের আর কী হতে পারে তুমি বলো?'

রোববার সকালে গির্জায় যাবে বলে মেরি বারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওর পরনে সেবার রানির মতো ধবধবে সাদা রেশমি পোশাক, গলায় দামি একটা মুক্তোর মালা। গাড়ি-বারান্দার নিচে টম গাড়ি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। ছিমছাম, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাকে তার চেহারাতেও ইতিমধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে।

বিদায় জানাতে এসে ইভা দেখল মামি তার ঘরে শুয়ে রয়েছ।

'আমি মার সঙ্গে গির্জায় যাচ্ছি।'

'শুনে খুব খুশি হলাম, সোনামণি।' মামি উঠে বসল।

'কী ব্যাপার মামি, তোমার কি শরীর খারাপ?'

'হ্যাঁ, কয়েকদিন ধরে খুব মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে।'

মামির কথা শুনে ইভার ফুলের মতো সুন্দর মুখখানা চকিতে ম্লান হয়ে গেল। 'তুমি বরং আমার এ ভিনেইগ্রেটটা নাও।'

'হা ঈশ্বর, এ তুমি কী বলছ, দিদিমণি!' মামি মনে মনে শুধু সংকুচিত নয়, আতঙ্কিতও হয়ে উঠল। 'হীরে-বসানো সোনার তোমার এই সুন্দর জিনিসটা আমি নেব কেমন করে? তাছাড়া গির্জায় ওটা হয়তো তোমারই কাজে লাগতে পারে।'

'আমার কোনো কাজে লাগবে না। বরং এটা তোমারই বেশি কাজে লাগবে দেখো। তুমি না করো না মামি, লক্ষ্মীটি।'

কারুকার্য করা সোনার সুন্দর আধারটা মামির বুকের মধ্যে গুজে দিয়ে, ওর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে ইভা আবার দৌড়ে বারান্দায় ফিরে এল। এখন বাবার সঙ্গে ওফেলিয়া ফুপুও অপেক্ষা করছেন।

'এতক্ষণ তুমি মামির ঘরে কী করছিলে?'

'মামির খুব মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, মা। তাই ওকে আমার ভিনেইগ্রেটটা দিতে গিয়েছিলাম।'

'ইভা!' বিস্ময়ে মেরি প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। 'তোমার অমন সুন্দর দামি জিনিসটা ওকে দিয়ে দিলে? যাও, এই মুহূর্তে গিয়ে ওটা ফিরিয়ে নিয়ে এসো।'

নীরবে কয়েক মুহূর্তে মার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকার পর ইভা ধীরে ধীরে দৃষ্টি আনত করে নিল।

মেয়ের সেই বেদনাহত মূর্তির দিকে তাকিয়ে আগাস্টিন দৃঢ়স্বরেই বললেন, 'মেরি, তুমি ওকে কিছু বলো না। ওর যা খুশি তাই করতে দাও।'

'বাবা হয়ে তুমি ও কথা কী করে বলতে পারলে, আমি সেটাই বুঝতে পারছি না!' মেরি এবার রীতিমতো ঝাঁঝিয়ে উঠল। 'এরপরে ও যখন বড় হবে, কী অবস্থা হবে একবার বুঝতে পারছ?'

'সে একমাত্র ঈশ্বরই জানেন।' নিস্পৃহ গলায় আগাস্টিন বললেন। 'তবে আমার তো মনে হয়। তোমার বা আমার চাইতে ও বেশ ভালো ভাবেই স্বর্গে পৌঁছতে পারবে।'

'না না, বাবা', বাবার হাতটা আলতো করে জড়িয়ে ধরে ইভা বলল, 'এভাবে বললে মামণি সত্যিই খুব কষ্ট পায়।'

'ঠিক আছে ওফেলিয়া', আগাস্টিন বললেন, 'মিছেমিছি আর দেরি না করে এবার তোমরা বেরিয়ে পড়ো।'

ওফেলিয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন, তুমি যাবে না?'

'ধন্যবাদ, আমি যাচ্ছি না।'

মেরি ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'ও আবার কোনোদিন গির্জায় যায় নাকি? চাকর-বাকরদের মতো ও-ও ধর্মের ধারে-কাছে ঘেঁষে না।'

আগাস্টিন স্ত্রীর মন্তব্য গায়ে না মেখেই ইভাকে বললেন, 'ভালো না লাগলে তোমারও যাবার দরকার নেই। বাড়িতে আমরা দুজনে বেশ একসঙ্গে খেলতে পারব।'

'আমার মনে হয় গির্জাতে যাওয়াই ভালো, বাপিসোনা।' মৃদুভাবে ইভা বলল।

'কেন পুসিসোনা; চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে তোমার তো ওখানে ঘুম পেয়ে যায়?'

'হ্যাঁ, ঘুম পেয়ে যায়, আর একটুও ভালো লাগে না। ওর চাইতে টম চাচা অনেক ভালো প্রার্থনা করে। প্রার্থনা করতে করতে টম চাচার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। তবু আজ আমি জেগে থাকার চেষ্টা করব, বাপিসোনা।'

'কী হবে শুধু শুধু কষ্ট করে মামণি?'

ইভা বাপির কানে কানে বলল, 'ফুপুও বলেছে, ঈশ্বর আমাদের সবাইকে কাছে চান, আর আমরা যে যা চাই উনি আমাদেরকে তাই-ই দেন। তাই আমি ওঁর কাছে যাব সবার জন্যে প্রার্থনা করতে।'

'তাহলে তুমি যাও, মামণি', সেন্ট ক্লেয়ার মেয়ের মাথাটা নিবিড় করে বুকের মধ্যে চেপে ধরে ওর সোনালি চুলে চুমু দিলেন। 'আমার জন্যেও প্রার্থনা করো।'

'নিশ্চয়ই, আমি সবসময়েই করি, বাপি।'

ছেড়ে দিতেই ইভা লাফিয়ে গাড়িতে উঠে মার পাশে গিয়ে বসল। টমও মুখে বিচিত্র শব্দ করে লাগাম নাড়িয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল।

আগাস্টিন একটা চুরুট ধরিয়ে নিষ্পলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন।

তোরণ পেরিয়ে গাড়িটা রাস্তার বাঁকে হারিয়ে যেতেই মেরি বলল, 'চাকর-বাকরদের প্রতি দয়া দেখানোটা খুবই ভালো ইভানজেলিন, কিন্তু ওদের সঙ্গে আত্মীয়ের মতো সম্পর্ক গড়ে তোলাটা ঠিক নয়। মামি অসুস্থ হলে ওকে নিশ্চয়ই সহানুভূতি জানাতে পারো, কিন্তু অত দামি সোনার অমন সুন্দর জিনিসটা দিয়ে দিতে পার না বা ওকে তুলে এনে নিজের বিছানায় শোয়াতে পার না।'

'আমার তো তাই-ই ইচ্ছে করে, মামণি', খুব আস্তে আস্তেই ইভা বলল। 'এতে যেমন ওকে দেখাশোনা করা সহজ, তেমনি ওর চাইতে আমার বিছানাটা নরম বলে ওর কষ্টও অনেক কম হবে।'

মেয়ের জবাবে মেরি স্পষ্টতই হতাশ হয়ে উঠল, ওফেলিয়ার দিকে ফিরে বলল, 'ওকে এখন আমি কী করে বোঝাই বলেন তো?'

'ওকে এখন বোঝাবার কোনো দরকার নেই, পরে বড় হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।' হালকাভাবেই ওফেলিয়া কথাটা বললেন।

সেই মুহূর্তে ইভাকে বেশ ম্লান আর অপ্রতিভ মনে হলো, কিন্তু বেশিক্ষণের জন্যে তা স্থায়ী হলো না। টগবগিয়ে ছুটে চলা গাড়িটার জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ কী যেন একটা দেখে ইভা নিজের মনেই খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

চৌদ্দ

স্বাধীন মানুষটার প্রতিরোধ

বৃদ্ধ ভ্যান ট্রম্পের খামারবাড়িটায় যাত্রার আয়োজন তখন প্রায় সম্পূর্ণ বললেই চলে। বেলা শেষের ম্লান সূর্যটা যখন ঢলে পড়েছে পশ্চিমের আকাশে, গোধূলির রাঙা আলোয় গাছগাছালির ছায়াগুলো দীর্ঘ থেকে আরো দীর্ঘতর হয়ে উঠেছে, একজন কোয়াকার এসে বৃদ্ধ ভ্যান ট্রম্পের কানে কানে খবর দিয়ে গেল, জর্জ হ্যারিস, তার বউ আর জিমকে ধরার জন্যে ছয়-সাত জনের একটা দল খুব শিগগিরই পেছনের সরাইখানা থেকে রওনা দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

অপ্রত্যাশিত এই সংবাদে বৃদ্ধ আদৌ বিস্মিত হলেন না, বরং ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে সুস্থে ভেতরে গিয়ে স্ত্রীকে বললেন অতিথিদের আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হবে, উনি যেন ওদের তাড়াতাড়ি খাবার ব্যবস্থা করে দেন। তারপর ছয় ছেলের একজনকে পাঠালেন ওঁর বন্ধু ফিনিয়াস ফ্লেচারের কাছে, সে যেন ঘোড়ায় টানা ওয়াগনটা নিয়ে এখনি একবার চলে আসে।

এই প্রসঙ্গে পাঠকদের জানিয়ে রাখি : উড়ো একটা খবরের ভিত্তিতে জর্জ জিমকে নিয়ে ওহিও নদীর সেই ছোট সরাইখানায় এসে হাজির হয়েছিল এবং সেই ভদ্রমহিলার কাছ থেকে খবর নিয়ে এলিজা আর হ্যারির খোঁজ করতে করতে অবশেষে আজই সকালে এই বৃদ্ধ ভ্যান ট্রম্পের খামার বাড়িটায় এসে পৌঁছতে পেরেছে। জিমের সঙ্গে তার মাও রয়েছে। স্বামীকে দেখে এলিজা যত না খুশি হয়েছিল, অবাক হয়েছিল তার চাইতেও বেশি। কেননা স্বামীর চেহারার এই আমূল পরিবর্তন দেখে কী যেন একটা অশুভ আশঙ্কায় ওর বুক কেবলই কেঁপে কেঁপে উঠছিল। কিন্তু অসম্ভব ক্লান্ত থাকায় জর্জ বেশি কথা বলতে পারে নি, সামান্য কিছু খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এলিজা কিন্তু সারাক্ষণই জেগে বসেছিল স্বামীর পাশে। তাই বিকেলে একসময় ঘুম ভাঙতেই জর্জ দেখতে পেল সুন্দর টানাটানা দুটো চোখ ব্যাকুল আগ্রহে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

'জর্জ!'

এখনই এত মুষড়ে পড়লে চলবে না, লিজি। যেভাবে হোক আমাদের কানাডায় পৌঁছতেই হবে।'

'কিন্তু তার আগে ওরা যদি আমাদের ধরে ফেলে?'

'ধরতে পারবে না। আমার শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকা পযন্ত কেউ তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আজ আমি সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে গেছি। এখন আমার প্রতিটা শিরা-উপশিরায় বইছে স্বাধীন মানুষের রক্ত। তাছাড়া আমার পাশে যখন জিম রয়েছে তখন আমি আর কোনো কিছুকেই পরোয়া করি না।'

এমন সময় বৃদ্ধ ভ্যান ট্রম্পের মেয়ে র‍্যাচেল এসে জানালো অতিথিদের জন্যে রাতের খাবার দেওয়া হয়েছে, কেননা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের বেরিয়ে পড়তে হবে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার আগেই ফিনিয়াস ফ্লেচার তার গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছিল। ওটা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে উঠোনের অস্পষ্ট আঁধারে। সিমেয়ন হ্যালিডের পাশে দাঁড়িয়ে ফিনিয়াস চাপা গলায় কথা বলছে। দুজনের চেহারা সম্পূর্ণ বিপরীত। বড় ছেলে সিমেয়ন হ্যালিডে লম্বায় ছয় ফুটের ওপর, বাবারই মতো বলিষ্ঠ চেহারা। চেহারার তুলনায় মুখখানা অসম্ভব সরল। ফিনিয়াস ফ্লেচার মাথায় বেশ খানিকটা লম্বা হলেও, বেতের মতো তার রোগা লিকলিকে চেহারা। তবে চেহারাখানা যে পেটা লোহার মতো মজবুত, সেটা ওর হাত দুটো দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। মাথায় লালচে চুল, চঞ্চল, সতর্ক চোখ দুটোয় ফুটে ওঠে নিপুণ তৎপরতারই প্রতিচ্ছবি। আপাত চোখে দেখলে মনে হবে লোকটা নিজের সম্পর্কে অসম্ভব গর্বিত।

আর দেরি না করার জন্যে বৃদ্ধ ভ্যান ট্রম্প তাড়া লাগালেন। জর্জ, জিম আর এলিজাদের বেরিয়ে আসতে দেখে ফিনিয়াস তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে গাড়ির ভেতরে বসার জায়গাগুলো ঠিক করে দিল। এলিজার বুকের ওপর হ্যারি ঘুমিয়ে পড়েছে, জিমের বৃদ্ধা মা

এমনভাবে ছেলেকে আঁকড়ে রয়েছে যেন রাতের অন্ধকারে যেকোনো দিক থেকে শত্রুরা অতর্কিতে হানা দিতে পারে। ওদের পেছনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির মেয়েরা। এই অল্প কদিনের উষ্ণ আন্তরিকতায় এলিজা আর হ্যারির প্রতি সবারই একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল।

সবাই গাড়িতে ওঠার পর বাড়ির কর্ত্রী দুটো পুঁটলি এলিজার হাতে দিলেন। একটাতে সবার জন্যে কয়েক দিনের খাবার আর অন্যটাতে হ্যারির জন্যে কয়েকটা জামা, মোজা, টুপি, ইত্যাদি।

বাবা, মা মেয়ে ছেলে সবাই একসঙ্গে বিদায় জানাল।

'বিদায় বন্ধুরা আমার, বিদায়!'

ভেতর থেকে সবার একসঙ্গে মিলিত জবাব এল, 'ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুক!'

ফিনিয়াস চালকের আসনে গিয়ে বসল। ভ্যান ট্রম্প ওকে বললেন, 'তোমরা এগিয়ে যাও। আমি মাইকেল ক্রসকে খবর পাঠাচ্ছি। সবচেয়ে তেজি ঘোড়াটা নিয়ে সেও তোমাদের পেছন পেছন যাবে বিপদ বুঝলে আমাকে ফাঁকা বন্দুকের আওয়াজ করে তোমাদের সংকেত দেবে। আর কোথাও কোনো অসুবিধে হলে ওকে দিয়ে আমার কাছে একটা খবর পাঠাবে।'

'ধন্যবাদ, ভ্যান ট্রম্প, এদের জন্যে তুমি কিছু ভেবো না। ওদিকের পথঘাট আমার সব খুব ভালোই জানা আছে।'

'তাহলে আর একটুও দেরি করো না।'

ফিনিয়াস গাড়ি ছেড়ে দিল।

এবড়োখেবড়ো পাহাড়ি পথে প্রচণ্ড দুলুনি আর চাকার কর্কশ শব্দে কিছু শোনা সম্ভব নয় বলে সবাই চুপ করে রয়েছে। একটু পরে বিপুল অন্ধকার ভাসিয়ে চাঁদ উঠল। ফলে জ্যোৎস্নার আঁধারকে এখন আর তত গাঢ় মনে হচ্ছে না। কখনো পাহাড়, কখনোবা উপত্যকার ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে পথটা এঁকেবেঁকে চলে গেছে। চাকার উৎকট শব্দে হ্যারি প্রথমটায় জেগে উঠেছিল, এখন মার কোলের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। বৃদ্ধার মুখ থেকেও একটু একটু করে মুছে গেছে ভয়ের চিহ্ন। এখন আরোহীদের চোখের পাতাগুলো ঘুমে জড়িয়ে আসতে চাইছে। শুধু ঘুম নেই চালক ফিনিয়াসের চোখে। আপন মনে শিস দিয়ে গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সে যতটা সম্ভব জোরেই গাড়িটাকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে।

রাত তিনটে নাগাদ হঠাৎ জর্জই প্রথম ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেল। শব্দটা মনে হলো কিছুটা দূরে, ওদের গাড়ির ঠিক পেছনেই। জর্জ জিমের কানে কানে বলল, 'তোমার পিস্তল দুটো ঠিক আছে তো, জিম?'

'হ্যাঁ, জর্জ।'

'ওরা যদি আমাদের ধরতে আসে তাহলে তোমাকে কী করতে হবে আশা করি নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না।'

'নিশ্চয়ই না। তুমি কী ভাবো আমি আবার বুড়ো-মাকে ধরে নিয়ে যেতে দেব?'

'ধন্যবাদ, জিম।'

ঘোড়ার খুরের শব্দ এখন আরো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কনুই দিয়ে জর্জ আলতো করে খোঁচা মেরে ফিনিয়াসের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ফিনিয়াস ঘোড়া দুটোর রশি টেনে ধরে গাড়ি

থামিয়ে কান পেতে শুনল। খুব মন দিয়ে শোনার পর সে বলল, 'ও নিশ্চয়ই মাইকেল ক্রস। আমি ওর ঘোড়ার খুরের শব্দ চিনি।'

মুখে বললেও উদ্বিগ্নতার ভাবটা কাটিয়ে উঠে ফিনিয়াস সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত হতে পারল না। তাই নিজের আসনে উঠে দাঁড়িয়ে ছাদের ওপর দিকে ঝুঁকে পেছনের পথের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইল।

একটুপরে দূরের একটা পাহাড়ি চড়াইয়ের ওপর একজন সওয়ারিকে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। লোকটা ঝড়ের বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। ফিনিয়াস বলল, 'মাইকেল বলেই মনে হচ্ছে!'

জর্জ, জিম দুজনেই গাড়ি থেকে নেমে পেছনের দিকে গিয়ে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগল। লোকটাও দ্রুত এগিয়ে আসছে। সবাই নিশ্চুপ। উপত্যকার একটা ঢাল বেয়ে নিচে নেমে যেতেই লোকটাকে আর দেখা গেল না, কিন্তু তার ঘোড়ার খুরের শব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। শব্দটা যতই চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে লাগল অদৃশ্য সওয়ারিকে ততই ওদের কাছে মনে হতে লাগল। অবশেষে লোকটিকে আবার একটা চড়াইয়ের ওপর দেখা গেল।

'ওই তো মাইকেল!' নিজের অজান্তেই যেন ফিনিয়াস কথাগুলো বলল, তারপর গলা চড়িয়ে হাঁক পাড়ল, 'কে হে, মাইকেল নাকি?'

'কে, ফিনিয়াস?'

'হ্যাঁ, আমি।' লোকটা কাছে আসার পর জিজ্ঞেস করল, 'কোনো খবর আছে নাকি?'

'হ্যাঁ, আমাদের ঠিক পেছনেই ওরা আসছে।'

'সংখ্যায় ওরা কত জানো?'

'আট-দশ জন।' হাঁফাতে হাঁফাতে মাইকেল জবাব দিল।

'তবে নেশায় একেবারে ডুবে আছে। নিজেদের মধ্যে এমনভাবে চিৎকার চেঁচামেছি করছে, দেখলে মনে হবে একপাল হিংস্র-নেকড়ে।'

মাইকেলের কথাগুলো শেষ হতে না হতেই শোনা গেল দূর থেকে নিশান্তিকার স্বচ্ছ বাতাসে ভেসে আসা কতকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ।

ফিনিয়াস বলল, 'চটপট সবাই গাড়িতে উঠে পড়ো। যুদ্ধ যদি ওদের সঙ্গে করতেই হয়, তাহলে তার আগে আমি তোমাদের একটা নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে চাই।'

জর্জ আর জিম গাড়িতে লাফিয়ে উঠতেই ফিনিয়াস চাবুক হাঁকিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। মাইকেল ঘোড়ায় চড়ে চলল ওদের পাশাপাশি। তুষার-ছাওয়া পাহাড়ি পথে গাড়িটা প্রচণ্ড শব্দে হেলে দুলে লাফিয়ে লাফিয়ে প্রায় ঝড়ের বেগে উড়ে চলেছে। ওদিকে কিন্তু পিছু-ধাওয়া করে আসা সওয়ারিদের ঘোড়ার খুরের শব্দও স্পষ্ট থেকে ক্রমশ স্পষ্টতর হয়ে উঠছে। গাড়ির আরোহীরা সবাই তা কান পেতে শুনতে শুনতে শঙ্কাতুর চিত্তে দূরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। ভোরের রাঙা আলোয় উদ্ভাসিত আকাশের পটভূমিতে একসময়ে অন্য একটা শৈলচূড়ায় অশ্বারোহী মূর্তিগুলোকেও দেখা গেল। ওদের উল্লসিত চিৎকার শুনে বোঝা গেল ওরা এবার গাড়িটাকে পরিষ্কার দেখতে পেয়েছে।

এলিজা হতাশায় ভেঙে পড়ে হ্যারিকে শক্ত করে বুকের মধ্যে চেপে ধরল, জিমের মা আর্তস্বরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাতে লাগল। জর্জ আর জিম শক্ত মুঠোয় পিস্তল দুটো আঁকড়ে ধরে নিশ্চল পাথরের মতো চুপচাপ বসে রয়েছে।

পিছু ধেয়ে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ যত কাছে এগিয়ে আসছে, গাড়িটা ততই জোরে ছুটে চলেছে। হঠাৎ এক সময়ে বেশ বড় একটা বাঁক নিতেই গাড়িটা গভীর একটা খাদের প্রান্তে এসে পৌছল দুদিকেই মসৃণ খাড়া পাহাড় একেবারে সোজা প্রাচীরের মতো অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। সামনে ত্রিশ ফুটের বেশি গভীর একটা গিরিখাদ। হঠাৎ নিচে তাকালে মনে হবে ওরা যেন একটা ঝুলন্ত পাথরের চাতালের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে আর মাথার ওপরে ভোরের রাঙা আলোয় উজ্জ্বল আকাশটার দিকে তাকালে মনে হবে পৃথিবী থেকে নির্বাসিত হয়ে যেন ছোট্ট একটা জায়গায় বন্দি হয়ে রয়েছে।

এই জায়গাটা ফিনিয়াস ফ্লেচারের খুব ভালোই চেনা। এক সময়ে সে ছিল সুদক্ষ শিকারি। বন্দুকের নিশানা ছিল যেমন অব্যর্থ, তেমনি তার সাহসও ছিল দুর্জয়। গহন অরণ্য আর দুর্গম গিরিকন্দরে ঘুরে বেড়ানোটাই ছিল তার নেশা। পরিচিত এই জায়গাটাতে পৌছবার জন্যেই সে এতক্ষণ প্রাণপণ শক্তিতে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছিল।

ঘোড়ার রাশ টেনে গাড়ি থামিয়ে সে বলল, 'এইখানে আমরা পৌঁছে গেছি!' তারপর নিজেই গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে এল। 'চটপট সবাই বেরিয়ে এসো। আমার সঙ্গে ওপারের ওই পাহাড়টায় যেতে হবে। মাইকেল, তোমার ঘোড়াটা গাড়ির সঙ্গে যুতে গাড়িটাকে আমারিয়ার ওখানে ছুটিয়ে নিয়ে যাও। ওই লোকগুলোর সঙ্গে মোলাকাত করার জন্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমারিয়া আর ওর ছেলেগুলোকে সঙ্গে নিয়ে এসো।'

ততক্ষণে সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে।

ফিনিয়াস হ্যারিকে কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, 'তোমরা দুজনে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে এসো। এবার কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে ছুটতে হবে।'

কাউকেই বিশদভাবে বুঝিয়ে বলার দরকার হলো না। জিম তার বৃদ্ধা-মাকে কাঁধে তুলে নিল, জর্জ এলিজার হাত শক্ত করে ধরে ফিনিয়াসের পেছন পেছন দৌড়াতে লাগল। এত ব্যস্ততার মধ্যেও এলিজা কিন্তু পুঁটলি দুটোকে সঙ্গে নিতে ভোলো নি। মাইকেলও নিমেষে নেমে ঘোড়াটাকে গাড়ির সঙ্গে বেঁধে আগের পথেই দ্রুত ফিরে গেল।

খাঁড়ির একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পৌছানোর পর ফিনিয়াস বলল, 'চলে এসো। এটা আমাদের শিকারের পুরনো আস্তানা।'

নক্ষত্র আর ভোরের প্রথম আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল সরু একটা পায়ে-চলা পথ খাদটার মধ্যে দিয়ে সোজা ওপরে উঠে গিয়ে অন্য পাহাড়ে পড়েছে।

ফিনিয়াস হ্যারিকে কাঁধে নিয়ে পাহাড়ি ছাগলের মতো পাথর টপকে টপকে খাদের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে পৌছল, ওর পেছনে আর সবাই। এখান থেকে পথটা এমন সংকীর্ণ হয়ে গেছে যে একজনের বেশি পাশাপাশি হাঁটা সম্ভব নয়। পথটার একপাশে খাড়া পাহাড়, অন্য পাশে আগাছায় ভরা গভীর বড় খাই। খুব সন্তর্পণে খানিকটা এগুনোর পর, শেষ প্রান্তে দেখা গেল হাত-দুয়েক চওড়া ফাটল, যেটা একটা পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়টাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ফাটলটার ওপারে ছোট্ট একটা চাতাল, চাতালের গা থেকে দুর্গপ্রাচীরের মতো ক্রমশ ঢালু হয়ে উঠে গেছে রুক্ষ পাহাড়। ফিনিয়াস অনায়াসে

এক লাফে ফাটলটা পেরিয়ে এসে হ্যারিকে শেওলা জমা মসৃণ একটা পাথরের ওপর বসিয়ে দিল, তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, 'ওখান থেকেই সোজা লাফিয়ে পেরিয়ে এসো। কোনো ভয় নেই, কিন্তু খুব সাবধানে।'

এক এক করে সবাই চাতালটাতে পৌঁছল। চাতালের ঠিক সামনে পড়ে রয়েছে বুক-সমান উঁচু আলগা কয়েকটা পাথরের টুকরো, যার ওপর দাঁড়ালে নিচের পাহাড়টাকে স্পষ্ট দেখা যায়। ফিনিয়াস প্রথমেই হ্যারি পরে মেয়েদের সেই নিরাপদ পাথরের আড়ালে সরিয়ে দিল, তারপর পাথরের ওপর দিয়ে ঝুঁকে নিচের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাস, এবার যদি কেউ এসে আমাদের ধরতে পারে তো ধরুক। যেই আসুক না কেন, একজন একজন করে তাদের ওই পথটা দিয়েই আসতে হবে। আশা করি পথটা নিশ্চয়ই তোমাদের পিস্তলের টার্গেটের মধ্যে পড়বে?'

'হ্যাঁ।' দৃঢ়স্বরে জর্জ বলল। 'সত্যিই আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। এবার যা কিছু দায়িত্ব সব আমাদের। যুদ্ধ যদি করতে হয় আমরাই করব।'

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে খাদের পারের চাতালটায় ঘোড়াসওয়ারিদের দেখা গেল। চিৎকার চেঁচামেচি আর পথশ্রমে ওদের মুখগুলো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। ঘোড়াগুলো রীতিমতো হাঁফাচ্ছে ভোরের আলোয় বিশাল বপু থলথলে চেহার টম লকার আর মার্কাসকে চেনা গেল। বাকি সবাই ওদের ভাড়া করা লোক। দলের সঙ্গে দুজন পুলিশ কর্মচারীও রয়েছে।

পাহাড়ের ওপারে পলাতকের দলটাকে দেখতে পেয়ে সবাই উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। ওদের মধ্যে থেকে কে যেন টম লকারকে বলল, 'টম, ব্যাটারা এবার ফাঁদে পড়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, এই পথটা দিয়ে গিয়েই ওরা ওখানে পৌঁছেছে', টম বলল। 'এখন ওদের আর পালাবার কোনো পথ নেই। আমি পথটা দিয়ে গিয়েই ওদের পাকড়াও করব। তোমরাও আমার পেছন পেছন এসো।'

মার্কস বলল, 'কিন্তু ওরা যদি পাথরের আড়াল থেকে আমাদের ওপর গুলি চালায়, তখনকি ব্যাপারটা সুবিধের হবে বলে তোমার মনে হয়?'

'আরে, দূর! ছাড়তো ওদের কথা।' বিদ্রূপভরা গলায় টম হেসে উঠল। 'নিগ্রোরা হলো ভীরুর জাত। ওরা আবার কি গুলি চালাবে শুনি?'

'তুমি জানো না টম, এক এক সময় ওরা পাকা শয়তানের মতো লড়ে যায়।' মাথা চুলকাতে চুলকাতে মার্কস দ্বিধাজড়ানো স্বরে বলল।

মার্কসের কথা শুনে টম চটে উঠল। 'সব সময়ই খালি নিজের চামড়া বাঁচাবার ধান্দা।

'কিন্তু কোন দুঃখেই বা আমি নিজের চামড়া বাঁচানোর চেষ্টা করব না তুমিই বলো?'

এমন সময় জর্জ একখানা পাথরের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বেশ শান্তভাবে পরিষ্কার গলায় বলল, ভদ্রমহোদয়গণ, ওখানে আপনারা কে এবং কী চান?'

টম লকার চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা পলাতক একদল নিগ্রো ক্রীতদাসকে চাই। ওদের মধ্যে জর্জ হ্যারিস, এলিজা হ্যারিস, তাদের ছেলে, জিম শেলডম আর একটা বুড়ি আছে। আমাদের সঙ্গে পুলিশ এমন কী পরোয়ানাও রয়েছে। আমরা ওই লোকগুলোকে চাই। শুধু তাই নয়, আমরা ওদের ধরবও। তুমিই তো কেন্টাকির শেলবি কাউন্ট্রির মিস্টার হ্যারিসের ক্রীতদাস জর্জ হ্যারিস, তাই না?'

'হ্যাঁ, আমিই জর্জ হারিস। একসময়ে কেন্টাকির মিস্টারর হ্যারিস আমাকে তাঁর সম্পত্তি বলেই দাবি করতেন। কিন্তু এখন আমি স্বাধীন মানুষ, ঈশ্বরের স্বাধীন ভূমির ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। আমার স্ত্রী আর ছেলেকে আমার নিজেরই বলে দাবি করি। জেমি শেলডন আর তার বৃদ্ধা মাও এখানে রয়েছে। আত্মরক্ষা করার মতো যথেষ্ট অস্ত্রও আমাদের সঙ্গে আছে। যদি চান আপনারা নিশ্চয়ই আসতে পারেন। প্রথমেই যে আমাদের গুলির আওতার মধ্যে এসে পড়বে, তাকেই খতম করে দেব। তারপরে যে আসবে তাকে, তারপরেও কেউ যদি আসে তাকেও। এমনিভাবে শেষ মানুষটিকে পর্যন্ত আমরা হত্যা করব।'

বেঁটে, গাট্টাগোট্টা চেহারার একটা লোক রুমালে নাক ঝাড়তে ঝাড়তে এগিয়ে এসে বলল, 'আরে বাপু, থামো থামো। দেখছ তো আমরা পুলিশের লোক। এখন মিছেমিছি না তোড়পিয়ে সোজা নেমে এসো। ধরা এক সময় পড়তেই হবে। আইন আমাদের দিকে, শক্তি আমাদর প্রচুর।'

'আমি জানি আইন আপনাদের দিকে, শক্তিও আপনাদের প্রচুর। আপনারা ইচ্ছে করলেই আমার স্ত্রীকে নিউ অর্লিয়েন্সের হাটে নিয়ে গিয়ে বেচে দিতে পারেন, আমার বাচ্চাটাকে গরুবাছুরের মতো দাসব্যবসায়ীর খোয়াড়ে পুরে রাখতে পারেন। ছেলেকে শাস্তি দিতে না পেরে যে তার বুড়ি মাকে চাবুক মারতে মারতে অজ্ঞান করে ফেলেছিল, সেই শয়তানটার কাছে জিমের বুড়ি মাকেও পাঠিয়ে দিতে পারেন। আমাকে আর জিমকে দারুণ নির্যাতন সহ্য করার জন্যে পাঠিয়ে দিতে পারেন সেই লোকগুলোর কাছে, যাকে আপনারা বলেন মনিব। আপনাদের দেশের আইন আপনাদের সমস্ত কাজকে সমর্থন করবে। কিন্তু আমরা এখন মুক্ত, স্বাধীন। আপনাদের আইনকে আমরা মানি না, আপনাদের দেশকে আমাদের দেশ বলে স্বীকার করি না। পরমেশ্বরের অসীম আকাশের নিচেই আমরা স্বাধীন মানুষেরই মতো দাঁড়িয়ে আছি। যিনি আমাদের স্বাধীন করেছেন, তাঁর নামে শপথ করে বলছি : মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতার জন্যে আমরা সংগ্রাম করে যাব।'

পাথরের উপর দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে স্বাধীনতা ঘোষণা করার সময় জর্জের মুখখানা ভোরের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দীপ্ত আবেগে ঝিকমিক করছিল তার কালো চোখ দুটো, যেন সমগ্র নিপীড়িত জাতির সে এক জ্বলন্ত প্রতীক। জর্জের সেই উদ্দীপ্ত বলিষ্ঠ মূর্তি দেখে সবাই ক্ষণিকের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কেবল মার্কসই যা এর ব্যতিক্রম। সবার অলক্ষে পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে জর্জের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে গুলি করল। তারপর কোটের হাতায় পিস্তলের নলটা মুছতে মুছতে বলল, ওকে জীবিত বা মৃত যে অবস্থাতেই ধরে নিয়ে যাও না কেন, একই টাকা পাওয়া যাবে।'

চকিতে জর্জ এক লাফে পেছনে সরে গেল, এলিজা ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল। গুলিটা জর্জের চুল আর এলিজার চিবুক ঘেঁষে সোজা গিয়ে বিঁধল ওপরের একটা গাছের গুঁড়িতে। ঠিক মুহূর্তে সরে না গেলে গুলিটা নির্ঘাৎ জর্জের বুকে লাগত।

জর্জ দ্রুত বলে উঠল, 'ভয় নেই, এলিজা; আমার কোনো ক্ষতি হয় নি।'

ফিনিয়াস বলল, 'দেখো জর্জ, বক্তৃতা যদি দিতে হয় তো আড়ালে গিয়ে দাও। ওরা অসম্ভব নীচ, ওদেরকে আদৌ বিশ্বাস করা উচিত নয়।'

জর্জ বলল, 'জিম তোমার পিস্তল দুটো ঠিক আছে তো?'

'হ্যাঁ।'

'আমার সঙ্গে তুমিও ওই পথটার ওপর নজর রাখো। যে লোকটাকে প্রথম দেখা যাবে, আমি তাকে গুলি করব। তুমি গুলি করবে তার পরেরটাকে। একজনের ওপর দুটো গুলি ছুড়ে গুলি নষ্ট করার কোনো দরকার নেই।'

'কিন্তু যদি না মারতে পার?'

'মারবই।' জর্জের কণ্ঠস্বরে উত্তেজনার কোনো আভাস নেই।

মার্ক গুলি ছোড়ার পর শত্রুদল নিচে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল। ওদের মধ্যে একজন বলল, 'সাবাস, মার্কস্! আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয়ই একজনকে খতম করতে পেরেছ। কেননা আমি একজনের আর্তনাদ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি।'

'আমিও একটাকে মারতে যাচ্ছি। নিগ্রোদের আমি ভয় পাই না। কে আমার সঙ্গে যাবে চলে এসো।'

কথাটা বলেই টম লকার গুঁড়ি পথটা ধরে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল।

জর্জ টমের কথাগুলো স্পষ্টই শুনতে পেয়েছিল, তাই পিস্তলটা বের করে ভালো করে পরীক্ষা করে নিল, তারপর ফাটলটার ঠিক ওপরে প্রথমেই যেখানে লোকটাকে দেখা যাবে সেইদিকে লক্ষ্য স্থির রেখে অপেক্ষা করতে লাগল।

দলের সবচেয়ে সাহসী লোকটা এগিয়ে আসছে টমের পেছন পেছন, তারও পেছনে রয়েছে অন্য সবাই। অমন বিশাল চেহারা নিয়ে স্বেচ্ছায় টমের পক্ষে যত দ্রুত ওপরে ওঠা সম্ভব ছিল, পেছনের ধাক্কায় সে আরো দ্রুত ওপরে উঠতে লাগল। এমনিভাবে চলতে চলতে অল্পক্ষণের মধ্যে গর্তের ঠিক মুখটার সামনেই তাকে দেখা গেল। জর্জও সঙ্গে সঙ্গে গুলি চালাল।

গুলিটা সোজা গিয়ে বিঁধল টমের পাঁজরায়। কিন্তু আহত হওয়া সত্ত্বেও টম পিছিয়ে গেল না, বরং ক্ষেপা ষাঁড়ের মতো ক্রুদ্ধ গর্জন করে সে এক লাফে ফাটলটা পেরিয়ে এল আর ফিনিয়াসও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে দুহাত দিয়ে তাকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'আমাদের এখানে তোমাকে কোনো দরকার নেই, বন্ধু। তুমি স্বচ্ছন্দে বিদায় হতে পারো।'

পেটা লোহার মতো বলিষ্ঠ দুহাতের ধাক্কা সামলাতে না পেরে টিম ডালপালা ভেঙে, ঝোপঝাড় নিয়ে সোজা গিয়ে পড়ল ত্রিশ ফুট খাদের নিচে। খাদের মধ্যে বড় একটা গাছ ছিল, তার ডালে টমের পোশাক আটকে না গেলে সে নিশ্চয়ই মারা যেত। অবশ্য ডালটাও তার অমন বিশাল দেহের ভার ধরে রাখতে পারল না, ভেঙে টমকে নিয়ে সোজা পড়ল একেবারে নিচে।

'ওরা পাকা শয়তান। করতে পারে না হেন কাজ নেই!' বলতে বলতে মার্কসই প্রথম পিছু হটল এবং যতটা উৎসাহ নিয়ে সে এগোতে শুরু করেছিল, তার চাইতেও বেশি উৎসাহ নিয়ে সে পিছিয়ে গেল। তার দেখাদেখি দলের অন্যরাও তাকে অনুসরণ করল। বিশেষ করে বেঁটে, মোটাসোটা চেহারার সেই পুলিশ কর্মচারীটির অবস্থা তখন সত্যিই দেখার মতো।

ওপারের ফাঁকা জায়গাটাতে পৌঁছেই মার্কস বলল, 'তোমরা ওইদিক দিয়ে ঘুরে টমের দেহটাকে তুলে আনো, আমি ততক্ষণে ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে দেখে আসি সাহায্যের জন্যে কিছু লোকজন পাওয়া যায় কি না।'

মার্কসের যা কথা সেই কাজ। ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে সে চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

একজন বলল, 'লোকটা কেমন শয়তান দেখেছ? আমাদের এরকম বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে বাবু দিব্যি কেটে পড়লেন!'

অন্য একজন বলল, 'চলো ওখান থেকে আমরা টমের দেহটাকে তুলে নিয়ে আসি। লোকটা বেঁচে আছে না মরে গেছে সেটা একবার দেখা দরকার।'

পাহাড়ের একটা পাশ দিয়ে ঝোপঝাড় ভেঙে টমের আর্তনাদ অনুসরণ করে ওরা খুব ধীরে ধীরে নামতে লাগল, তারপর একসময় খাদের নিচে পৌঁছে গেল।

একজন বলল, 'টম, তোমার কি খুব লেগেছে?'

গোঙাতে গোঙাতে টম বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাকে কি তোমরা ওপরে তুলতে পারবে বলে মনে হয়? ওই কদাকার শয়তানটার মাথায় বাজ পড়ুক। আজ ও যদি ওদের সঙ্গে না থাকত, তাহলে ওদেরই কাউকে না কাউকে এখানে এসে পড়তে হতো।'

সবাই মিলে খুব কষ্টে টমের দেহটাকে কোনোরকমে টেনে-হিঁচড়ে ওপরে তুলে নিয়ে এল, তারপর বয়ে নিয়ে গেল ঘোড়াগুলো, যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান পর্যন্ত। বেচারি টম লকারের অবস্থা তখন সত্যিই সঙ্গীন। অনেক কষ্টে হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলল, 'কষ্ট করে তোমরা যদি কোনোরকমে আমাকে ওই সরাইখানাটা পর্যন্ত নিয়ে যেতে পার খুব ভালো হয়। ক্ষত জায়গাটায় চেপে ধরার মতো তোমরা কেউ আমাকে একটা রুমাল বা ওইরকম কিছু দিতে পারো? কিছুতেই রক্ত বন্ধ হচ্ছে না।'

জর্জ পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে দেখল লোকগুলো টমকে ঘোড়ার পিঠে তুলে জিনের ওপর বসাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বার কয়েক ও-রকমভাবে চেষ্টা করার পর একসময় টমের দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

এলিজা বলল, 'আশা করি লোকটা নিশ্চয়ই মারা যায় নি!'

ফিনিয়াস বলল, 'আমার মনে হচ্ছে ওকে ওখানে ফেলে রেখে সবাই পালাচ্ছে!'

সত্যিই তাই। টমের বন্ধুরা সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে কী যেন পরামর্শ করল, তারপর টমকে সেখানেই ফেলে রেখে যে যার ঘোড়ার পিঠে চড়ে চলে গেল।

চোখের সামনে থেকে সওয়ারিদের শেষ চিহ্নটুকু মিলিয়ে যাবার পর ফিনিয়াসকে তৎপর হয়ে উঠতে দেখা গেল।

'এখান থেকে মাইল দুয়েক পথ আমাদের হেঁটে যেতে হবে। বলা যায় না, পথে হয়তো ওদের সঙ্গে আবার দেখাও হয়ে যেতে পারে। তাই লোকজন নিয়ে মাইকেল ফিরে আসলে খুব ভালো হতো। কেননা এত সকালে এ পথে লোক চলাচল প্রায় করে না বললেই চলে। ওদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। অবশ্য একবার যদি কোনোরকমে ওই মাইল-দুয়েক পথ পেরোতে পারি, তাহলে ওরা আমাদের আর কোনোদিনই ধরতে পারবে না।'

তারপর সবাই একএক করে পাথরের আড়াল ছেড়ে ধীর ধীরে নিচে নামতে শুরু করল। ওঠার চাইতে নামার কাজটা ছিল আরো বিপজ্জনক। তা সত্ত্বেও সবাই নিরাপদে খাদের ওপারের চত্বরটাতে গিয়ে পৌঁছল আর তখনই দূরের ঢালু পথটাতে গাড়ি নিয়ে মাইকেলকে ফিরে আসতে দেখা গেল। ওদের পেছনে কয়েকজন ঘোড়সওয়ারও রয়েছে।

'আরে, মাইকেলের সঙ্গে আমারিয়া আর স্টিফেনকেও দেখতে পাচ্ছি!' উপচে ওঠা খুশির সুরে ফিনিয়াস বলে উঠল। 'যাক, এবার কোনো ভয় নেই। এখন বলতে পারি আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ।'

টমের দেহটার ওপর ঝুঁকে পড়ে এলিজা বলল, 'লোকটা যেভাবে পড়ে পড়ে কাতরাচ্ছে, আমার মনে হয় ওর একটা কিছু ব্যবস্থা করা উচিত।'

'হুঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে!'

ফিনিয়াস টমের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ক্ষতস্থানটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল।

টম ক্ষীণস্বরে বলল, 'কে, মার্কস?'

টমের ভুল ভাঙিয়ে দেবার জন্যেই ফিনিয়াস বলল, 'না, তোমার বন্ধু নিজের পিঠ বাঁচাবার জন্যে অনেক আগেই সরে পড়েছে।'

'মনে হচ্ছে আমার দফা শেষ', কোনোরকমে শ্বাস নিতে নিতে টম বলল।

'কুকুরের মতো মরে পড়ে থাকার জন্যেই ওরা আমাকে ওখানে ফেলে পালিয়েছে। এরকমটা যে ঘটবে আমার মা প্রায়ই আমাকে বলতেন।'

'আহারে, বেচারি!' কথাটা শুনে জিমের মার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। ওর জন্যে আমার সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'গুলিটা মাংসের মধ্যেই বিঁধে আছে, হাড়ে গিয়ে লাগে নি। সেদিক থেকে ক্ষতি হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু রক্ত বন্ধ করতে না পারলে কোনো মতেই বাঁচানো যাবে না।'

টম আরো ক্ষীণস্বরে বলল, 'ও, আপনিই আমাকে খাদটার নিচে ফেলে দিয়ে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক সময়ে না ফেললে তুমিই আমাদের সবকটাকে ওই খাদের মধ্যে ফেলতে। উঁহুঁ, অত ছটফট করো না, আগে ভালোভাবে বাঁধতে দাও।' ক্ষতস্থানে সম্পূর্ণ একটা রুমাল ঠেসে দিয়ে গলার মাফলারটা জড়িয়ে শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে ফিনিয়াস বলল।

'তখন আমি তোমাকে খাদে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলাম, এখন আমিই তোমাকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাব যেখানে নিজের মায়ের চাইতে কোনো অংশে কম যত্ন পাবে না। মনে রেখো, আমরা তোমার বন্ধুদের মতো অকৃতজ্ঞ নই।'

চোখ বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে টম অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে। টকটকে লালচে মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দৈত্যের মতো অমন বিরাট চেহারার মানুষটাকে এখন ছোট্টো একটা শিশুরই মতো অসহায় মনে হচ্ছে।

ইতোমধ্যে দলবল নিয়ে মাইকেলও সেখানে এসে পড়েছে। বড় একটা মোষের চামড়াকে চার ভাঁজ করে পেতে তার ওপর ধরাধরি করে টম লকারকে শুইয়ে দেওয়া হলো। টম কিন্তু তখন সম্পূর্ণ জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। গাড়িতে উঠে জিমের মা-ই প্রথম টমের মাথাটা নিজের কোলের ওপর তুলে নিল। এলিজাও যথাসাধ্য শুশ্রূষা করার চেষ্টা করল।

আগের মতো জর্জ আর জিম সামনের আসনে গিয়ে বসতেই ফিনিয়াস গাড়ি ছেড়ে দিল। মাইকেলের দলবল ঘোড়ায় চড়ে আসতে লাগল পেছন পেছন।

এক সময়ে জর্জ হ্যারিস জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি মনে হয় লোকটাকে বাঁচান যাবে?'

'নিশ্চয়ই।' বেশ জোর দিয়েই ফিনিয়াস কথাগুলো উচ্চারণ করল, 'দেহ থেকে অনেকখানি রক্ত বেরিয়ে গেছে বলেই ও অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, নইলে আঘাত তেমন মারাত্মক নয়।'

অনুতপ্ত গলায় জর্জ বলল, 'লোকটা মারা গেলে নিজেকে আমার সত্যিই অপরাধী মনে হতো।'

'হ্যাঁ, কাউকে খুন করাটা খুবই জঘন্য কাজ। তা সে মানুষ হোক, কিংবা পশুই হোক। তুমি হয়তো জানো না, একসময় আমি খুব নামকরা শিকারি ছিলাম। বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোটাই ছিল আমার নেশা। একবার একটা হরিণীকে দেখামাত্রই গুলি করেছিলাম। মরার সময় জলভরা চোখে এমন করুণভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল যে যন্ত্রণায় আমার বুকের ভেতরটা পর্যন্ত মুচড়ে উঠেছিল। সেই থেকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম আর কোনোদিনও বন্দুক ছোঁব না।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার ফ্লেচার', চাপাগলায় জর্জ বলল, 'আপনার কথাটা আমার চিরকাল স্মরণে থাকবে।'

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর গাড়িটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর একটা খামারবাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। সেখানেই অতিথিদের জন্যে প্রাতরাশের ব্যবস্থা করা হলো। ডোরকাস নামে একজন বয়স্কা মহিলার তত্ত্বাবধানে টমকে শুইয়ে দেওয়া হলো ধবধবে সাদা চাদরপাতা নরম একটা শয্যায়। টমের জ্ঞান ফিরে আসার পরপরই তাকে বিদায় জানিয়ে অতিথিরা আবার দূরের পথে যাত্রা শুরু করল।

পনেরো

মিস ওফেলিয়া

সেন্ট ক্লেয়ারদের বাড়িতে লোকের যেমন অভাব ছিল না, তেমনি প্রাচুর্যও ছিল প্রচুর। এ কারণেই এতদিনে টমকে খুব একটা গুরুত্ব দিয়ে কোনো কাজ করতে হয় নি। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আগাস্টিন আবিষ্কার করলেন, টম শুধু বিশ্বস্ত আর ধার্মিকই নয়, অসাধারণ বিচক্ষণ ও বাস্তবজ্ঞানী। ব্যবসায়িক বুদ্ধিতেও তার জুড়ি নেই। আগাস্টিন তাই ধীরে ধীরে যাবতীয় কেনাকাটা আর সংসারের দায়িত্ব টমের কাছেই ছেড়ে দিলেন।

নিজের কাছ থেকে সমস্ত ক্ষমতা একটু একটু চলে যেতে দেখে অ্যাডলফ প্রায়ই টমের নামে মনিবের কাছে মিথ্যে মিথ্যে নালিশ করত। আগাস্টিন সে-সব কখনো কান পেতে শুনতেনও না। কেননা আজ পর্যন্ত খরচ করে কেউ কখনো তাঁর কাছে হিসেব দেয় নি আর তিনিও নিজে থেকে কখনো কারুর কাছে হিসেব চান নি। অথচ অনেক সুযোগ থাকা সত্ত্বেও টম কখনো একটা পয়সাও এদিক-ওদিক করে নি। তাই অ্যাডলফের অভিযোগে কখনো কখনো ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠতেন আর বলতেন, 'না না, অ্যাডলফ, তোমার কাজ তুমি করে যাও। টমকে নিয়ে তোমার মোটেই মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তুমি যা চাও, তুমি শুধু সেটাই বোঝ, কিন্তু টম বোঝে হিসেব। কী করলে কী হয় টম তা ভালো করেই জানে। সে জানে কীভাবে মনিবের দুটো টাকা বাচানো যায়। একটা ব্যাপার তোমরা মোটেই বুঝতে চাও না যে টাকা-পয়সারও একটা শেষ আছে, একদিন না একদিন তা সবাইকেই বুঝতে হবে। তোমরা যেটা পার না, সেটা নিয়ে অন্যের নামে আর কখনো মিথ্যে নালিশ করতে এসো না।'

টম সারাক্ষণই হাসিখুশি মানুষ, মিশুকে স্বভাবের। সুন্দর তরুণ মনিবটিকে বুঝে নিতে টমের একেবারে কম সময় লাগে নি। দু-একটা ভুল-ত্রুটি থাকলেও মনিব মানুষটাকে তার গভীরভাবে ভালো লেগেছে বেশ দেরিতে। টম প্রথম প্রথম খোলা মন নিয়ে মনিবকে দেখত, মনিব কখনো গির্জায় যায় না, বাইবেলও পড়ে না, কিন্তু সবার সঙ্গে সহজেই মেশেন, আড্ডা দেন, সব কিছুতেই হাসিঠাট্টা করেন, নিজেকে সবটাতেই মানিয়ে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর। রবিবারের বিকেলে হয় জলসাতে, নয় রঙ্গমঞ্চে যান তিনি। জলসা বা রঙ্গমঞ্চ থেকে আবার কোনো পার্টিতে, নয়তো কোনো ক্লাবে যান।

গভীর রাত পর্যন্ত তিনি সেখানেই কাটান। তাঁর সবকিছুই অন্যসব মানুষের মতোই খুব স্বাভাবিক। টম অনেকবারই লক্ষ করেছে, নিজের লাইব্রেরিতে অনেক রাত জেগে তিনি পড়াশোনাও করেন।

একদিন খুব ভোরে কফি নিয়ে টম দেখল, সেন্ট ক্লেয়ার তখনো পড়ার ঘরে। পরনে রাত-পোশাক, পায়ে চটি, অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে তিনি কিছু একটা পড়ছেন। সেদিন অন্যদিনের মতো টম কফি নিয়ে ফিরে গেল না। পাথরের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল দরজার সামনে।

আগাস্টিন টমকে দেখতে পেলেন, বললেন, 'কী ব্যাপার টম, তুমি কি কিছু বলতে এসেছ?'

টম তখন কিছুই বলতে পারল না, অথবা বলল না।

আগাস্টিন আবার বললেন, 'তোমাকে কি কেউ কিছু বলেছে?'

'না, স্যার।'

'তাহলে কি, হিসেবে কোনো সমস্যা হচ্ছে?'

'না, স্যার হিসেবের সমস্যা নয়।'

আগাস্টিন এবার অবাক না হয়ে পারলেন না। তিনি কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে ভালো করে টমের মুখের দিকে তাকালেন।

'কী ব্যাপার টম, তোমার শরীর কি ভালো নেই?'

'স্যার, শরীর আমার ভালোই আছে।'

'টম, তাহলে কী হয়েছে তোমার? তোমাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?'

'আমার ধারণা ছিল মনিব সবসময়েই সবার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেন।'

আগাস্টিন এবার বইটা ভাঁজ করে রেখে বললেন, 'কেন টম, আমি তো তোমার সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করি নি।'

'না না, স্যার আপনি সবসময়ই আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করেছেন। সেদিক থেকে আমার কোথাও কোনো অভাব নেই। শুধু মনিব একজনের সঙ্গেই যা ভালো ব্যবহার করেন নি।'

'টম, তুমি কী বলছ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'গতকাল রাতে আমি বেশ কয়েকবারই ব্যাপারটা খেয়াল করেছি। স্যার কিন্তু নিজের প্রতি মোটেই ভালো ব্যবহার করছেন না।'

টমের কথা শুনে আগাস্টিন হো হো করে হেসে উঠলেন।

'ও, এই ব্যাপার!'

'ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়, স্যার।'

কান্নায় ধরে আসা গলায়, মিনতিভরা চোখে টম এমনভাবে কথাগুলো বলল যে আগাস্টিন স্তব্ধ বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, 'ঠিক আছে টম, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আর কোনোদিন রাত জেগে পড়াশোনা করব না।'

কোনো কথা না বলে টম খুশি হয়ে চোখ মুছতে মুছতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ঘরদোর গুছিয়ে সংসারে নিয়ম-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে মিস ওফেলিয়াকে রীতিমতো হিমসিম খেয়ে যেতে হয়েছিল। কেননা এ বাড়ির কর্ত্রী মেরি সেন্ট ক্লেয়ার বা তার মা আদৌ সুগৃহিণী ছিলেন না, ফলে দাসদাসীরাও সুষ্ঠু কোনো নিয়মের ধার ধারত না। বিশেষ করে সেন্ট ক্লেয়ারদের রান্নাঘরের অবস্থাটা হয়ে উঠেছিল সব চাইতে সঙ্গীন।

এতদিন পর্যন্ত রান্নাঘরের সর্বময় কর্তৃত্ব ছিল মার আমলের পুরনো ক্রীতদাসী দিনার হাতে। চাকর-বাকররা তো দূরের কথা, এ বাড়ির কর্ত্রী, অভ্যাসবশে দিনা যাকে আজও 'মিস মেরি' বলে ডাকে, সেই মেরিও দিনার মুখের ওপর কখনো তেমন করে 'না' করতে পারত না। অথচ এ পরিবারে দিনাই ছিল সবচাইতে নোংরা আর অগোছলো।

মিস ওফেলিয়া প্রথম প্রথম সবকিছু দেখলেন, কিন্তু একটা কথাও বললেন না। একদিন খুব ভোর থেকে শুরু করে সন্ধ্যে পর্যন্ত রোজাকে নিয়ে উনি শুধু রান্নাঘরটাই পরিষ্কার করলেন, যেখানকার জিনিস যেখানে থাকা উচিত সব গোজগাছ করে রাখলেন। কিন্তু কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই দেখা গেল অবস্থা ঠিক আগেরই মতো যে তাই। ওফেলিয়া মনে মনে ঠিক করলেন এবার অবশ্যই বলা দরকার।

নিত্যকার মতো সেদিনও খুব ভোরে উঠে ওফেলিয়া নিজের ঘর নিজের হাতে গুছিয়ে সোজা চলে এলেন রান্নাঘরে।

রান্নাঘরটা পুরোনো আমলের হলেও বেশ বড় আর খোলামেলা। রান্নার উনুন থেকে শুরু করে সবকিছুই আধুনিক ধাঁচের। এখনেও আগাস্টিনের রুচির কোথাও কোনো অভাব নেই।

ওফেলিয়াকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেখে দিনা কিন্তু উঠে দাঁড়াল না, যেন ব্যাপারটা আদৌ তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং এখানে মিস ওফেলিয়ার কোনো কাজ থাকতে পারে না।

ওফেলিয়া কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা গিয়ে আলমারির টানাগুলো খুললেন, তারপর দিনার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই টানাগুলো কিসের জন্যে?'

'হাতের কাছে টুকিটাকি জিনিস রাখার জন্যে।'

মাংসের টুকরো লেগে থাকা রক্তমাখা একটা ন্যাকড়া টেনে বার করে উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে এটা কী? বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর টেবিলের ঢাকনাটায় মাংস কেটে ছুরি মুছে রেখে দিয়েছ?'

'কী করব মিসেস, হাতের কাছে কোনো তোয়ালে পাই নি ... কাচব বলে ওটা আমি ওখানে রেখে দিয়েছি।'

টেবিলের ঢাকনাটাকে উনি ছুড়ে ফেলে দিলেন ঘরের এক কোণে। শুধু তাই নয়, টানার ভেতর থেকে বের হলো বোনার কাঁটা, কিছুটা তামাক আর তামাকের নল, কয়েকটা জায়ফল, নোংরা কতকগুলো রুমাল, একপাটি পুরোনো জুতো, কয়েকটা পেয়ালা, সুন্দর ভাঁজ করা খানিকটা রাংতা, কয়েকটা রশুন আর চুলের কাঁটা।

'তোমাদের জায়ফল রাখার কোনো জায়গা নেই?'

'আছে।

'কোথায়?'

'ঢাকা-আলমারি মধ্যে একটা বোয়ামে।'

'এগুলোকে তার মধ্যে রেখে দাও। আর কোনোদিনও যেন এগুলোকে ড্রয়ারের মধ্যে না দেখি।'

দিনা ফিরে আসার পর ওফেলিয়া বললেন, 'এটা কী? মনিবের সবচেয়ে ভালো প্লেটটা ছাড়া এসব রাখার আর জায়গা খুঁজে পাও নি?'

'সবসময় এমন তাড়াহুড়ো করতে হয় ...'

'ঠিক আছে', ওফেলিয়া ওকে দ্রুত থামিয়ে দিলেন।

'এবার থেকে তোমার আর একটুও তাড়াহুড়ো করতে হবে না। যতটা সম্ভব আস্তে আস্তেই করবে। আর সুন্দর এই দামাস্কাস টেবিলের ডাকনা দুটো এলো কোত্থেকে?'

'কাচার জন্যে আমি এখানে রেখে দিয়েছি?'

'কাচার যা কিছু জিনিস সব এখানেই থাকে নাকি?'

'না, পাছে ভুলে যাই, তাই ...।'

'কিন্তু কাচার কাজ তো তোমার নয়।' টানার জিনিসপত্তর সব গোছাতে গোছাতেই ওফেলিয়া বললেন। 'রোজকে বল এগুলো এখান থেকে নিয়ে যাবে। আর শোনো, এবার থেকে নিজের প্লেট তুমি নিজেই ধোবে। এঁটো বাসন কখনো এভাবে ফেলে রাখবে না।'

'কিন্তু আমি তোমাকে যা বলছি, তুমি তাই করবে। আর মনে রাখবে রান্নাঘরের কোনো জিনিসই যেন অগোছালো না দেখি।'

কয়েকদিনের মধ্যে মিস ওফেলিয়া শুধু রান্নাঘর নয়, এই বাড়ির সবকিছুতেই একটা স্বাভাবিক ধারা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অনেক দিনের পুরনো অভ্যাসকে রাতারাতি পাল্টে দেওয়া সহজ নয়, বিশেষ করে যেখানে চাকর-বাকরদের সহযোগিতার প্রশ্ন জড়িয়ে রয়েছে।

www.alorpathsala.org

সেদিন বিকেলে চায়ের পর খোলা বারান্দায় বসে সবাই গল্পগুজব করছে, ওফেলিয়া বললেন, 'এ পরিবারে দেখছি কোনো নিয়ম বলে কিছু নেই। এত অপচয় আমি আর কোথাও দেখি নি। তাছাড়া সবাই সৎ বলেও আমার মনে হয় না।'

'সৎ!' ওফেলিয়ার কথা শুনে আগাস্টিন হো হো করে হেসে উঠলেন। 'ওরা সৎ হতে যাবে কোন দুঃখে?'

ওফেলিয়া অবাক হয়ে ভাইয়ের দিকে তাকালেন। 'তার মানে তুমি কি বলতে চাও সততার কোনো দাম নেই?'

'নিশ্চয়ই আছে! কিন্তু এ পৃথিবীতে ওরা সৎ হয়ে কী করবে শুনি? জন্মের মুহূর্ত থেকেই ওরা দেখে, আমরা মনিব, ওরা ক্রীতদাস। ওরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনরাত পরিশ্রম করে, আর ওদের সেই শ্রমলব্ধ ঐশ্বর্যের দৌলতে আমরা বিলাসিতা করি। ওরা দুর্বল, আমরা শক্তিশালী। ওরা লেখাপড়া জানে না, আমরা শিক্ষিত। আমরা চাবুক মারি, ওরা চাবুক খায়। ওরা কিসের জন্যে সৎ হতে যাবে, তুমিই বলো?'

উল বোনার কাজ থামিয়ে ওফেলিয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। আগাস্টিন ওঁর অবাক হবার ভঙ্গি দেখে মনে মনে বেশ মজা পেলেন।

'তবে ওফেলিয়া, আমি তোমাকে একটা কথা বেশ স্পষ্টভাবেই বলতে পারি নিজেদের জাতটাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে ওদের পক্ষে যতটা সৎ হওয়া সম্ভব, ওরা নিশ্চয়ই ততটা সৎ। আমরা ওদের চাইতে কত অসৎ, সে তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, ওফেলিয়া! বেশ তো, আমাদের কথাই ধরো না কেন। আমার আর তোমার বাবারা ছিলেন দুভাই। দুজনেই মানুষ হয়েছিলেন নিউ ইংল্যান্ডে। পিতামহের সম্পত্তি ভাগ হবার পর তোমার বাবা রয়ে গেছেন নিউ ইংল্যান্ডে আর আমার বাবা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন লুসিয়ানায়। সে সময়ে আমাদের আবাদে কাজ করত সাত শো নিগ্রো ক্রীতদাস-দাসী। আমার বাবা ছিলেন অত্যন্ত বদরাগী আর কড়া মেজাজের মানুষ। ক্রীতদাসদের কাজে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটলে তিনি তাদের কঠোর শাস্তি দিতেন। আমার মা ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত। উনি কারুর দুঃখ-কষ্ট একদম সহ্য করতে পারতেন না। লুকিয়ে লুকিয়ে যতটা সম্ভব সবাইকে সাহায্য করতেন। এর জন্যে প্রতিবেশী থেকে শুরু করে প্রতিটা দাস-দাসী ওঁকে অসম্ভব ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত। আমরা যমজ দু ভাই, অ্যালফ্রেড আর আমি। অনেকে বলে যমজ হলে নাকি দেখতে এবং স্বভাব চরিত্র অনেকটা একইরকম হয়। কিন্তু সবদিক থেকেই আমরা ছিলাম সম্পূর্ণ বিপরীত। ওর গায়ের রঙ ছিল লালচে ধরনের, কালো চোখ, কুচকুচে কালো চুল, রোমানদের মতো বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। আমার গায়ের রঙ ঠিক মার মতো ধবধবে সাদা, নীল চোখ, সোনালি চুল আর চেহারাখানা অনেকটা গ্রিকদের মতো। ও ছিল কর্মঠ আর বাস্তববাদী। আমি ছিলাম অসম্ভব কুঁড়ে আর স্বপ্নবিলাসী। ও ছিল সাহসী, আমি লাজুক আর ভীরু প্রকৃতির। তাই বলে আমাদের মধ্যে যে অসৎ ভাব ছিল তা কিন্তু নয়। আমার বাবা ভালোবাসতেন অ্যালফ্রেডকে আর মা ভালোবাসতেন আমাকে।

'আমাদের আবাদে ক্রীতদাসদের কাজ দেখাশোনা করার জন্যে স্টাবস নামে একজন শ্বেতাঙ্গ সর্দার ছিল। লোকটা ভারমন্ট থেকে পালিয়ে আসা একজন দাগী আসামি। স্টাবসকে যেমন বিশ্রী দেখতে, তেমনি নিষ্ঠুর তার স্বভাব। স্টাবসের ভয়ে ক্রীতদাসরা

সবসময় তটস্থ থাকত। একটা কিছু ভুল দেখলেই সে নির্মমভাবে চাবুক মারত। আমি প্রায়ই মার কাছে নালিশ করতাম, মা তুমি চুপিচুপি স্টাবসকে ডেকে বকতেন। তাতে কিন্তু কোনো ফলই হতো না। স্টাবস একদিন বাবাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিল তার কাজে কেউ হস্তক্ষেপ করলে সে চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। বাবা মাকে জানালেন স্টাবসের মতো দক্ষ কর্মচারীকে তিনি কিছুতেই ছাড়তে পারবেন না। সে যা কিছু করে তাঁর বিষয়-সম্পত্তির উন্নতির জন্যেই। ফলে এখন থেকে স্টাবসের কোনো ব্যাপারে উনি যেন আর নাক গলাতে না আসেন আর স্টাবসও বাড়িতে নিযুক্ত দাসদাসীদের সম্পর্কে একটা কথাও বলবে না।

'তারপর থেকে বাবাকে আর কিছু না বললেও, মা যে মনে মনে কষ্ট পেতেন আমি স্পষ্টই বুঝতে পারতাম। অবশ্য মাকে খুব বেশিদিন কষ্ট পেতে হয় নি। আমার যখন তের বছর বয়স, উনি তখন মারা যান। বাবা মারা যাবার পর আমরা দুভাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হলাম। কিন্তু দাসপ্রথাকে আমি মনেপ্রাণে চিরকালই ঘৃণা করতাম, কেননা মার চরিত্রের প্রভাব ছিল আমার ওপরে বহুল পরিমাণে। বিষয়-সম্পত্তি পাবার কিছুকাল পরেই অ্যালফ্রেড বুঝতে পারল আমি আবাদি কাজের উপযুক্ত নই। তাই একদিন সে বলল, 'যে বসে বসে শুধু মেয়েদের মতো উচ্ছ্বাসভরা কবিতা লিখতে পারে, তাকে দিয়ে এ কাজ হবে না। ব্যাংকে যত গচ্ছিত টাকা আছে সব নিয়ে তুমি বরং নিউ অর্লিয়েন্সের বাড়িটাতে বাস করতে যাও।' আমি দেখলাম ক্রীতদাসদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করার চাইতে এটা বরং অনেক সহজ।'

এতক্ষণ মেরি চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল, এবার বলল, 'কিন্তু ওই ছোটলোকগুলো যে কী বদ তুমি যদি জানতে, তাহলে ওদের সম্পর্কে আর এত কথা বলতে না। আমি নিজের চোখে দেখেছি, ওরা অসম্ভব খারাপ। আমার বাবার একটা ক্রীতদাস ছিল। লোকটা অসম্ভব কুঁড়ে। কাজে ফাঁকি দিয়ে সে জলায় গিয়ে লুকিয়ে থাকত। বাবা গিয়ে লোকটাকে ধরে আনতেন, তারপর খুব করে চাবকাতেন। লোকটার স্বভাবের জন্যে তাকে প্রায়ই চাবুক খেতে হতো। তবু তার স্বভাব বদলালো না। একদিন সেই যে পালিয়ে গেল, আর ফিরে এল না। সেখানেই না খেতে পেয়ে মরে গেল।'

আগাস্টিন বললেন, 'কিন্তু যাকে কেউ কোনোদিন শোধরাতে পারে নি এমন একজন নিগ্রোর চরিত্র আমি শুধরে দিয়েছিলাম।'

বিদ্রূপের সুরে বলে উঠল মেরি, 'তুমি!'

'হ্যাঁ। লোকটা ছিল দৈত্যের মতো বিশাল চেহারার একেবারে খাঁটি আফ্রিকান। তার অন্তরে স্বাধীনতার স্পৃহা ছিল দুর্দমনীয়। সে ছিল সত্যিকারের 'আফ্রিকান সিংহ'। তার নাম ছিল স্কিপিও। কেউ ওকে শায়েস্তা করতে পারত না বলে, নানান হাত ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে এসে পড়ল অ্যালফ্রেডের হাতে। বশ করতে পারবে ভেবেই অ্যালফ্রেড তাকে কিনেছিল। আমি তখন আলাদাভাবে নিউ অর্লিয়েন্সে বাস করছি। অ্যালফ্রেডদের ওখানে বেড়াতে গিয়ে শুনলাম সর্দারকেই বেশ কয়েক ঘা কষিয়ে দিয়ে স্কিপিও পালিয়ে গেছে। সব শুনে আমি বললাম, তার দোষেই লোকটা অমন দুর্দান্ত হয়ে উঠেছে এবং বাজি রাখলে আমি স্কিপিওর চরিত্র শুধরে দিতে পারি। অ্যালফ্রেড এক কথায় রাজি হয়ে গেল। কিন্তু মুশকিল হলো লোকটাকে ধরা সম্পর্কে। তখন ঠিক হলো আমার ছয়-সাত জন মিলে বন্দুক আর শিকারি কুকুর নিয়ে লোকটাকে খুঁজতে বের হব। কিছুটা উত্তেজনা সেই প্রথম আমি

অনুভব করতে পেরেছিলাম। হরিণ শিকার করতে যা আনন্দ, একটা মানুষ শিকার করতে আনন্দ তার চাইতে কোনো অংশে কম নয়।

'যাই হোক, ঘোড়ায় চড়ে আমরা তো সবাই দলবল নিয়ে গিয়ে হাজির হলাম সেই জলার ধারে। সবাই চিৎকার-চেঁচামেচি করছে, কুকুরগুলো ভয়ঙ্করভাবে গর্জন করছে। এতে স্কিপিও ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। সে আর লুকিয়ে থাকতে পারল না। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে প্রাণপণে দৌড়াতে শুরু করল। ঘোড়ায় চড়ে আমরাও তার পেছন পেছন ছুটতে লাগলাম, শিকারি কুকুরগুলোও ক্রুদ্ধ আক্রোশে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করছে। অবশেষে স্কিপিও দুর্ভেদ্য একটা বেতবনে গিয়ে আটকে পড়ল। তার তখনকার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখলে যেকোনো লোকই ভয়ে আঁতকে উঠবে! খালি হাতেই অমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিকারি কুকুরগুলোর সঙ্গে যে লড়াই শুরু করে দিল। তিনটে কুকুর মারাই পড়ল তার ঘুঁসির ঘায়ে। শেষে কার যেন একটা বন্দুকের গুলিতে আহত হয়ে স্কিপিওর রক্তাক্ত দেহটা লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ের ওপর। হতাশ হয়ে, অথচ সত্যিকারের একজন বীরের দৃষ্টিতে সে তাকাল আমার মুখের দিকে। বাকি কুকুরগুলো তার দিকে ছুটে যাবার চেষ্টা করতেই আমি তাদের নিরস্ত করলাম এবং অন্যদেরও গুলি করতে নিষেধ করলাম। যেহেতু লোকটা আমার পায়ের ওপরেই আছড়ে পড়েছিল, আমি তাকে বন্দি হিসেবে দাবি করলাম এবং অ্যালফ্রেড তাকে আমার কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হলো। তারপর দিন পনেরোর মধ্যেই আমি লোকটাকে শুধরে ফেললাম।'

কৌতূহলভরে সামনের দিকে ঝুঁকে মেরি জিজ্ঞেস করল, 'কেমন করে?'

সেন্ট ক্লেয়ার মুচকি মুচকি হাসলেন, 'খুব সহজ উপায়ে। আমি তাকে পরিষ্কার করে ওষুধ দিয়ে বেঁধে যতদিন পর্যন্ত না সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে সে হাঁটা-চলা করতে পারল, আমি নিজে হাতে তার শুশ্রূষা করতে লাগলাম। তার কিছু কাল পরে স্কিপিওকে একখানা মুক্তিপত্র লিখে দিয়ে বললাম সে এবার যেখানে খুশি চলে যেতে পারে।'

মিস ওফেলিয়া জিজ্ঞেস করলেন, 'সে চলে গিয়েছিল?'

'না। কাগজটা সে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছিল, কিছুতেই আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চায় নি। স্কিপিওর মতো সাহসী ও বিশ্বাসী লোক আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি। কিছুদিন পরে সে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করে এবং ছোট্ট একটা শিশুরই মতো সরল হয়ে যায়। হ্রদের ধারে আমার যে বিষয়সম্পত্তি রয়েছে, সেটা সে-ই দেখাশোনা করত। কিন্তু সে কলেরায় মারা যায়। সত্যি বলতে কী, স্কিপিও আমারই জন্যে প্রাণ দিয়েছিল। সে বছর আমিও কলেরায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমার সেবা-শুশ্রূষা করতে করতেই সে রোগাক্রান্ত হয়। আমি সেরে উঠি, কিন্তু সে মারা যায়। তার অভাব আমি যতটা অনুভব করেছিলাম, জীবনে আর কারো জন্যে ততটা অনুভব করি নি।'

গল্প শুনতে শুনতে ইভা ধীরে ধীরে সরে এসে বাবার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখ বড় বড় করে গভীর আগ্রহে শুনতে শুনতে সদ্য মেলা পাপড়ির মতো ওর ঠোঁট দুটো অল্প একটু ফাঁক হয়ে গিয়েছিল। গল্প শেষ হতেই হঠাৎ বাবার গলাটা জড়িয়ে ধরে ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল, জল ভরে উঠল ওর ডাগর চোখ দুটোতে।

'সোনামণি আমার, কী হয়েছে তোমার?' মেয়ের সোনালি চুলে হাত বুলিয়ে আদর করতে করতে আগাস্টিন বললেন। কিন্তু ইভাকে তখনো অবরুদ্ধ আবেগে ফুলে ফুলে

উঠতে দেখে উনি নিজেই অনুতপ্ত হলেন। 'সত্যি, আমারই ভুল হয়েছে। মেয়েটার মন বড় দুর্বল, ওর সামনে আমার এসব বলা উচিত হয় নি।'

'না বাপী, আমার মন দুর্বল নয়।' নিজেকে অনেকটা সামলে নিয়ে ইভা বেশ দৃঢ় স্বরেই বলল।

'কিন্তু এইসব ঘটনা আমার মনকে খুব নাড়া দেয়।'

'তার মানে! তুমি কী বলতে চাইছ, মামণি?'

'আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না, বাপী। কিন্তু আমি এসব সম্পর্কে অনেক কিছু ভাবি। হয়তো একদিন তোমাকে আমি সব বলব।'

'তাই বল, সোনামণি; কিন্তু এখন কেঁদো না, লক্ষ্মীটি। তুমি তো জানো, কাঁদলে তোমার বাপীর মনে কত কষ্ট হয়। চলো, দুজনে বরং নতুন রঙিন মাছগুলো দেখে আসি।'

কথাগুলো বলে আগাস্টিন ইভার হাত ধরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই আঙিনার ওপার থেকে ভেসে এল দুজনের ছুটোছুটি আর মুখর কলহাস্য।

ষোলো

টপসি

আস্তাবলের ওপর টমের ঘরখানা ছোট হলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর খোলামেলা। আসবাব বলতে কেবল একটা শয্যা, একখানা চেয়ার আর টেবিল। ধবধবে সাদা টেবিলের ওপর সযত্নে সাজানো রয়েছে তার জীর্ণ বাইবেলখানা আর সামান্য কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস।

টম তখন চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর শ্লেট রেখে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কী যেন লিখছে। আসলে বেচারির মন তখন বাড়ির জন্যে খুবই কাতর হয়ে উঠেছিল। তাই ইভার কাছ থেকে একখানা কাগজ চেয়ে নিয়ে সে চিঠি লেখার চেষ্টা করছিল। ভেবেছিল প্রথমেই

চিঠির খসড়াটা শ্লেটের ওপর করে নেবে। কিন্তু খসড়াটা তার কিছুতেই মনঃপূত হচ্ছিল না, কেননা দীর্ঘ অনভ্যাসের ফলে মাস্টার জর্জের কাছ থেকে শেখা অক্ষরের অনেকগুলোই সে ভুলে গিয়েছিল। যেগুলো মনে আছে, তার সাহায্যে চিঠিটা কীভাবে লেখা সম্ভব সেটা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না।

এমন সময় ইভা চুপিচুপি এসে পেছনে থেকে টমের কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মারল। পরক্ষণেই কিছুটা অবাক হয়ে, কিছুটা মজা পাওয়ার ভঙ্গিতে খিলখিল করে হেসে উঠল।

'টম চাচা, এটা তুমি কী করছ?'

প্রথমে টম চমকে উঠেছিল, কিন্তু ছোট্ট পাখির মতো মিষ্টি ইভাকে দেখে সে খুশি হয়েছিল তার চাইতেও বেশি।

'বাড়িতে আমার বউ আর ছেলেমেয়েদের কাছে একখানা চিঠি লেখার চেষ্টা করছি, ইভা। কিন্তু পারব বলে মনে হচ্ছে না।'

'কেন, টম চাচা?'

'কতকগুলো অক্ষর একদম ভুলে গেছি। এখন আর কিছুতেই মনে করতে পারছি না।'

'আমার মনে হয় আমি তোমাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি।'

তারপর দুজনে গভীর আগ্রহে টেবিলের ওপর একেবারে ঝুঁকে পড়ে প্রায় একই অনভিজ্ঞতায়, চিঠিখানা লিখতে শুরু করল। প্রতিটা শব্দ বহু আলোচনা ও শলাপরামর্শের পর লেখাটা মোটামুটি একটা চিঠির আকার ধারণ করল।

লেখাটার দিকে তাকিয়ে ইভা বলল, 'তুমি যাই বল টম চাচা, চিঠিটা কিন্তু দেখতে বেশ ভালোই হয়েছে। তোমার বউ আর ছেলেমেয়েরা দেখলে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। তবে এটা সত্যিই খুব লজ্জার কথা যে ওদের কাছ থেকে তোমাকে চলে আসতে হয়েছে। আমি বাবাকে বলব উনি যেন কিছুদিনের জন্যে তোমাকে ঘরে যেতে দেন।'

'আমার আগের মনিবানি বলেছিলেন যে টাকা সংগ্রহ করতে পারলেই পাঠাবেন। আমি বিশ্বাস করি উনি নিশ্চয়ই তা করবেন। মাস্টার জর্জ বলেছিল আমাকে নিতে আসবে। স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ সে এই ডলারটা আমাকে উপহার দিয়েছিল।' জামার মধ্যে থেকে লকেটটা বার করে টম ইভাকে দেখাল।

'তাহলে আমার মনে হয় ও নিশ্চয়ই তোমাকে নিতে আসবে। আর কেউ যদি তোমাকে নিতে আসে, আমি সত্যিই খুব খুশি হব, টম চাচা।'

'আসলে কী, জানো', ম্লানস্বরে টম বলল, 'আমি চিঠিতে ক্লোকে জানাতে চাই যে আমি বেশ ভালো জায়গাতেই আছি ... কেননা বেচারি আমার জন্যে সত্যিই খুব ভাবছে।'

'টম।' দরজার বাইরে হঠাৎ আগাস্টিন সেন্ট ক্লেয়ারের গলা শোনা গেল। টম ইভা দুজনেই চমকে উঠল।

একটু পরে আগাস্টিন ভেতরে ঢুকে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, এটা আবার কী হচ্ছে?'

ইভা বলল, 'টম চাচার চিঠি। আমি ওকে লিখতে সাহায্য করেছি। তুমি বলো, চিঠিটা বেশ সুন্দর হয় নি?'

দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আগাস্টিন মুচকি মুচকি হাসলেন। 'আমি তোমাদের কাউকেই ঠিক নিরুৎসাহ করতে চাই না। তবে আমার মনে হয় টম, চিঠিটা আমি লিখে দিলে হয়তো আর একটু ভালো হবে। তুমি যদি চাও, বেড়িয়ে ফিরে আসার পর তোমার চিঠিটা লিখে দিতে পারি।

ইভা বলল, 'টম চাচার চিঠিটা সত্যিই খুব দরকারি, বাপী। ওর আগের মনিবের স্ত্রী বলেছিলেন যে ওকে আবার কিনে নেবার জন্যে টাকা পাঠাবেন।'

সেন্ট ক্লেয়ার জানতেন যে অনেক সহৃদয় মনিব ক্রীতদাস দাসীদের বিক্রি করার সময় এই ধরনের সান্ত্বনা দিয়ে থাকেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা কোনোদিনই ওদের সেই আশা পূরণ করেন না। উনি অবশ্য ইভার কথায় কোনো মন্তব্য করলেন না, শুধু টমকে তাঁর ঘোড়াটা সাজিয়ে বার করার আদেশ দিলেন।

তারপর বেড়িয়ে ফিরে এসে তিনি সেদিনই সন্ধ্যেয় টমের চিঠিটা লিখে দিলেন এবং চিঠিটা যথারীত ডাকবাক্সে ফেলেও দেওয়া হলো।

সেদিন সকালবেলায় মিস ওফেলিয়া ঘরের কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলেন, আগাস্টিন সেন্ট ক্লোয়ার হঠাৎ ওঁকে বৈঠকখানায় ডেকে পাঠালেন।

'ওঃ ওফেলিয়া! তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে চাই।'

কিছু বুঝতে না পারা ভঙ্গিতে ওফেলিয়া বললেন, 'কী ব্যাপার?'

'তোমার জন্যে এটাকে কিনে এনেছি, দেখো।'

নয় দশ বছরের একটা কৃষ্ণাঙ্গ মেয়েকে দেখিয়ে আগাস্টিন বললেন।

মেয়েটি খুবই কালো। এত কালো যে আপাতদৃষ্টিতে আফ্রিকান বলেই ভুল হয়। মুক্তোর মতো ঝকঝকে সাদা দাঁত, গলায় পুঁতির মালা। কুচকুচে কালা কোঁকড়ানো চুলগুলো বিনুনী বাঁধা। অসম্ভব উজ্জ্বল, চঞ্চল চোখ দুটো বিস্ময়ে ঘরের চারদিকে ঘুরছে।

ওফেলিয়া অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, 'এটাকে আবার এখানে নিয়ে এলে কেন?'

'এর নাম টপসি। খুব ভালো নাচতে আর গাইতে পারে। তুমি নিজে যেমনটা চাও, তেমনিভাবে একে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে পারবে বলেই একে নিয়ে এসেছি।'

ওফেলিয়া বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। সেই মুর্হূতে কী বলবেন উনি কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। বোনের অবাক হবার ভঙ্গি দেখে আগাস্টিন খুবই মজা পেলেন, মুচকি হেসে মেয়েটিকে বললেন 'টপসি, এখন থেকে ইনিই তোমার নতুন মনিবানী। এঁর হাতেই তোমাকে দিচ্ছি। দেখো যেন একটুও দুষ্টুমি করো না।'

চোখের মণিতে ঝিলিক তুলে টপসি বলল, 'আচ্ছা।'

'এঁর কথা শুনবে, আর খুব ভালো হয়ে থাকবে, বুঝেছ?'

'হ্যাঁ!'

'কিন্তু, আগাস্টিন', এতক্ষণ পর ওফেলিয়া যেন ভাষা খুঁজে পেলেন, 'এ সবের কী প্রয়োজন ছিল, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না! তোমার সারা বাড়ি এমনিতেই চাকর-বাকরদের ভিড়ে একবারে ঠাসা, ওদের সামলাতে সামলাতে আমার জান বেরিয়ে যাচ্ছে। তার ওপর তুমি এটাকে আবার কোন দুঃখে এনে জোটালে শুনি?'

'ওই যে তোমাকে বললাম, নিজের মতো করে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবে বলে।'

ওফেলিয়া রীতিমতো চটে উঠলেন। 'ওসব করার আমার একটুও সময় নেই।'

'সত্যিই তুমি বিশ্বাস করো ওফেলিয়া', ওফেলিয়ার হাত দুটো ধরে ওঁর রাগ ভাঙানোর ভঙ্গিতে আগাস্টিন বললেন, 'আমি কিন্তু তোমার কথা ভেবেই টপসিকে নিয়ে এসেছি।'

'আমি স্পষ্টই বলছি, আমার আর কাউকে চাই না।'

'তাহলে তোমাকে সত্যি কথাটাই বলি', ওফেলিয়াকে একপাশে এনে আগাস্টিন চাপাস্বরে বললেন, 'রেস্তোরাঁর মালিক মাতাল অবস্থায় মেয়েটাকে বেধড়ক মারধর করত, আমি প্রায়ই ওর আর্তচিৎকার শুনতে পেতাম কিন্তু কেন জানি না, হয়তো ওর সপ্রতিভ ভঙ্গির জন্যেই, মেয়েটাকে আমার বেশ ভালো লাগত। তাই ভাবলাম, কিনে নিয়ে ওকে যদি তোমার হাতে তুলে দিতে পারি, তাহলে হয়তো ওকে বাঁচানো সম্ভব হবে। তাছাড়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি চেষ্টা করলে ওকে নিশ্চয়ই তোমার মতো করে গড়ে তুলতে পারবে।'

'কিন্তু মেয়েটা দেখছি যা অসম্ভব নোংরা ... আর পরনে জামাকাপড় প্রায় নেই বললেই চলে ...'

'ওটা কোনো ব্যাপারই নয়, ওফেলিয়া', আগাস্টিনের কণ্ঠস্বর শুনে স্পষ্ট বোঝা গেল বোনকে রাজি করাতে পেরে তিনি খুশি হয়েছেন। স্নানঘরে নিয়ে গিয়ে কয়েকটা পরিষ্কার পোশাক দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

টপসিকে নিয়ে ওফেলিয়া অন্দরমহলে চলে গেলেন। উনি ভালো করেই জানতেন নতুন এই মেয়েটিকে পুরনো দাসীরা খুব একটা ভালো চোখে দেখবে না। তাই নিজে দাঁড়িয়ে থেকে টপসিকে পরিষ্কার করে স্নান করানো ও পোশাকের ব্যাপারটা দেখাশোনা করলেন, তারপর ওকে নিজের ঘরে নিয়ে এলেন।

'তোমার বয়স কত, টপসি?'

'জানি না, মিসিস।' টপসির সাদা দাঁতগুলো ঝিকমিক করে উঠল।

'কত বয়স তুমি জানো না? কেউ তোমাকে বলে নি?'

'না, মিসিস।'

'এ ভাবে তোমার মা কে?'

'আমার মা ছিল না, মিসিস।'

'তার মানে! তুমি কোথায় জন্মেছ?'

'আমি জন্মাই নি, মিসিস।'

না হেসে মিস ওফেলিয়া আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। আর কখনো আমার কথার জবাব দেবে না, আমি তোমার সঙ্গে খেলা করছি না। বলো তুমি কোথায় জন্মেছ আর তোমার বাবা-মাই বা কে?'

'আমি জন্মাই নি, মিসিস। আর আমার বাবা-মাও নেই। খুব ছোটবেলায় একজন ব্যবসায়ী আমাকে কিনেছিল ... ছোট ছোট অনেক ছেলেমেয়েকে সে প্রায়ই কেনে। একটু বড় হবার পর লোকটা আমাদের বাজারে বেচে দেয়।'

টপসির সরলতায় ওফেলিয়া মনে মনে বিচলিত বোধ না করে পারলেন না, তাই আগের চাইতে আরো আন্তরিকভাবে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি সেলাই করতে পার, টপসি?'

'না, মিসিস।'

'আগের মনিবের ওখানে তুমি কী কাজ করতে?'

www.alorpathsala.org

'জল আনতাম, থালা-বাসন ধুতাম, ছুরি পরিষ্কার করতাম ...'

'ঠিক আছে, এখন থেকে তুমি শুধু আমারই ঘরের কাজ করবে।'

বিছানা করা থেকে শুরু করে ঘর-গোছানোর প্রায় সমস্ত কাজই টপসি নিপুণ দক্ষতায় শিখে নিল। এখন আর ওসব কিছুই ওফেলিয়াকে দাঁড়িয়ে থেকে দেখিয়ে দিতে হয় না। কিন্তু সেদিন হঠাৎ ওফেলিয়ার নজরে পড়ল টপসির জামার হাতার মধ্যে থেকে উঁকি দিচ্ছে রঙিন একটা ফিতের একটুখানি অংশ।

'কী ব্যাপার টপসি, তুমি ফিতেটা চুরি করেছ?' মিস ওফেলিয়া সত্যিই খুব অবাক হলেন।

টপসি নিজেই ওই ফিতেটা জামার হাত থেকে টেনে বার করল।

'মিস ওফেলিয়ার ফিতেটা আমার এই হাতার মধ্যে কী করে এল আমি নিজেই বুঝতে পারছি না।'

'টপসি, তুমি খুব দুষ্টু মেয়ে। মিথ্যে বলো না। এই ফিতেটা তুমি চুরি করেছ।'

'আমি চুরি করি নি, মিসিস।'

'টপসি, মিথ্যে কথা বলাটা আরো খারাপ।'

'আমি মিথ্যে বলছি না, মিসিস।'

'টপসি, মিথ্যে বললে আমি কিন্তু তোমাকে চাবুক মারতে বাধ্য হব!'

'সত্যিই আমি মিথ্যে বলছি না, মিসিস।'

কিন্তু টপসির চোখ-মুখ দেখে ওফেলিয়া স্পষ্টই বুঝতে পারলেন ও মিথ্যে বলছে। তাই ওর কাঁধ ধরে নাড়া দিতে দিতে ওফেলিয়া ধমক দিলেন, 'টপসি! ফের তুমি মিথ্যে বলছ?'

'আমি মিথ্যে বলছি না, মিসিস।'

নিজের জেদ বজায় রাখার জন্যে টপসি তখনো সমানে মিথ্যে বলে চলেছে, কিন্তু কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দেওয়ার ফলে টপসির অন্য জামার হাতা থেকে দুটো দস্তানা মেঝেতে পড়ে গেল।

'বাঃ চমৎকার!' ওফেলিয়া বলে উঠলেন। 'এর পরেও তুমি বলবে ফিতেটা চুরি করো নি!'

দস্তানা দুটো চুরি করার কথা টপসি স্বীকার করল, কিন্তু ফিতে চুরির ব্যাপারটা স্বীকার করতে ও রাজি নয়। এদিকে ওফেলিয়াও এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। তাই রীতিমতো দৃঢ়স্বরেই বললেন, 'টপসি, এই মুহূর্তে সব স্বীকার না করলে আমি কিন্তু সত্যিই অ্যাডলফকে ডেকে চাবুক লাগাতে বলব।'

টপসি তখন নিঃসঙ্কোচেই স্বীকার করল ও দুটো ও চুরি করেছে।

'ঠিক আছে, এবার বলো তো আর কী কী নিয়েছ?'

'আমি শুধু কুমারী ইভার লাল প্রবালের মালাটা নিয়েছি।'

'ওকে না বলে তুমি কেন নিয়েছ?'

'আমি সত্যিই খুব খারাপ মেয়ে, মিসিস।'

'না না, টপসি, তুমি খুব ভালো মেয়ে!' নিঃশব্দ পায়ে ইভা কখন ঘরে ঢুকেছিল কেউ টের পায় নি। শেষের কথাগুলো শুনতে পেয়ে সে টপসির হাতটা জড়িয়ে ধরে বলল, 'শুধু

প্রবালের মালাটা কেন, আমার যা আছে সব তোমাকে দিয়ে দেব। তাহলে তোমার আর কখনো চুরি করার দরকার হবে না।'

মূর্তিময়ী ইভার কথা শুনে টপসির দুচোখে তখন জল এসে গিয়েছিল, কেননা জীবনে ওর সঙ্গে এমন মিষ্টি করে কথা কেউ কখনো বলে নি।

টপসির প্রতিভার সত্যিই কোনো তুলনা হয় না। শুধু দক্ষতা বা নিপুণতা নয়, আশ্চর্য উল্লেখযোগ্য ওর স্মরণশক্তি। কয়েক দিনের চেষ্টাতেই ও প্রতিটা অক্ষর শিখে নিয়েছিল এবং নিজে নিজে মোটামুটি বেশ ভালোই পড়তে পারত। কিন্তু সেলাই-ফোঁড়াইয়ের কাজ ওর আদৌ ভালো লাগত না। ওফেলিয়া চোখের আড়াল হলেই হয় সুঁই ভাঙত, নয়তো সুতোয় জট পাকিয়ে রাখত এবং চোখের নিমেষে জানালা দিয়ে ফেলে এমন নিষ্পাপ মুখে চুপচাপ বসে থাকত, যেন এ সম্পর্কে ও কিছুই জানে না।

হাসি-গানে, মূকাভিনয়ে, ভাঁড়ামিতে, হইচই আর গোছানিতে ওর জুড়ি মেলা ভার। সেই ঘটনার পর থেকে ও আর কখনো চুরি করে নি বটে, কিন্তু প্রায়ই দেখা যেত, বেশ কয়েকদিন ধরে না-খুঁজে পাওয়া একজোড়া মাকড়ি হঠাৎ খুঁজে পাওয়া গেল কারুর জুতোর মধ্যে, কিংবা সুন্দর একটা পোশাক দলা-মোচড়ানো অবস্থায় বেরুল বিছানার তলা থেকে। কেউ হঠাৎ হোঁচট খেল গরমজলের পাত্রটার ওপর কিংবা কোথাও কিছু নেই, সুন্দর পোশাকপরা অবস্থাতেই দুম করে আছাড় খেল শুকনো মেঝের ওপর। দুর্ঘটনার কারণ আবিষ্কার করা গেলেও, অপরাধীকে কিন্তু কখনো আবিষ্কার করা যেত না। ওফেলিয়া কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারতেন কাজটা টপসির।

কখনো কখনো হতাশ হয়ে উনি সত্যিই অভিযোগ করতেন, 'মাঝে মাঝে আমার তো মনে হয় মেয়েটাকে সত্যিই চাবকানো দরকার।

একই ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে আগাস্টিন জবাব দিতেন, 'প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই তা করবে। ওর সম্পর্কে আমি তো তোমাকে যা খুশি করার অধিকার দিয়েছি, ওফেলিয়া।'

'তুমি হাসছ বটে', ওফেলিয়া রাগ দেখিয়ে বলতেন, 'কিন্তু আমি যে কী করে ওকে সামলাব নিজেই বুঝতে পারছি না!'

'সেটা এই মুহূর্তে বলা সত্যিই খুব কঠিন। আর তুমি ওকে নিয়ে যা করতে চাও, তাতেও আমি বাধা দিতে পারি না। তবে তোমাকে একটা কথা বলতে পারি, ওফেলিয়া, ওকে মেরে কোনো লাভ হবে না, জীবনে ও অজস্র মার খেয়েছে। বরং ওকে ওর মতো থাকতে দিলেই হয়তো কিছুটা লাভ হবে।'

মুখে যাই বলুন না কেন, ওফেলিয়া ভাইয়ের মতামতের খুব একটা দ্বিমত ছিলেন না, তাই সবসময়ই টপসিকে চোখে চোখে রাখতেন। কিন্তু চোখের আড়াল হলেই টপসি একটা না একটা অঘটন বাঁধিয়ে বসে থাকবে। ওর যখন ইচ্ছে হবে বিছানার চাদরটা এমন সুন্দরভাবে পেতে রাখবে যে তাতে কোথাও কোনো ভাঁজ থাকবে না, ঘরদোরের ধুলো ঝেড়ে যেখানকার যা কিছু সব নিপুণ হাতে গুছিয়ে রাখবে। আবার যখন ইচ্ছে হলো তো বালিশের ঢাকনা খুলে মাথায় গলিয়ে ঘরময় ভূত সেজে ঘুরে বেড়াবে। নয়তো ওফেলিয়ার রাতের পোশাক থেকে শুরু করে সবকিছু ঘরময় ছড়িয়ে রেখে বারান্দায় কোনো একটা থামের ওপর উঠে মাথাটা নিচের দিকে ঝুলিয়ে দোল খেতে খেতে নিজের মনেই গান গাইবে।

একবার দেখা গেল মিস ওফেলিয়ার সবচেয়ে দামি কাশ্মিরী শালটাকে পাগড়ির মতো মাথায় দিয়ে মিস টপসি দীর্ঘ সময় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দেহ-ভঙ্গিমার মহড়া দিচ্ছে। সেই প্রথম মিস ওফেলিয়া আলমারির চাবিটা টানার মধ্যে রেখে দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং ধৈর্যের প্রায় শেষ সীমায় পৌছে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'টপসি, আমাকে জিজ্ঞেস না করে তোমার আলমারি খোলাটা কি ঠিক হয়েছে?'

'না, মিসিস।'

'সত্যি তোমাকে নিয়ে কী করব আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

'আমাকে চাবকানো উচিত, মিসিস।' অত্যন্ত নির্লিপ্ত স্বরেই টপসি জবাব দিল। 'আমার পুরনো মনিব আমাকে সবসময়ই চাবুক মারতেন। চাবুক না খেলে আমি একদম ভালোভাবে কাজ করতে পারি না, মিসিস।'

'তোমাকে আমি কখনই চাবুক মারতে চাই না, টপসি। আমি জানি, একটু মন দিলেই তুমি ভালো কাজ করতে পার।'

'কিন্তু চাবুক না খেলে আমি কাজে মন দিতে পারি না, মিসিস।'

টপসির সরল আন্তরিকতায় ওফেলিয়া কিছুতেই ওর ওপর রাগ করতে পারলেন না। তাই মনে মনে ঠিক করলেন আর কিছু না বলে ওকে ওর মতোই থাকতে দেবেন।

সতেরো

কেন্টাকি

গ্রীষ্মের এক গোধূলিবেলা। বিরাট বৈঠকখানার সমস্ত দরজা-জানলা একেবারে হাট করে খোলা রয়েছে, যদি বাইরের হিমেল হাওয়া ভুল করেও একটু ভেতরে ঢোকে। রাতের আহার সেরে মিস্টার শেলবি তখন একটা চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে আয়েস করে চুরুট টানছেন। মিসেস শেলবি দরজার সামনে নিচু একটা মোড়ায় বসে সেলাই করছেন।

এতক্ষণ ধরে যে কথাটা উনি বলি বলি করেও সুযোগের অপেক্ষায় বলতে পারছিলেন না, এবার সেটা বলেই ফেললেন :

'জানো আর্থার, টম ক্লোকে একটা চিঠি দিয়েছে।'

'ও, তাই নাকি! তাহলে নিশ্চয়ই ওখানে ওর চিঠি লিখে দেওয়ার মতো কেউ না কেউ আছে। তা কেমন আছে ও?'

'খুব ভদ্র পরিবারের একজন ওকে কিনেছেন। তিনি ওর সঙ্গে খুব ভালোই ব্যবহার করেন এবং টমকেও তেমন পরিশ্রমের কাজ কিছু করতে হয় না।'

'বাঃ, শুনে সত্যিই খুব খুশি হলাম!' আন্তরিকভাবেই শেলবি বললেন। 'আমার মনে হয় দক্ষিণ দেশটা বেশ ভালোই ওর সয়ে যাবে। পরে হয়তো ও আর কোনোদিন এখানে ফিরেই আসতে চাইবে না।'

'না না, বরং ঠিক তার উল্টো। ও জানতে চেয়েছে কবে নাগাদ ওকে উদ্ধারের টাকাটা আমরা যোগাড় করতে পারব?' শেলবি একটু বিষণ্ণ হয়ে বললেন, 'টাকাটা যোগাড় করা সত্যিই খুব কঠিন।'

'কিন্তু আর্থার, আমার মনে হয় এ ব্যাপারে সত্যিই একটা কিছু করা দরকার। ধরো, আমার যদি সব ঘোড়াগুলো বেচে দিই কিংবা কোনো একটা খামারবাড়ি ...'

'তুমি কি পাগল হয়েছ, এমিলি? যদিও আমি নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি তুমি কেন্টাকির সব চাইতে বুদ্ধিমতী ও বিদুষী মহিলা, তবুও আমি না বলে পারছি না, তুমি ব্যবসার কিছু বোঝো না। শুধু তুমি কেন, কোনো মেয়েই বোঝে না।'

'তবুও, তুমি যদি আমাকে বলো ... অন্তত সমস্ত ঋণের একটা তালিকা দাও, আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি কীভাবে সাহায্য করা যায়।'

'না এমিলি, তুমি যতটা ভাবছ, ব্যাপারটা আদৌ ততটা সহজ নয়। তা যদি হতো, আমি অনেক আগেই চেষ্টা করে দেখতাম।'

এ ব্যাপারে আলোচনা করার কোনোরকম ইচ্ছে ছিল না বলে কিছুটা বিরক্তির সঙ্গেই তিনি কথাগুলো বললেন।

সেই মুহূর্তে মিসেস শেলবি কী বলবেন কিছু বুঝে উঠতে পারলেন না। কোনো ব্যাপারে স্বামীর সঙ্গে তর্ক করা যেমন তাঁর স্বভাব নয়, তেমনি কাউকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখতে না পারাটাও তাঁর কাছে বেদনাদায়ক। তাই একসময়ে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উনি বললেন, 'কোনোভাবেই কি টাকাটা সংগ্রহ করা যায় না? বেচারি ক্লো সবসময়ই খুব মন খারাপ করে থাকে।'

'এর জন্যে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, এমিলি। আমার মনে হয় এভাবে প্রতিজ্ঞা করাটা ঠিক হয় নি। যদিও আমি একেবারে সুনিশ্চিত নই, তবু এখন থেকেই ক্লোকে মন শক্ত করতে বলা উচিত যাতে টমের আশা ও আর না করে।'

মিসেস শেলবি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। 'এ তুমি কী বলছ আর্থার?'

'কেন এমিলি, এর মধ্যে তো অন্যায়ের কিছু নেই?'

'না না, আর্থার, তা হয় না!' মিসেস শেলবি যেন অসহায়ের মতো আর্তনাদ করে উঠলেন। 'এইসব অসহায় মানুষদের কাছে একবার যে প্রতিজ্ঞা করেছি, তা থেকে

কোনোদিনই বিচ্যুত হতে পারব না। টমকে ফিরিয়ে আনার জন্যে যদি টাকাটা কোনোভাবেই সংগ্রহ করা সম্ভব না হয়, তাহলে আমি গান শিখিয়ে তা সংগ্রহ করব।'

'না না, নিজেকে এভাবে ছোট করার অনুমতি আমি তোমাকে কিছুতেই দিতে পারি না, এমিলি।' মিস্টার শেলবি কিছুটা বিচলিত বোধ করলেন।

'ছোট করা!' এবার বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মিসেস শেলবির কণ্ঠস্বর। 'অসহায় মানুষদের কাছে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাটাকে আমি তার চাইতেও বেশি ছোট কাজ বলে মনে করি, আর্থার।'

'আমি জানি, একবার কোনোকিছু তোমার মাথায় ঢুকলে, তাকে বার করার সাধ্য আমার নেই। তবু আশা করব, কাজটা করার আগে তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত ব্যাপারটা একবার ভালো করে ভেবে দেখবে।'

কফির পেয়ালাগুলো ফিরিয়ে নিতে এসে ক্লো শেলবিদের আলোচনার শেষ অংশটুকু পরিষ্কার শুনতে পেয়েছিল এবং আলোচনাটা যে তাদেরই সম্পর্কে, সেটাও বুঝতে ওর কোনো অসুবিধা হয় নি। তাই কফির সাজ-সরঞ্জাম সব গুছিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও ক্লো সেই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল না।

ওকে দাঁড়াতে দেখে মিসেস শেলবি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি কিছু বলবে, ক্লো?'

'হ্যাঁ, মিসিস। আমি বলছিলাম, অনেকেই তো তাদের দাস-দাসীদের ভাড়া খাটিয়ে পয়সা রোজগার করে ... সবাই তো আর তাদেরকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়ায় না।'

ঠিক বুঝতে না পেরে মিসেস শেলবি জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে তুমি ভাড়া খাটানোর কথা বলছ, ক্লো?'

'আমি কাউকেই ভাড়া খাটানোর কথা বলছি না, মিসিস।' ক্লো ইতস্তত করল। 'তবে স্যাম বলছিল কী ... লুসিভিলের একজন খাবারওয়ালা নাকি একটা লোক চেয়েছে, যে খুব ভালো কেক আর প্যাস্ট্রি বানাতে পারে। লোকটা বলেছে সপ্তায় সপ্তায় চার ডলার করে দেবে ...'

'তাতে তোমার কী, ক্লো?'

'আমি বলছিলাম, এতদিন ধরে কাছে থেকে স্যালি তো আমার কাজ প্রায় সবই শিখে নিয়েছে। তাই ওকে আমার জায়গায় দিয়ে আমাকে যদি কিছুদিনের জন্যে লুসিভিলে যেতে দেন, তাহলে টাকা সংগ্রহের ব্যাপারে আমি আপনাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি।'

'কিন্তু তোমার ছেলেমেয়েদের কী হবে, ক্লো?'

'ওরা এখন বড় হয়ে গেছে, নিজেরাই থাকতে পারবে। তাছাড়া স্যালি বলেছে ছোটটাকে ও দেখাশোনা করবে।'

'কিন্তু লুসিভিল তো এখান থেকে অনেক দূরে!'

'তা দূর। তবে টম যেখানে আছে, সেখান থেকে জায়গাটা কাছে।'

কী যেন ভাবতে ভাবতেই মিসেস শেলবি বললেন, 'খুব একটা কাছে নয়, ক্লো। তবু তুমি যেতে পারো। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, মাইনের প্রতিটা পয়সা তোমার স্বামীকে কিনে নেবার জন্যে সঞ্চয় করে রাখব।'

মেঘলা মেঘের ফাঁকে সূর্যের একফালি আলোর মতোই এতক্ষণ থমথমে হয়ে থাকা ক্লোর মুখটা অদ্ভুত একটা আভায় ঝিকমিক করে উঠল।

'মিসিসকে অসংখ্য ধন্যবাদ! দেখবেন, জামাকাপড় কিনে আমি একটা পয়সাও বাজে খরচ করব না ... প্রতিটা পয়সা পর্যন্ত জমিয়ে রাখব। আচ্ছা, কটা সপ্তায় এক বছর, মিসিস?

'বাহান্ন সপ্তায় এক বছর, ক্লো।'

'সপ্তাহে চার ডলার করে হলে বছরে কত হবে?'

'দুশো আট ডলার।'

'তাহলে আমাকে কত দিন কাজ করতে হবে, মিসিস?'

'এই ধরো চার-পাঁচ বছর। তবে তোমাকে অতদিন কাজ করতে হবে না, ক্লো। আমিও তার সঙ্গে কিছু কিছু করে যোগ করতে পারব।'

'না না, মিসিস; আমি চাই না আপনি গান শিখিয়ে টাকা রোজগার করুন। কর্তা ঠিকই বলেছেন, এতে পরিবারের অসম্মান হবে।'

'ও নিয়ে তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না, ক্লো।' হাসতে হাসতেই মিসেস শেলবি বললেন। 'পরিবারের সম্মানের দিকে আমি নিশ্চয়ই নজর রাখব। কিন্তু তুমি কবে নাগাদ যাবে বলে আশা করছ?'

'আমি নিজে থেকে কিছু ভেবে রাখি নি। তবে স্যাম বলছিল কাল কয়েকটা ঘোড়া নিয়ে ও নদী অব্দি যাবে। মিসিস যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি কাল সকালেই স্যামের সঙ্গে যেতে পারি। জিনিসপত্তর তেমন কিছুই সঙ্গে নেবার নেই, শুধু মিসিস যদি আমাকে একটা ছাড়পত্র লিখে দেন ...'

'ঠিক আছে ক্লো, তুমি এখন যাও। আমি কর্তার সঙ্গে আগে একটু কথা বলে নিই, তারপর নিজে গিয়ে তোমাকে জানিয়ে আসব।'

আঠারো

শীর্ণ ফুল

একটা একটা করে দিন কাটতে কাটতে আমাদের সবার সঙ্গে টমের জীবনেও প্রায় দুটো বছর কেটে গেছে। মাস্টার জর্জ শেলবি তাকে যে চিঠিটা দিয়েছে, সেটা পেয়ে তার আর আনন্দ ধরে না। চিঠিতে অনেক খবরই ছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য—ক্লো-চাচি

লুসিভিলের একটা খাবারের দোকানে কেক তৈরির কাজ করছে এবং উপার্জনের টাকা সযত্নে সঞ্চয় করে রাখছে যাতে সেই টাকা দিয়ে টমকে আবার কিনে নিতে পারে। সবচেয়ে ছোট বাচ্চাটা এখন সারা বাড়ি দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ায়। স্যালিই টমের ঘর-সংসার আর ছোটদের দেখাশোনা করে।

চিঠির পরের অংশে আছে স্কুলে জর্জের পড়াশোনা আর তার সহপাঠীদের কথা। সেই সঙ্গে রয়েছে টম চলে যাবার পর থেকে যে চারটে ঘোড়ার বাচ্চা কেনা হয়েছিল, তাদের নাম আর বিস্তারিত বিবরণ। সব শেষে রয়েছে স্বামীর সঙ্গে এলিজার কানাডায় পৌঁছনোর খবর এবং বাবা, মা আর বাড়ির অন্যান্যদের সংবাদ।

চিঠিখানার দিকে বারবার তাকিয়েও টমের মনের আশা মিটছিল না। এমন কী চিঠিখানাকে বাঁধিয়ে নিজের ঘরে টাঙিয়ে দেওয়া যায় কিনা সে সম্পর্কে ইভার সঙ্গে শলাপরামর্শও করেছে। কিন্তু ফ্রেমে বাঁধালে চিঠির দুটো ঠিক দেখা যাবে না বলে সেটা আর বাস্তবে ঘটে উঠে নি।

ইতোমধ্যে টম আর ইভার মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক খুবই গাঢ় হয়ে উঠেছে। ইভার আশ্চর্য কোমল হৃদয়ের একপ্রান্তে টম কেমন করে তার আসনটাকে একেবারে পাকা করে নিল, বলা সত্যিই খুবই কঠিন। তবে একথা ঠিক, টম ইভাকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত পুরাণের কোনো দেবীর মতো। ওর নিষ্পাপ টলটলে মুখটার দিকে টম ঐশ্বরিক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত আর কল্পনায় জীবন্ত হয়ে উঠত শৈশবে যিশুর সুন্দর মুখখানাই। আর কেন জানি না, টমকে দেখে ইভাও সাতরঙা রামধনুর মতো একেবারে ঝলমলিয়ে উঠত। সকালে বাজারে গিয়ে সবসময়েই টমের দৃষ্টি থাকত ফুলের দোকানগুলোর ওপর, যদি ইভার জন্যে সুন্দর কোনো ফুলের তোড়া চোখে পড়ে যায়। আর পছন্দসই কমলা চোখে পড়লে তা অবশ্যই টমের পকেটে লুকোনো থাকবে, যাতে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সে ইভাকে উপহার দিতে পারে। দূর থেকে ইভার উজ্জ্বল সোনালি চুলের ছোট্ট মাথাটা দেখতে পেলেই টম খুশিতে ভরে উঠত। তার চাইতেও ভালো লাগত যখন কাছে এসে ইভা মিষ্টি গলায় জিজ্ঞেস করত, 'দেখি টম চাচা, আজকে আমার জন্যে তুমি কী নিয়ে এসেছ?'

তার বিনিময়ে ইভাও টমকে কিছু কম ফিরিয়ে দিত না। আশ্চর্য মিষ্টি, সুরেলা গলায় ও টমকে বাইবেল পড়ে শোনাত। প্রথম প্রথম ও শুধু পড়ত টমকে খুশি করার জন্যে, কেননা টম আগে এমন সুন্দরভাবে কাউকে আর কখনো পড়তে শোনে নি। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে ইভাও এই দুর্লভ গ্রন্থটিকে হৃদয়ের সবটুকু দিয়ে ভালোবেসে ফেলল। এর প্রতিটা শব্দ ওর শিশু মনে এক গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করত, মনে হতো ও যেন একটা কল্পনার রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ও আর ওর বন্ধু টম, যে প্রায় ওরই মতো সরল আর শিশু, দুজনেই অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে—ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান এবং আজ যদি বাস্তবে নাও হয়, চিরন্তন ভবিষ্যতে এমন একটা অলৌকিক কিছু ঘটবে, যখন সাদা-কালো, উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোথাও কোনো প্রভেদ থাকবে না।

আমরা যে সময়ের কথা বলছি, সেন্ট ক্লেয়ার পরিবারের সবাই গ্রীষ্মযাপনের জন্যে সমুদ্রের ধারে তাঁদের 'লেক ভিলা'য় অস্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। পূর্ব ভারতীয়দের ঢঙে তৈরি করা সেন্ট ক্লেয়ারদের বাংলো বাড়িটা সত্যিই খুব সুন্দর। চারদিকে খোলা মাঠ,

সামনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ফুলের বাগান। চিত্রার্পিত সব গাছ আর নানা ধরনের ফুলের ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে সরু একফালি পথ এঁকে বেঁকে একবারে সমুদ্র-বেলার কোল পর্যন্ত নেমে গেছে। সূর্যালোকে ঝিকমিক করে ওঠে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা। কোনো ছবিই বেশিক্ষণের জন্য একরকম থাকে না, ক্ষণে ক্ষণেই তা যেন সুন্দর থেকে আরো সুন্দর হয়ে উঠে।

সূর্য তখন পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়েছে, তার আরক্তিম আভায় সমুদ্রের জলকে মনে হচ্ছে যেন আর একটা আকাশ। সেই গোলাপি আর সোনালি আভায় সাদা পালতোলা তরণীগুলো অশরীরির মতো এখানে ওখানে ভেসে বেড়াচ্ছে। ইতোমধ্যেই দু-একটা তারা উঁকি দিয়ে প্রকম্পিত জলে যেন নিজেদের ছায়া দেখছে।

বাগানের একপ্রান্তে লতাবিতানের নিচে শেওলায় ঢাকা পাথরের বেদিটাতে টম আর ইভা বসে রয়েছে। হাঁটুর ওপর বাইবেলখানা খুলে রেখে ইভা একমনে পড়ে চলেছে, '... এবং আমি দেখিতে পাইলাম অনলমিশ্রিত এক স্ফটিকের সমুদ্র।'

'ওই যে টম চাচা, ওখানে।' হঠাৎ পড়া থামিয়ে আঙুল দিয়ে সমুদ্রের দিকে দেখিয়ে ইভা বলল।

'কী, মিস ইভা?'

'এই যে, ওখানে, দেখতে পাচ্ছ না?' যেখানে সমুদ্রের জলে আরক্তিম আকাশের আভা পড়ে জ্বলজ্বল করছে, তার দিকে নির্দেশ করে ইভা বলল, 'ওইটেই তো অনলমিশ্রিত স্ফটিকের সমুদ্র!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই!' এতক্ষণ বুঝতে না পারার জন্য টম যেন লজ্জা পেল। তারপর নিজেই গানের মতো সুর করে বলল, 'আঃ, আমার যদি উষার মতো পাখা থাকিতো, তাহা হইলে আমি ক্যানানের তীরে উড়িয়া যাইতাম জ্যোর্তিময় দেবদূতগণ নব জেরুজালেমে আমার আপন বাসগৃহে লইয়া যাইতেন।'

ইভা জিজ্ঞেস করল, 'নব জেরুজালেম কোথায়, টম চাচা?'

'ওই মেঘের রাজ্যে।'

'জানো টম চাচা, মাঝে মাঝে ঘুমের মধ্যে ওইসব আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। আমার মনে হয় আমি শিগগিরই ওখানে চলে যাব।'

টম কিছুটা অবাক হয়েই ইভার মুখের দিকে তাকাল, 'কোথায়, মিস ইভা?'

যেখানে সমুদ্র আর আকাশ এক হয়ে মিশে গেছে, এবং গাঢ় একটা দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে মেঘের চারপাশ, সেই দিকে নির্দেশ করে ইভা বলল, 'ওইখানে, টম চাচা। মেঘের রাজ্যে।'

ইভার কথায় টমের বিশ্বস্ত হৃদয় বেদনায় ভরে উঠল। গত মাস-ছয়েক ধরেই সে লক্ষ করে আসছে ইভার ছোট্ট হাত দুটো কেমন যেন বিশীর্ণ হয়ে গেছে, আরো স্বচ্ছ হয়ে গেছে গায়ের রং। এখন বাগানে একটু খেলাধুলা বা ছুটোছুটি করলেই ও একেবারে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়ে। মিস ওফেলিয়াকে সে প্রায়ই কী যেন একটা কাশির কথা বলতে শুনেছে, যেটা ডাক্তার দেখিয়েও ঠিক সারানো যাচ্ছে না। এখনো মেয়েটার হাত আর গাল গরম হয়ে রয়েছে, মনে হয় যেন জ্বর হয়েছে ওর।

হঠাৎ ভেতর থেকে ওফেলিয়ার ডাকে টম আর ইভার কথাবার্তায় বাধা পড়ল।

'ইভা, ইভা ... শিগগির ভেতরে এসো। আর বাইরে থেক না, হিম পড়ছে।'

ইভা আর টম তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল।

ধাত্রীবিদ্যায় পরাদর্শী মিস ওফেলিয়া ইভার ওই খুকখুকে চাপা কাশি, জ্বরতপ্ত শুকনো চিবুক আর চোখের দীপ্তি দেখে মাঝেমাঝে খুবই শঙ্কিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু উনি যখনই ভাইকে এই আশঙ্কার কথা জানাতেন, আগাস্টিন হেসেই উড়িয়ে দিতেন।

'ও কিছু নয়, ওফেলিয়া', অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আগাস্টিন জবাব দিতেন। 'দেখছো না মেয়েটা বড় হচ্ছে। বাড়ন্ত সময় মেয়েদের শরীর অমন ভেঙেই থাকে।'

'আর কাশিটা?'

'হয়তো একটু ঠাণ্ডা লেগেছে, তাই। দু-একদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'একটুতেই মেয়েটা কী রকম ক্লান্ত হয়ে পড়ে সেটা লক্ষ করেছ?'

'সারাদিন অত ছুটোছুটি করলে সবাই ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

মুখে যাই বলুন না কেন, আগাস্টিন কিন্তু মনে মনে মেয়েটার জন্যে উদ্বিগ্ন বোধ না করে পারতেন না। তাই তিনি আগের চাইতে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়েই ইভাকে লক্ষ করতেন এবং প্রায়ই নিজের মনে বলতেন, 'কই, আমি তো তেমন কিছু খারাপ দেখতে পাচ্ছি না!' পক্ষান্তরে বরং মাঝে মাঝে ইভার কথা শুনে তিনি অবাক হয়ে যেতেন। শিশুর যা কিছু সরল মাধুর্য সত্ত্বেও ইভা কখনো কখনো পরিণত মানুষের মতো এমন সব গভীর আর অদ্ভুত অদ্ভুত কথা বলত, যা তাঁকে বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত করে অধীর করে দিত, তাঁকে বিপুল আনন্দে ভরিয়ে তুলত। তেমনি কোনো মুহূর্তে আগাস্টিন আগ্রহে মেয়েকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরতেন, যেন এইভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলেই কেবল মেয়েকে বাঁচানো যাবে। সবসময় ইভাকে তিনি খুশি রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, এবং সে-জন্যই মেয়েকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে প্রায়ই বাইরে বেড়াতে যেতেন।

অপরের প্রতি ভালোবাসা আর করুণায় ইভার সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। বালিকা হলেও ওর পরিণত মনে গভীর চিন্তা পরিবারের সবাইকেই গভীরভাবে আকর্ষণ করত, অথচ ওর শিশুসুলভ চপলতার কোথাও কোনো অভাব ছিল না। এখনো ও টপসি আর অন্যান্য নিগ্রো শিশুদের সঙ্গে খেলতে বা ছুটোছুটি করতে ভালোবাসে। তবে আজকাল ও যেন খেলার চাইতে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতেই বেশি আনন্দ পায়। প্রথম খানিকক্ষণ বসে বসে ওদের খেলা দেখবে, উৎসাহ দেবে, টপসির যতরকম পুরনো চালাকিতে হাসবে—তারপরেই একটু একটু করে ওর মুখের ওপর নেমে আসবে ক্লান্তির একটা গাঢ় ছায়া, চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যাবে, মনটা হারিয়ে যাবে অনেক দূরে।

'আচ্ছা, মামণি,' ইভা একদিন হঠাৎ ওর মাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাদের দাসদাসীদের লেখাপড়া শেখাও না কেন?'

'এটা আবার কী ধরনের প্রশ্ন! কেউই তা করে না।'

'কেন করে না মামণি?'

'যেহেতু ওদের লেখাপড়া শেখার কোনো দরকারই হয় না।'

'কিন্তু ওদের প্রত্যেকের লেখাপড়া শেখা দরকার, মামণি ... অন্তত যাতে বাইবেলটা পড়তে পারে।'

'পড়তে পারলেই বা ওদের কী লাভ? মিস ওফেলিয়া তো টপসিকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। ইচ্ছে করলে ও নিজে নিজেই বাইবেল পড়তে পারে। কিন্তু তাতে কী লাভ হয়েছে শুনি? আমার তো মনে হয় যত ছেলেপুলে দেখেছি, টপসি তাদের মধ্যে সব চাইতে ...'

'না না, মামণি, টপসি এখন খুব ভালো হয়ে গেছে! আমি যখন সবাইকে বাইবেল পড়ে শোনাই, ও-ও খুব মন দিয়ে শোনে।'

'ওঃ, ভালো কথা, ইভা! কয়েক দিন ধরেই বলব বলব করে আর কিছুতেই হয়ে উঠছিল না ...' টানার মধ্যে গয়নাগুলো গুছাতে গুছাতেই মেরি বলল, 'চাকর-বাকরদের বাইবেল পড়ে শোনানো ছাড়াও তোমার অনেক কাজ আছে ... তাছাড়া ও কাজটা যে খুব ভালো তা কিছু নয়। তোমার বয়সের মেয়েরা ও কাজ কখনো করে না। একটা কথা তোমার মনে রাখা দরকার, তুমি এখন বড় হচ্ছো। ভালো ভালো পোশাক গয়না পরে তোমাকে সমাজের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে হবে। এই দেখো, তুমি যখন বড় হবে, এই গয়নাগুলো আমি তোমাকে উপহার দেব। এই গয়নাগুলো পরেই আমি আমার জীবনের প্রথম বল নাচের আসরে গিয়েছিলাম। এখনো স্পষ্ট মনে আছে, আমার রূপে সেদিন সবাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।'

গয়নার বাক্সটা নিয়ে তার মধ্যে থেকে একছড়া হীরের হার বার করে ইভা স্থিরদৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে রইল, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল ওর মন রয়েছে তখন অন্যদিকে।

মেরি জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার ইভা, তোমাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?'

'এইগুলোর দাম কি অনেক, মামণি?'

'নিশ্চয়ই।'

'এগুলো যখন আমার, আশা করি এ দিয়ে আমি যা খুশি তাই করতে পারব।'

'তুমি কী করতে চাও, ইভা?'

'এগুলো বিক্রি করে আমি ফ্রি স্টেটে একটু জায়গা কিনব। তারপর আমাদের যত দাস-দাসী আছে সেখানে তাদের নিয়ে গিয়ে কয়েকজন শিক্ষককে দিয়ে লেখাপড়া শেখাব।'

মেয়ের কথা শুনে মেরি হেসে ফেলল।

'শিক্ষকরা ওদের লেখাপড়া শেখাবে, তুমি নিজে হাতে ওদের শেখাবে পিয়ানো বাজাতে আর মখমলের পর্দায় ছবি আঁকতে!'

'আমি সবচেয়ে আগে যেটা ওদের শেখাতে চাই—ওরা যেন নিজে নিজেই বাইবেল পড়তে পারে।' ইভা এমনভাবে কথাগুলো বলল যেন এ সবই ওর পূর্বপরিকল্পিত এবং ওর কণ্ঠস্বরে কোথাও কোনো জড়তা বা দ্বিধা নেই। 'এটা ওদের বাঁচার জন্যেই বিশেষ প্রয়োজন। তারপর যেটা শেখাতে চাই, সেটা হলো লিখতে—যাতে নিজেদের চিঠি ওরা নিজেরাই লিখতে পারে। এগুলো না পারার জন্য ওরা সত্যিই খুব কষ্ট পায়, মামণি।'

'চুপ করো, ইভা!' এবার মেরি আর ধৈর্য রাখতে পারল না। 'তুমি এখন অনেক ছোট। এসব জিনিস বোঝার বয়স তোমার হয় নি। তাছাড়া তোমার এসব কথা শুনলে আমার মাথা ধরে যায়।'

কারো কথা মনমতো না হলে বরাবরই মেরির মাথা ধরে যেত।

ইভা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু সেই দিন থেকেই ও মনে মনে স্থির করল মামিকে দিয়েই প্রথম শুরু করবে।

উনিশ

হেনরিক

এই সময় আগাস্টিন সেন্ট ক্লেয়ারের ভাই অ্যালফ্রেড সেন্ট ক্লেয়ার তাঁর বড় ছেলে হেনরিককে নিয়ে দিন-কয়েকের জন্যে বেড়াতে এলেন।

পরিণত বয়সের এই যমজ দুই ভাইকে একসঙ্গে দেখার চাইতে সুন্দর দৃশ্য আর কিছুই হতে পারে না। আকৃতিগত একটা দিক ছাড়া, দুজনেই সবদিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু দুজনের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের মধ্যে কোথায় যেন একটা রহস্যময় বন্ধন রয়ে গেছে।

দুজনে হাত ধরে গল্প করতে করতে বাগানের মধ্যে মন্থর পায়ে ঘুরে বেড়াতেন। আগাস্টিনের চোখ নীল, সোনালি চুল, আশ্চর্য উজ্জ্বল মসৃণ গায়ের রঙ, অনিন্দ্য-সুন্দর দেহ। আর অ্যালফ্রেডের চোখ কালো, গায়ের রঙ কিছুটা চাপা, পেটা লোহার মতো একেবারে টানটান পেশি। একজনকে দেখতে গ্রিক, অন্যজনকে ঠিক রোমানদের মতো। একজন অন্যজনকে প্রায় সারাক্ষণই তাঁর মতামত আর অভ্যাসের জন্যে অভিযুক্ত করছেন, বিতর্কের ঝড় তুলছেন, কিন্তু কেউ কারুর হাত ছেড়ে দিচ্ছেন না। যেন চুম্বকের দুপ্রান্তের এক আকর্ষণীয় শক্তি অলক্ষে দুজনের মধ্যেই সমানভাবে কাজ করে চলেছে।

অ্যালফ্রেডের বড় ছেলে হেনরিকের বয়েস ভালো, দেখতে আর স্বভাবে ঠিক বাপেরই মতো—দুরন্ত একটা ঘোড়ারই মতো অসম্ভব ছটফটে আর আশ্চর্য সজীব। আলাপের মুহূর্তেই চাচাতো বোন ইভানজেলিনকে তার খুব ভালো লেগে গেল।

সেদিন দুজনে একসঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাবার কথা। ইভার খুব প্রিয় ছোট একটা টাট্টু ছিল। টাট্টুটা একেবারে বরফের মতো ধবধবে সাদা আর স্বভাবটা ঠিক ওর ছোট্ট মনিবেরই মতো শান্ত, নম্র। ইভার জন্যে টম টাট্টুটাকে পেছনের বারান্দায় নিয়ে এল আর হেনরিকের ঘোড়াটাকে নিয়ে এল বছর তেরো বয়সের ডোডো নামে একজন মুলাটো চাকর। হেনরিকের আরবি ঘোড়াটা কুচকুচে কালো আর অসম্ভব তেজি। অল্প কিছুদিন আগে অজস্র অর্থ ব্যয় করে ঘোড়াটাকে বিদেশ থেকে আনানো হয়েছিল।

হেনরিক এগিয়ে এসে ডোডোর হাত থেকে ঘোড়ার লাগামটা নেয়ার সময় হঠাৎ নজর পড়ায় তার ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠল, তারপর ডোডোর দিকে তাকিয়ে রীতিমতো রুক্ষ মেজাজে ধমকে উঠল।

'এই কুঁকে কুকুর, এটা কী! আজ সকালে আমার ঘোড়াটাকে পরিষ্কার করিস নি কেন?'

ডোডো নম্র ভাবেই বলল, 'করেছিলাম, হুজুর। মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে ও আবার নিজেই ধুলো মেখেছে।'

'এই জানোয়ার, চুপ কর!' চাবুক উঁচিয়ে হেনরিক গর্জে উঠল।

'তোর এতটা সাহস যে আমার মুখের ওপর জবাব দিচ্ছিস?'

ডোডো দেখতে বেশ ভালোই, বড় বড় উজ্জ্বল দুটো চোখ, একমাথা উড়ানো কালো চুল। লম্বায় সে হেনরিকেরই সমান। চোখের দীপ্তি আর চিবুকে দ্রুত ঝলকে ওটা রঙের আভাস দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তার শরীরেও শ্বেতাঙ্গের রক্ত বইছে।

আপ্রাণ চেষ্টা করে ডোডো শুধু এটুকুই বলতে পারল, 'স্যার ...'

ডোডোর কথা শেষ হবার আগেই হেনরিক চাবুক দিয়ে তার মুখে শপাং শপাং করে আঘাত করল, তারপর একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে তাকে নতজানু হয়ে বসতে বাধ্য করাল এবং হাঁফিয়ে না ওঠা পর্যন্ত তাকে সমানে চাবকে গেল।

'নির্লজ্জ বেহায়া কুকুর! আশা করি এবার তুই শিখবি মনিবের মুখে মুখে কীভাবে জবাব না দিতে হয়। যা, ঘোড়াটা নিয়ে গিয়ে শিগগির পরিষ্কার করে নিয়ে আয়।'

নতমুখে ডোডো ঘোড়াটা নিয়ে চলে গেল।

টম বলল, 'হুজুর, আমার মনে হয় ও বলতে চেয়েছিল ঘোড়াটাকে যখন আস্তাবল থেকে নিয়ে আসছিল, তখনই ঘোড়াটা মাটিতে গড়াগড়ি দিয়েছে। গোড়াটা খুব তেজি, হুজুর। মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়ার ফলেই ঘোড়াটার গায়ে ধুলো লেগেছে। ডোডোকে আমি নিজের চোখে পরিষ্কার করতে দেখেছি, স্যার।'

'তুমি চুপ করো! তোমাকে যখন কিছু জিজ্ঞেস করব, তখনই শুধু কথা বলবে।' কথাটা বলে হেনরিক পায়ে পায়ে বারান্দার দিকে এগিয়ে গেল, যেখানে ইভা রানির মতো ঘোড়ায় চড়ার পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হেনরিক ইভার কাছে গিয়ে বলল, 'সত্যিই আমি খুব দুঃখিত, ইভানজেলিন। ওই নির্বোধটার জন্যেই মিছেমিছি তোমার এতটা দেরি হয়ে গেল। ঘোড়া নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত এসো বরং আমরা দুজনে ওই পাথরের ওপর বসি। কী ব্যাপার ইভানজেলিন, তোমাকে এত গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন?'

নতচোখে ইভা বলল, 'তুমি কেমন করে ডোডোর ওপর এতটা নিষ্ঠুর হতে পারলে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, হেনরিক?'

'নিষ্ঠুর! এ তুমি কী বলছ, ইভানজেলিন?' বিস্ময়ে হেনরিক যেন গাছ থেকে পড়ল। 'ডোডোকে তুমি চেনো না। এমন কুঁড়ে আর মিথ্যেবাদী যে ওভাবে সায়েস্তা না করলে ও মুখে মুখে সমানে তর্ক করে যাবে। আমার বাবাও ঠিক অমনিভাবে ওদেরকে সায়েস্তা করেন।'

'কিন্তু টম চাচা যে বলল ওর কোনো দোষ ছিল না। আমি জানি টম চাচা কখনো মিথ্যে বলে না।'

'তাহলে বলব ওই বড়ো নিগ্রোটা অসাধারণ। ডোডো কিন্তু চলতে ফিরতে মিথ্যে বলে।'

'ও কিন্তু কোনো অন্যায় করে নি।'

'সত্যিই ইভানজেলিন, ডোডোকে এত পছন্দ করো দেখে আমার নিজেরই হিংসে হচ্ছে।'

'না, হেনরিক ডোডোকে তুমি শুধু শুধু মারলে কেন?'

'ওটুকুতে ওর কিচ্ছু হয় না। দেখবে একটু পরেই ও সব ভুলে যাবে। ঠিক আছে, তুমি যখন চাও না, তোমার সামনে ওকে আর কখনো মারব না।'

এই সান্ত্বনাতে ইভা আদৌ খুশি হতে পারল না, অথচ এটাও ওর অজানা নয় যে অল্প কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে আসা হেনরিককে ওর মনোভাব বোঝাতে যাওয়া অর্থহীন।

একটু পরেই ডোডো আবার ঘোড়া নিয়ে ফিরে এলো।

'হ্যাঁ, এবার বেশ ভালো হয়েছে!' খুশি হবার ভঙ্গিতেই হেনরিক বলে উঠল। 'ঠিক আছে, তুমি বরং ইভানজেলিনের ঘোড়াটা ধর, আমি ওকে জিনের ওপর বসিয়ে দিচ্ছি।'

ডোডো এগিয়ে এসে ইভার টাট্টুর লাগামটা ধরল। তার বিবর্ণ মুখ, লালচে চোখ দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল এতক্ষণ সে কাঁদছিল। ইভা একটু ঝুঁকে তার হাত থেকে লাগামটা নেবার সময় মিষ্টি করে বলল, 'তুমি খুব ভালো ছেলে, ডোডো। অসংখ্য ধনবাদ!'

অবাক চোখে ডোডোর সুন্দর মুখখানার দিকে তাকাতেই তার চিবুকের পাশ দুটো রক্তিম হয়ে উঠল, অবরুদ্ধ আবেগে ছলছল করে উঠল দুচোখ।

নিজের ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠে হেনরিক একটা মুদ্রা ডোডোর দিকে ছুড়ে দিয়ে বললে, 'যা, এটা দিয়ে কিছু মিষ্টি কিনে খাস।'

মুদ্রাটা কুড়িয়ে নেওয়ার পরিবর্তে ডোডো তখনো নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রয়েছে সুন্দর মূর্তি দুটোর দিকে, যাদের একজন তাকে দিয়েছে মিষ্টি কিনে খাওয়ার জন্যে পয়সা আর অন্যজন দিয়েছে এমন অসামান্য কিছু, যা এই জীবনে কেউ কখনো তাকে দিতে পারে নি।

দূরের সমুদ্রে তখন দ্রুত রঙ বদলাতে শুরু করেছে। খোলা বারান্দায় হালকা বেতের চেয়ারে মুখোমুখি রয়েছে দাবার ছক। কিন্তু সে শুধু ওই পর্যন্তই, খেলার দিকে কারুর মন নেই। সারাক্ষণই দুজনে তর্ক করছেন একে অপরকে বিদ্রূপ করছেন, পরক্ষণেই আবার হো হো করে হেসে উঠছেন।

'সত্যি আগাস্টিন, আমি যদি তোমার ভাবনার সঙ্গে একমত হতে পারতাম, জীবনে হয়তো অনেক বড় কাজ করতে পারতাম।'

'নিশ্চয়ই!' ভাইকে সমর্থন করে সেন্ট ক্লেয়ার বলে উঠলেন। 'নিশ্চয়ই তুমি তো পারতে, অ্যালফ্রেড। আর যাই হোক, তুমি তো আর আমার মতো কুঁড়ে নও ... তুমি পরিশ্রমী, তুমি কাজ করতে পারো।'

'আমি ভাবছি ভবিষ্যতের জন্যে প্রথমেই যে কাজটা করা দরকার—তোমার নিগ্রো চাকর-বাকরগুলোর প্রত্যেকেরই এক-একটা প্রতিমূর্তি বানিয়ে রাখা, যাতে গবেষণার জন্যে ঐতিহাসিকরা তাদের নমুনা হিসেবে সংগ্রহ করতে পারেন।'

বিদ্রূপ-বেঁধানো স্বরে হাসতে হাসতেই আগাস্টিন বললেন, 'অবশ্য সেই ঐতিহাসিকদের মানবিক বোধ বলে কোনো পদার্থ যদি থাকে ...'

এমন সময় অদূরে শোনো গেল দ্রুত ছুটে আসা ঘোড়ার খুরের শব্দ।

'ওরা ফিরে আসছে। দেখো অ্যালফ্রেড, ওদের দুজনকে কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে!'

'সত্যি, এর চাইতে সুন্দর দৃশ্য কখনো দেখেছি বলে অন্তত আমার মনে পড়ছে না!' অ্যালফ্রেড অকপটেই স্বীকার করলেন। 'ইভার মতো এমন চোখ-ধাঁধানো রূপও আমি আর কখনো দেখি নি। এখন থেকেই আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি আগাস্টিন, বড় হলেও অনেক পুরুষেরই রাতের ঘুম কেড়ে নেবে।'

ভাইয়ের কথা শুনে সেন্ট ক্লেয়ার হো হো করে হেসে উঠলেন, কিন্তু সেই হাসির মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল একটা বিষণ্ণতার ছাপ। মেয়েকে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামিয়ে আনার জন্যে উনি দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন।

দুহাতে মেয়েকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে না তো, মামণি?'

'না, বাপী।'

মুখে না বললেও ওকে টেনে টেনে শ্বাস নিতে দেখে আগাস্টিন শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

'তোমার এত জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে আসাটা ঠিক হয় নি। তুমি জানো এটা তোমার শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর।'

'জানি। কিন্তু এত ভালো লাগছিল যে সে কথা আমার মনেই ছিল না।'

দুহাতের দোলায় মেয়েকে বয়ে এনে আগাস্টিন বৈঠকখানার সোফায় শুইয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'হেনরিক, ইভার শরীর খুব একটা ভালো নয়। ওর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে কখনো জোরে ঘোড়া ছুটিও না।'

'আচ্ছা। এবার থেকে আমি খুব সতর্ক থাকার চেষ্টা করব।' সোফায় ইভার পাশে বসে হেনরিক ওর একটা হাত নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিল।

একটু পরে ইভা অনেকটা সুস্থ বোধ করতে লাগল। কিশোর-কিশোরী দুজনকে একা রেখে সেন্ট ক্লেয়ার দুভাই অসমাপ্ত খেলাটাকে আবার নতুন করে শুরু করার জন্যে ফিরে গেলেন।

'আমার সবচেয়ে কী খারাপ লাগছে জানো, ইভানজেলিন', হেনরিক বলল, 'বাবা পরশুই এখান থেকে চলে যাচ্ছেন। তোমার সঙ্গে হয়তো আমার আর অনেকদিন দেখা হবে না, তবে আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, ডোডোর সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করব না। আমি সাধারণত কারুর সঙ্গে খুব একটা খারাপ ব্যবহার করি না। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় ত্রুটি, রেগে গেলে একদম জ্ঞান থাকে না।'

'তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব, হেনরিক?'

'বলো।'

'রাগ করবে না?'

'একটুও না।'

'আচ্ছা, ধরো, এ পৃথিবীতে তোমাকে যদি ভালোবাসার কেউ না থাকে, তোমার ভালো লাগবে?'

হেনরিক অবাক হয়ে ইভার দিকে তাকাল। 'কেন? নিশ্চয়ই না!'

'তাহলে অন্তত সেদিক থেকে ডোডোর কথাটা একবার ভেবে দেখো। বাবা-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সবাইকে ও চিরদিনের মতো হারিয়ে এসেছে। এখানে ওর এমন কেউ নেই যে ওকে ভালোবাসবে, কিংবা একটু ভালো ব্যবহার করবে।'

'এর জন্যে আমি সত্যিই খুব দুঃখিত, ইভানজেলিন। ওর মাকে কেনা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া ওকে আমি নিজে ভালোবাসতেও পারি না ...'

'কেন পারো না, হেনরিক?'

'ডোডোকে! এ তুমি কী বলছ, ইভানজেলিন? হয়তো ওকে আমি পছন্দ করতে পারি, কিন্তু তা বলে ভালোবাসা কেমন করে সম্ভব? তুমি কি তোমার চাকর-বাকরদের ভালোবাসতে পারো?'

'নিশ্চয়ই। কেন নয়, হেনরিক?'

'এটা কিন্তু সত্যিই ভাবা যায় না।'

'কেন ভাবা যায় না, হেনরিক? বাইবেলে কি বলা হয় নি, প্রতিটা মানুষকে আমাদের ভালোবাসা উচিত?'

'বাইবেলে ওরকম অনেক ভালো ভালো কথাই বলা আছে, কিন্তু কেউ সেসব কথা ভাবে না, বা করেও না।'

সেই মুহূর্তে ইভা কোনো কথা বলল না, নির্নিমেষ চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে কী যেন ভাবল। তারপর ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'অন্তত আমার মুখ চেয়ে তুমি ডোডোকে একটু ভালোবেসো, হেনরিক। কখনো ওর ওপর নিষ্ঠুর হয়ো না!'

'তোমার জন্যে আমি সবকিছু করতে পারি, ইভানজেলিন। তোমার চেয়ে সুন্দর আর রূপসী মেয়ে আমি আর কখনো দেখি নি। কথাটা বলতে গিয়ে কিশোর হেনরিকের সুন্দর মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল।

হেনরিকের এই সরল আন্তরিকতা ইভাকেও স্পর্শ না করে পারল না, তাই খুশির সুরেই বলল, 'তাহলে আশা করি, আমার কথাটা তোমার নিশ্চয়ই মনে থাকবে হেনরিক!'

এমন সময় খাবার ঘণ্টা পড়ায় ওদেরকে উঠে পড়তে হলো।

বিশ

ছোট্ট ইভা

এই ঘটনার দুদিন পর অ্যালফ্রেড ক্লেয়ার তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। প্রাণচঞ্চল কিশোর হেনরিকের নিরলস সাহচার্যে উৎসাহিত হয়ে ইভা এই ক'দিনে তার শক্তির যা কিছু সঞ্চয় একেবারে নিঃশেষ করে ফেলেছে। সেই জন্যে হেনরিক চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ইভা ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। ফলে সেন্ট ক্লেয়ারকে বাধ্য হয়ে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হলো। এই ব্যাপারটাকে উনি এতদিন সযত্নে এড়িয়েই চলতে চেয়ে ছিলেন, কেননা ডাক্তার ডাকা মানেই অবাঞ্ছিত সত্যটাকে স্বীকার করে নেওয়া।

দুএকদিনের মধ্যে ইভা এমন অসুস্থ হয়ে পড়ল যে আর ঘর থেকেই বের হতে পারল না। ডাক্তার এসে দেখে গেলেন।

দিন দিন মেয়েটার স্বাস্থ্য যে ক্রমশ ভেঙে যাচ্ছে, মেরি সেন্ট ক্লেয়ার কোনোদিন সেদিকে ফিরেও তাকায় নি। অবশ্য মেরির সে অবকাশ ছিল না। সম্প্রতি দু-তিনটে নতুন উপসর্গ এসে জোটায় ও খুবই মুষড়ে পড়েছে। ওর ধারণা ওর মতো এরকম অসুস্থ এর আগে কেউ কখনো হয় নি এবং কোনোদিন হবেও না। সুতরাং ওর আশেপাশের কেউ কখনো অসুস্থ হলে মেরি সেটাকে আমলই দিত না।

মিস ওফেলিয়া বেশ কয়েকবার ইভা সম্পর্কে মেরিকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনো ফল হয় নি।

কখনো কখনো কিছুটা বিরক্তির সঙ্গেই মেরি বলত, 'মেয়েটা তো দিব্যি হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে। ওর আবার অসুখ কিসের?'

'আমি ওর কাশিটার কথাই ভাবছি।'

'কাশি! কাশির কথা আমাকে আর বলবেন না। ইভার মতো বয়সে আমারও কাশি হয়েছিল। সবাই বলত আমার নাকি যক্ষ্মা হয়েছে। আমার মাতো রাতের পর রাত জেগে আমার পাশে বসে থাকতেন সেই তুলনায় ইভার কাশি তো কিছুই নয়।'

'আমারও ঠিক ওইরকম হয়েছিল। ওটা স্নায়ুবিক দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'রাত্তিরে ঘাম হয়।'

'আমারও এই দশ বছর ধরে রাত্তিরে ঘাম হচ্ছে। এক-একদিন রাতের পোশাক ভিজে একদম সপ্ সপ্ করে। ইভা তো সেই তুলনায় ঘামে না বললেই চলে।'

মিস ওফেলিয়া আর একটা কথাও বলেন নি। কিন্তু ইভা শয্যাশায়ী হয়ে পড়তেই মেরি হঠাৎ কেমন যেন বদলে গেল! এখন ও বলতে লাগল, এমনটা যে ঘটবে ও আগে থেকেই জানত। মায়ের এমনি পোড়া কপাল যে নিজে যখন অসুস্থ, ওর একমাত্র সন্তান তখন চোখের সামনে মরতে বসেছে!

'ছিঃ, মেরি, এভাবে বলা উচিত নয়!' সেন্ট ক্লেয়ার বললেন। 'তাছাড়া এত সহজেই বা হাল ছেড়ে দিচ্ছ কেন?'

'মার মনের মধ্যে যে কী হয়, সে তুমি কোনোদিনও বুঝতে পারবে না, আগাস্টিন।'

'তবু তোমার এভাবে বলা উচিত নয়, মেরি।'

'তুমি ব্যাপারটাকে যত সহজে এড়িয়ে যেতে পার, আমি মা হয়ে তা কখনো পারি না আগাস্টিন।'

'কিন্তু ডাক্তার তো বলছেন, এখনই এত ভয়ের কোনো কারণ নেই।'

'ডাক্তারদের আমি আদৌ বিশ্বাস করি না।'

এরপর তর্ক করা অর্থহীন ভেবে সেন্ট ক্লোয়ার নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দু-এক সপ্তাহর মধ্যে ইভার শারীরিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটল, এমন কী ও হেঁটে চলেও বেড়াতে লাগল। বাগান থেকে আবার ভেসে আসতে লাগল ওর মিষ্টি হাসি। সবাই খুশি হলো, শুধু আশ্বস্ত হতে পারলেন না ডাক্তার আর মিস ওফেলিয়া। ওঁরা বুঝতে পারলেন প্রদীপ নেভার আগে যেমন শেষবারের মতো জ্বলে ওঠে, কালব্যাধিগ্রস্থ মানুষও কখনো কখনো মৃত্যুর আগে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের মতো আনন্দে হেঁটে-চলে ঘুরে বেড়ায়।

যা কিছু প্রাচুর্য আর জীবনের উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও ইভাও যে মৃত্যুর খুব কাছাকাছি, সম্ভবত সেটা ওর অজানা ছিল না। তবু ওর মনে নিজের জন্যে এতটুকুও দুঃখ বা অনুতাপ ছিল না। বাইরে থেকে ওকে দেখে মনে হতো সূর্যাস্তের রঙিন আলোরই মতো শান্ত, শরতের নিটোল নিস্তব্ধতারই মতো উজ্জ্বল। ওর শুধু একটাই মাত্র দুঃখ, এ পৃথিবীতে যারা ওর সবচাইতে প্রিয়, বিশেষ করে বাবা, মা আর সেই সব ক্রীতদাস-দাসী, একদিন যারা ওর জীবনে আনন্দ দান করেছিল, আজ তাদের ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে।

ইভা শিশু হলেও, মনের দিক থেকে ও আশ্চর্য পরিণত। প্রতিটা দাসদাসীকে ও সূর্যের আলোর মতোই ভালোবাসত। শুধু যে ওদেরকেই ভালোবাসত তা নয়, ভালোবাসত ওদের নিপীড়িত জীবনের দৈন্যতা আর কদর্যতাকেও। ওদের জন্যে কিছু একটা করার, অন্তত ওদের জীবনে একটু আলো আর আনন্দ আনার জন্যে ইভা তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করত।

একদিন টমকে বাইবেল পড়ে শোনাতে শোনাতে ইভা হঠাৎ বলল, 'যিশু কেন আমাদের জন্যে মৃত্যুবরণ করতে চেয়েছিলেন, এখন আমি বুঝতে পারছি, টম চাচা।'

'কেন, মিস ইভা?'

'আমি তোমাকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না, তবে আমি যেন তা স্পষ্ট অনুভব করতে পারছি। সেদিন স্টিমারে করে আসার সময়, তোমার সঙ্গে যে হতভাগ্য দলটাকে দেখেছিলাম, যাদের মধ্যে কেউ হারিয়েছে তার মাকে, কেউ তার স্বামীকে, কোনো মা আবার তার সন্তানকে হারিয়ে কাঁদছে ... আর যারা নির্যাতনের ফলে মারা গেছে, উঃ, কী ভয়ঙ্কর! আমার জীবন দিলে যদি এদের দুঃখ শেষ হয়, আমি আনন্দের সঙ্গেই সে মৃত্যুকে বরণ করে নেব।'

কথাটা বলে ইভা ক্লান্তিভরে ওর শীর্ণ হাতখানা রাখল টমের হাতের ওপর। টম শঙ্কাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ইভার মুখের দিকে। বাবার ডাকে ইভা চলে যাবার পর টমের দুচোখ ছাপিয়ে নেমে এল অশ্রুধারা।

'ওকে আর এ পৃথিবীতে কেউ ধরে রাখতে পারবে না।' চোখ মুছতে মুছতে টম নিজের মনেই ভাবল। 'আমি ওর কপালে দেখতে পাচ্ছি ঈশ্বরের স্নেহ-চিহ্ন!

ইভা বাবার হাত ধরে বারান্দায় সিঁড়িতে এসে দাঁড়াল। মেয়ের জন্যে কিনে আনা সুন্দর পাথরের মূর্তিটাকে দেখাবেন বলেই সেন্ট ক্লেয়ার ইভাকে ডেকে এনেছিলেন। তখন বিদায় গোধূলিবেলা। অদ্ভুত একটা রাঙা আলো এসে পড়েছে ওর সর্বাঙ্গে। ধবধবে সাদা পোশাক, ছোট্ট মাথাটা ঘিরে একরাশ সোনালি চুল, প্রদীপ্ত চিবুক, চোখ দুটো আশ্চর্য উজ্জ্বল, সব মিলিয়ে ইভাকে মনে হচ্ছে অনেক দূরের ঐশ্বরিক একটা জ্যোতির মতো। ইভার চোখ-ধাঁধানো সেই দীপ্তি এমনই দুর্লভ অথচ ভঙ্গুর যে হাহাকার করে উঠল। হঠাৎ উনি এমনভাবে ইভাকে দুহাতে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরলেন যে, যে-কথাটা বলবেন বলে ডেকে এনে ছিলেন, সেটাই বলতে ভুলে গেলেন।

'ইভা, মা আমার, আজকাল তুমি একটু ভালো আছ, তাই না?'

'বাপিসোনা', কোমল অথচ জড়তাবিহীন স্বরেই ইভা বলল, 'অনেকদিন ধরেই কয়েকটা কথা তোমাকে বলব বলব করেও বলতে পারি নি। আমি আরো দুর্বল হয়ে পড়ার আগে সেই কথাগুলো তোমাকে বলতে চাই।'

'কী কথা, মামণি?'

'তেমন একটা দরকারি কিছু নয়, বাবা। তোমাকে ছেড়ে আমার চলে যাবার সময় হয়ে এসেছে। আমি চলে যাব, আর কোনোদিনও ফিরে আসব না ...'

'না না, ও কথা বলো না, মা। কেঁপে উঠল সেন্ট ক্লেয়ারের কণ্ঠস্বর। মেয়েকে উনি আরো নিবিড় করে বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন। 'তুমি দুর্বল হয়ে পড়েছে, তাই ওরকম মনে হচ্ছে। ওসব আজে-বাজে চিন্তা একদম মনেও এনো না। দেখো, তোমার জন্যে কেমন সুন্দর একটা পাথরের মূর্তি কিনে এনেছি।'

'না, বাপী; ওসব এখন আমার আর চাই না। আমি ভালো করেই জানি, আমি খুব শিগগিরই চলে যাচ্ছি। আমার মন দুর্বল নয়, আমার একটুও ভয় করছে না। শুধু তোমাকে আর আমার বন্ধুদের ছেড়ে যেতে না হলেই আমি সবচেয়ে সুখী হতাম। নইলে আমি চলে যেতেই চাই, বাপী।'

'কেন, মামণি, তোমার এত দুঃখ কিসের? সুখী হওয়ার তো তোমার কোথাও কোনো অভাব নেই।'

'না বাপী, আমি কেবল আমার বন্ধুদের জন্যেই বেঁচে থাকতে পারতাম। কিন্তু এখানে এমন জিনিস আছে, যা দেখে আমার খুব ব্যথা লাগে, বড় ভয়ঙ্কর মনে হয়। আমার বরং চলে যাওয়াই ভালো। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কিছুতেই ইচ্ছে করছে না, সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছে, বাবা।'

'কিসে তোমার ব্যথা লাগে, কী তোমার ভয়ঙ্কর মনে হয়?'

'আমাদের এই হতভাগ্য ক্রীতদাস-দাসীদের জন্যে আমার খুব ব্যথা লাগে। ওরা সবাই আমাকে খুব ভালোবাসে, আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে। আমার ইচ্ছে ওরা সবাই দাসত্ব থেকে মুক্তি পাক।'

'কেন, ইভা মা, তোমার কি মনে হয়, ওরা সবাই আমাদের এখানে বেশ ভালো নেই?'

'হ্যাঁ, বাপী, আছে। কিন্তু ধরো, হঠাৎ যদি তোমার কিছু হয়, তখন ওদের কী দশা হবে? সবাই তো আর তোমার মতো ভালো নয়। অ্যালফ্রেড চাচা, হেনরিক, এমন কী মামণিও তোমার মতো নয় ...'

'তোমার মনটা অসম্ভব নরম, ইভা, তাই তোমার অমন মনে হয়।'

'না, বাপী, তুমি আমাকে কখনো কষ্ট দাও নি। কিন্তু আমি জানি, ওদের জীবনে দুঃখ, কষ্ট, হতাশা ছাড়া আর কিছু নেই। ওদের কথাই আমি বেশি করে ভাবি, ওদের দুঃখই আমাকে কষ্ট দেয়। আমার সব সময়েই মনে হয় এ অন্যায়, এ ভয়ঙ্কর অন্যায়। এমনটা হওয়া কখনই উচিত নয়। আচ্ছা বাবা, যত ক্রীতদাস-দাসী আছে, সবাইকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করার কি কোনো পথ নেই?'

স্তব্ধ বিস্ময়ে মুখের দিকে তাকিয়ে সেন্ট ক্লেয়ার যেন মুহূর্তের জন্যে বোবা হয়ে গেলেন।

'এটা খুবই কঠিন প্রশ্ন, মামণি। আমি জানি আমাদের দেশের এই রীতিটা খুব খারাপ। আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি যে আমাদের দেশে যেন কোনো ক্রীতদাস না থাকে। কিন্তু সেটা কীভাবে সম্ভব, তা আমি নিজেই জানি না।'

'তুমি সত্যিই খুব ভালো, বাবা। আর সবকিছু এমন সুন্দর করে বলো, আমার শুনতে খুব ইচ্ছে করে। আচ্ছা বাপী, যার সঙ্গে তোমার দেখা হবে, তাদেরকে তুমি বলতে পার না, এটা অন্যায়, এটা করা উচিত নয়? আমি যখন এ পৃথিবীতে থাকব না, তখন তুমি নিশ্চয়ই আমার কথা ভাববে আর আমার জন্য কষ্ট করেও এই কাজটা করার চেষ্টা করবে।'

'না না, ইভা না ... আর কখনো এভাবে বলো না মা।' বেদনার্ত স্বরে সেন্ট ক্লেয়ার বলে উঠলেন। 'তুমি যখন এ পৃথিবীতে থাকবে না, তখন আমারও নিজের বলতে আর কিছু থাকবে না। এ পৃথিবীতে তুমিই আমার সব।'

'ক্রীতদাস-দাসীরাও তাদের সন্তানদের ভালোবাসে, বাপী। টম চাচা তার সন্তানদের তোমারই মতো ভালোবাসত। একসময়ে মামিরও দুটো ছেলেমেয়ে ছিল, যাদের জন্যে আজো সে লুকিয়ে লুকিয়ে চোখের জল ফেলে। কিন্তু তারা সব আজ কোথায় গেল? তাদের কি ওর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় নি? আমি শুধু তোমার কাছে ছোট্ট একটা অনুরোধ করব, বাপী। তুমি আমাকে কথা দাও, আমি যখন এ পৃথিবীতে থাকব না, টম চাচাকে তুমি মুক্তি দেবে।'

'নিশ্চয়ই। তুমি যা বলবে, আমি তাই করব?'

'আঃ বাপী।' নিজের উত্তপ্ত চিবুকটা বাবার চিবুকের ওপর রেখে ইভা অস্ফুটে বলল, 'আমরা দুজনেই যদি একসঙ্গে চলে যেতে পারতাম!'

'কোথায় মামণি?'

'আমাদের পরিত্রাতা যেখানে বাস করেন, সেখানে চিরটাকাল প্রেম আর শান্তি বিরাজ করে।' অনেকটা স্তব্ধস্বরে ইভা এমনভাবে কথাগুলো বলে চলল, যেন জায়গাটা অত্যন্ত চেনা। 'তুমি সেখানে যেতে চাও না, বাপী?'

কোনো জবাব না দিয়ে সেন্ট ক্লেয়ার মেয়েকে বুকের আরো কাছে টেনে নিলেন।

ইভা শান্তস্বরে, যেন নিজের অজ্ঞাতেই বলল, 'আমি জানি তুমি আমার কাছে যাবেই, বাপী।'

'আমি যাব তোমার ঠিক পরেই, মামণি। তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।'

ওদের দুজনকে ঘিরে সন্ধ্যার ছায়াগুলো গাঢ় থেকে আরো গাঢ়তর হয়ে উঠল। সেন্ট ক্লেয়ার ইভার নিষ্পাপ, ভঙ্গুর দেহটাকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে নীরবে বসে রইলেন। এখন উনি উজ্জ্বল, গভীর চোখ দুটোকে দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছেন অতলস্পর্শী স্বর্গীয় একটা কণ্ঠস্বর। শুনতে শুনতে হঠাৎ তাঁর মার কথা মনে পড়ে গেল, মনে পড়ে গেল নিজের শৈশবের দিনগুলোর কথা। ভাবতে ভাবতে হঠাৎই একসময়ে তাঁর মনে হলো, এই মুহূর্তে তিনি যেন অনেককিছু দেখতে পাচ্ছেন, অনুভবও করতে পারছেন। কিন্তু কিছু বলতে পারছেন না। বেশ কিছুক্ষণ পর অন্ধকার যখন আরো গাঢ় হয়ে উঠল, বিশ্রামের জন্যে মেয়েকে তিনি শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন, নিজের হাতে শয্যায় শুইয়ে দিলেন, তারপর ইভা ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত চুপচাপ ওর পাশে বসে রইলেন।

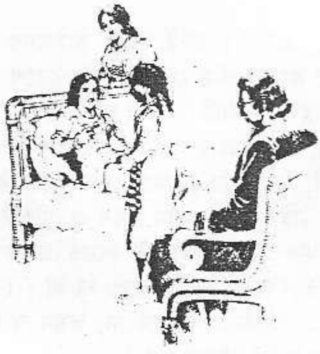

একুশ

মৃত্যু

বাংলো বাড়ির অন্যান্য ঘরগুলোর মতো ইভার ঘরটাও বেশ খোলামেলা আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। ইভার ঘরের সঙ্গে সুসংলগ্ন দুপাশের ঘর দুটোর একটা বাবার, অন্যটা মার।

একদিকে চওড়া বারান্দা, উল্টো দিকের ঘরটা মিস ওফেলিয়ার। ইভার চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই সেন্ট ক্লেয়ার রুচিসম্মতভাবে ঘরটাকে সাজিয়েছেন। জানলায় গোলাপি আর সাদা মসলিনের পর্দা, মেঝেতে পাতা রয়েছে পারি থেকে আনানো গালিচা, যার চারপাশে নকশাতোলা গোলাপ-কুঁড়ি আর পাতার মাঝখানে বেশ বড় একটা প্রস্ফুটিত গোলাপ। খাট, চেয়ার, টেবিল, সোফা থেকে শুরু করে সবকিছুই সুন্দর কারুকার্য করা বেত-বাঁশের তৈরি। বিছানার সামনে দেবদূতের সুন্দর একটা প্রতিমূর্তি। দেবদূতের ডানা দুটো প্রায় গুটিয়ে নেওয়ার ভঙ্গিতে অনেকটা ঝুলে পড়েছে, হাতে ধরা রয়েছে চিরহরিৎ লতাগুল্মের মুকুট। বিছানার এপাশে নিচু টেবিলটার ওপর রয়েছে সুন্দর ঢাকনা-দেওয়া একটা বাতিদান, সাদা একটা পদ্মের আকারে তৈরি দুর্লভ কারুকার্য করা ফুলদানি যেটাকে টম নিজের হাতে রোজ নানা ধরনের ফুল দিয়ে সাজিয়ে রেখে যায়। বাতিদানের নিচে রয়েছে ইভার অত্যন্ত প্রিয় বাইবেল। সব মিলিয়ে ইভার ঘরটা শুচীস্নিগ্ধ একটা ছবির মতোই শান্ত, নিস্তব্ধ। দিন দিন ইভার শক্তি ক্রমশই নিঃশেষ হয়ে আসছে। ফলে আজকাল বারান্দায় ওর পদশব্দ প্রায় শোনা যায় না বললেই চলে। শুধু মাঝে মাঝে দেখা যায় খোলা জানলা দিয়ে ও নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রয়েছে দূরের সমুদ্রের দিকে।

তখন মধ্যদিন। বিছানায় আধ শোয়া অবস্থায় ইভা বাইবেলের পাতা উল্টে চলেছে, হঠাৎ বারান্দায় মার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।

'ফের শয়তানি শুরু করেছিস? তোকে না কতদিন ফুল তুলতে নিষেধ করেছি!' পরক্ষণেই শোনা গেল ঠাস করে একটা চড়ের শব্দ।

'সত্যি বলছি, মিসিস ফুলগুলো আমি মিস ইভার জন্যে তুলে ছিলাম।' করুণ একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। কণ্ঠস্বরটা যে টপসির সেটা বুঝতে ইভার কোনো অসুবিধে হলো না।

'আহাঃ মিস ইভার জন্যে তুলে ছিলাম!' বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মেরির কণ্ঠস্বর। 'তাহলে তো সাতখুন মাপ! ও কি চেয়েছিল তোর ফুল, যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে, নোংরা পেত্নী কোথাকার!'

ইভা সেই সময় বিছানা থেকে উঠে বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

'না মা, ওকে তুমি বকো না। ওর ফুলগুলো সত্যিই খুব সুন্দর! ওগুলো আমাকে দাও।'

'কেন ইভা, তোমার ফুলদানি তো একদম ভর্তি হয়ে রয়েছে?'

'আরো বেশি হলেই বা ক্ষতি কী, মামণি? ফুল তো আমার খুব ভালো লাগে। টপসি, ওগুলো আমাকে দাও।'

টপসি এতক্ষণ নতমুখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল, ইভার কথায় যেন সম্বিৎ ফের পেয়ে অত্যন্ত দ্বিধার সঙ্গেই সে ফুলগুলো এগিয়ে দিল।

ইভা তোড়াটার দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'বাঃ, খুব সুন্দর হয়েছে!'

তোড়া বলতে অবশ্য উজ্জ্বল গাঢ় লাল রঙের একটা জিরেনিয়াম আর পাতাসহ ধবধবে সাদা একটা জাপোনিকা। কিন্তু বিপরীতধর্মী দুটো রঙের সহাবস্থান সত্যিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ইভার প্রশংসায় টপসির চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

www.alorpathsala.org

'তোমার সাজানোটাই আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে!' ইভা বলল। 'এবার থেকে রোজ ফুল তুলে তুমি আমার ঘরে নিজে সাজিয়ে দিয়ে যাবে।'

মেরি টপসিকে বলল, 'তোর মনিবানি কী বলল মন দিয়ে শুনেছিস?'

টপসি মাথা হেলিয়ে নীরবে সায় দিল। নতমুখে ফিরে যাবার সময় ইভা স্পষ্টই দেখতে পেল ওর মসৃণ, কালো চিবুক বেয়ে গড়িয়ে এসেছে দুফোঁটা অশ্রু।

টপসি চলে যাবার পর মেরি বলল, 'এসবের কিন্তু সত্যিই কোনো দরকার ছিল না, ইভা।'

'আসলে কি জানো মা, টপসির ইচ্ছে, এ বেচারিও আমার জন্যে কিছু একটা করে।'

'ওটা ওর একটা শয়তানি করার ছুতো। ও জানে আমি ফুল তুলতে বারণ করেছি, তাই যেকোনো ছুতোয় ফুল তুলতেই হবে। অবশ্য তোমার যখন ইচ্ছে ও ফুল তুলুক, আমি আর বাধা দিতে চাই না।'

'এটা ঠিক, টপসি আর পাঁচ জনের মতো নয় মা। তবে ও কিন্তু আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়ে গেছে।'

মেরি হাসতে হাসতে বলল, 'ওরা কোনোদিনই ভালো হয় না। ওদের জাতটাই আলাদা।'

'কিন্তু মামণি, ঈশ্বর তো আমাদের সবারই পিতা?'

'হ্যাঁ, ঈশ্বর আমাদের সবাইকে তৈরি করেছেন, কিন্তু তবু ... আমার নির্যাসের শিশিটা কোথায়?'

'আর একটা কথা মামণি', গলার স্বর নামিয়ে নিয়ে ইভা মিষ্টি করেই বলল। 'আমি আমার কিছু চুল কেটে ফেলতে চাই।'

মেরি অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকাল। 'কেন?'

'শক্তি ফুরিয়ে আসার আগে কিছু চুল কেটে আমি নিজের হাতে আমার বন্ধুদের দিয়ে যেতে চাই। তুমি ওফেলিয়া ফুপুকে বলো না আমার চুলগুলো একটু কেটে দিয়ে যাবে।

আপত্তি করে কোনো লাভ হবে না জেনেই মেরি ওফেলিয়াকে ডাকতে গেল। ইভা আবার ফিরে এল ওর শয্যায়! ওফেলিয়াকে ঘরে ঢুকতে দেখেছি ইভা বালিশ থেকে মাথা তুলে দীর্ঘ কোঁকড়ানো সোনালি চুলগুলো এলিয়ে দিয়ে দুষ্টুমির সুরে হাসতে হাসতে বলল, 'এসো, এসো ওফেলিয়া ফুপু, চুলগুলো একটু কেটে দাও তো দেখি।'

মিস ওফেলিয়া কাঁচি নিয়ে আবার ফিরে এলেন।

ঠিক সেই সময় সেন্ট ক্লেয়ারও মেয়ের জন্যে কিছু ফল নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। 'কী ব্যাপার, এটা আবার কী হচ্ছে?'

'আমি ফুপুকে কিছু চুল কেটে দেওয়ার কথা বলেছি, বাপি। এত বড় বড় হয়ে গেছে যে ভীষণ অস্বস্তি লাগে, তাছাড়া কিছু চুল আমি নিজ হাতে আমার বন্ধুদের দিয়ে যেতে চাই।'

'কিন্তু ওফেলিয়া, লক্ষ্মীটি, খুব সাবধানে, একদম ভেতরে থেকে, যাতে বাইরে থেকে কিছু বোঝা না যায়।' সেন্ট ক্লেয়ার বললেন। 'তুমি হয়তো ঠিক জানো না ওফেলিয়া, ইভার এই নরম সোনালি চুলগুলো আমার একটা গর্বের বস্তু। তাছাড়া আমি মনে মনে ঠিক

করেছিলাম খুব শিগগিরই ইভাকে অ্যালফ্রেডদের ওখানে বেড়াতে নিয়ে যাব। চুল কেটে ফেলার জন্যে হেনরিকের কাছে ইভাকে তখন খারাপ দেখাক, সেটা আমি কিছুতেই চাই না।'

কথাটা বলে সেন্ট ক্লেয়ার দুষ্টুমির ভঙ্গিতে মুচকি মুচকি হাসলেন।

'আমি তার ওখানে কোনোদিনও যাব না, বাপী। আমি ওর চাইতে অনেক অনেক একটা ভালো দেশে যাচ্ছি।' ম্লানস্বরে ইভা বলল। 'দেখতে পাচ্ছ না, দিন দিন কী ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ছি?'

'না না, ইভা! কেন এই নিষ্ঠুর জিনিসটাকে তুমি বারবার আমাকে বিশ্বাস করতে বলো।'

মিষ্টি করে ইভা বলল, 'এটা তো সত্যি, বাপী।'

কোনো কথা না বলে সেন্ট ক্লেয়ার ইভার কেটে ফেলা গুচ্ছগুচ্ছ সোনালি চুলগুলোর দিকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রইলেন।

ইভার ইচ্ছানুসারে ওফেলিয়া প্রতিটা চাকর-বাকরদের ইভার ঘরে আসার নির্দেশ দিলেন। একে একে দাস-দাসীরা সবাই ভিড় করে দাঁড়াল ইভার ঘরের একপাশে। শীর্ণ হাতে ভর রেখে ইভা বালিশের ওপর একটু উঠে বসল। প্রদীপ্ত চিবুক, বড় বড় উজ্জ্বল দুটো চোখ মেলে ইভা খানিকক্ষণ গভীর আগ্রহে তাকিয়ে রইল ওদের মুখের দিকে। আবেগের আকস্মিকতায় ওরা তখন একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে। স্বর্গীয় সুষমামাখা মুখে ইভা ওদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, সুন্দর সোনালি চুলের গুচ্ছগুলো পড়ে রয়েছে ওর পাশে। বাবা উদাস চোখে তাকিয়ে রয়েছেন, মা রুমালে মুখ ঢেকে কাঁদছে। সারা ঘরে বিরাজ করছে কবরের একটা নিটোল নিস্তব্ধতা। দাসদাসীরা একে অপরের মুখের দিকে তাকাচ্ছে, কেউ নিজের মনেই মাথা নাড়ছে, কেউ দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে, কেউ আবার নীরবে কাঁদছে।

'তোমাদের ডেকে পাঠিয়েছি, যেহেতু তোমাদের সবাইকেই আমি ভালোবাসি।' ম্লানস্বরে ইভা বলে চলল। 'আজ তোমাদের কয়েকটা কথা বলতে চাই, আশা করি তোমরা সেটা কোনোদিন ভুলবে না। আর কয়েকদিনের মধ্যেই আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছি ... তোমরা আর কোনোদিনও আমায় দেখতে পাবে না।'

হঠাৎ ফুঁপিয়ে ওঠা কান্না আর বিলাপের শব্দের ইভার কোনো কথাই শোনা গেল না। একটু অপেক্ষা করার পর ও আবার ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, 'তোমরা যদি আমাকে সত্যিই ভালোবেসে থাক, তাহলে আমার কথাটা নিশ্চয়ই মনে রাখবে। যে পৃথিবীতে বাস করছ, তোমরা শুধু তার কথাই ভাব। কিন্তু ঈশ্বর যেখানে বাস করেন, সেটা ওর চাইতেও সুন্দর। আমি সেখানে যাচ্ছি, তোমরাও একদিন যাবে। কিন্তু সেখানে যেতে গেলে অলস, উদাসীন হলে চলবে না। এর জন্যে লেখাপড়া শিখতে হবে, তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে। ইচ্ছে করলে তোমরাও এক-একজন দেবদূত হতে পারো। তোমরা প্রত্যেকে যদি লেখাপড়া শিখতে নাও পার, প্রতিদিন তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে, তাঁকে বলবে সাহায্য করতে। উনি নিশ্চয়ই তোমাদের সাহায্য করবেন আর সময় পেলেই বাইবেল পড়বে, কেননা আমি তোমাদের সবাইকেই স্বর্গে দেখতে চাই।'

টম আর মামি ছাড়া, যারা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারল না, তারা সবাই কেঁদে উঠল। ইভা বলল, 'আমি জানি, তোমরা সবাই আমাকে ভালোবাস।'

সবাই প্রায় একইসঙ্গে বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

'তোমরা প্রত্যেকেই আমার প্রতি সদয় ছিলে। তাই তোমাদেরকে আমি কিছু দিয়ে যেতে চাই, যা দেখলে তোমাদের আমার কথা মনে পড়বে। আমি তোমাদের সবাইকে আমার মাথার চুল দেব, যা দেখলে তোমাদের মনে পড়বে, আমি একদিন তোমাদের ভালোবাসতাম এবং তোমাদের সবাইকেই স্বর্গে দেখতে চেয়েছিলাম।'

এর পরের দৃশ্য এমনই মর্মস্পর্শী যে ভাষায় প্রকাশ করা সত্যিই খুব কঠিন। চোখের জলে সবাই তখন ছোট্ট ইভাকে ঘিরে ধরেছে, বেদনায় রুদ্ধ হয়ে এসেছে তাদের কণ্ঠস্বর। হাত বাড়িয়ে ওরা গ্রহণ করছে ইভার ভালোবাসার শেষ দান। কেউ দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদছে, কেউ হাঁটু মুড়ে বসে প্রার্থনা করছে, কেউবা নিচু হয়ে ঝুঁকে চুমু দিচ্ছে ইভার পোশাকের প্রান্তে।

একসময় মিস ওফেলিয়া ইঙ্গিতে টম আর মামি ছাড়া আর সবাইকে চলে যেতে বললেন।

'এই যে টম চাচা, তোমার জন্যে একটা গুচ্ছ রেখেছি, নাও। মিষ্টি হেসে ইভা বলল। 'সত্যি, তোমাকে স্বর্গে দেখতে পাব বলে যে আমার কী আনন্দ হচ্ছে! আমি জানি, নিশ্চয়ই ওখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে। আর মামি ... আমার ছোট্ট, সুন্দর মামি ...' নরম হাত দুটো দিয়ে ইভা দীর্ঘ দিনের পুরনো ধাত্রীর গলাটা জড়িয়ে ধরল। 'আমি জানি, সেখানে তোমার সঙ্গেও আমার দেখা হবে।'

'ওঃ, মিস ইভা, তুমি চলে গেলে কী নিয়ে বাঁচব আমি নিজেই জানি না!' মামি আর কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারল না, কথাটা বলেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। 'বিশ্বাস করো, তুমি চলে গেলে সব অন্ধকার মনে হবে।'

মিস ওফেলিয়া টম আর মামিকে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বার করে দিলেন, কিন্তু দরজাটা ভেজিয়ে দিতে গিয়েই দেখলেন টপসি এককোণে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'কী ব্যাপার, তোর আবার কী চাই?'

ওফেলিয়ার সে প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে টপসি চোখ মুছতে মুছতে ইভার দিকে এগিয়ে গেল, তারপর করুণস্বরে বলল 'আমি খারাপ বলে তুমি বুঝি আমাকে কিছু দেবে না?'

'কে বললো তুমি খারাপ, টপসি?' ইভা ওর হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। আমি জানি তুমি খুব ভালো মেয়ে, এবং আরো ভালো হবে। তুমি এই চুলের গুচ্ছটা রেখে দাও। যখনই এটার দিকে তাকাবে, মনে পড়বে, আমি তোমাকে ভালোবাসতাম, আমি চাই তুমি আরো ভালো মেয়ে হও।'

সজল চোখে টপসি বলল, 'আমি জানি, মিস ইভা, আমি খুব খারাপ, আমি কোনোদিনও আর ভালো হব না।'

'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, উনি নিশ্চয়ই তোমাকে সাহায্য করবেন।'

চুলের গুচ্ছটাকে বুকের মধ্যে গুঁজে রেখে টপসি মন্থর পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সবাই চলে যাবার পর ওফেলিয়া দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। ইতোমধ্যে ওফেলিয়াকেও বেশ কয়েকবার গোপনে চোখের জল মুছতে হয়েছে। তবে অন্য সকলের তুলনায় ওঁর মন অনেক বেশি শক্ত।

চোখে হাত চাপা দিয়ে সেন্ট ক্লেয়ার একই ভঙ্গিতে সারাক্ষণ চুপচাপ বসে ছিলেন। এ দৃশ্য সহ্য করা তাঁর পক্ষে খুব একটা সহজ ছিল না।

'বাপী!'

ইভা ওর নরম ছোট্ট হাতখানা রাখল বাবার হাতের ওপর। সেন্ট ক্লেয়ার চমকে উঠলেন। তারপর হঠাৎ ভেঙেপড়া মানুষের মতো আর্তস্বরে বলে উঠলেন, 'পারছি না, আমি আর কিছুতেই সহ্য করতে পারছি না। সর্বশক্তিমান আমাকে সত্যিই বড় কঠিন আঘাত দিয়েছেন।'

ওফেলিয়া তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, 'আগাস্টিন! ঈশ্বর কি তাঁর নিজের জিনিস নিয়ে যা খুশি তাই করতে পারেন না?'

'নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু আঘাতটা সহ্য করা খুবই কঠিন।'

'না না, বাপী, আমার জন্যে তুমি এমন কষ্ট পেও না।' সোজা হয়ে বসে ইভা বাবার বুকের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল এবং তাঁর ভাবনাগুলোকে এলোমলো করে দেওয়ার চেষ্টা করল।

সেন্ট ক্লেয়ার শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। পরক্ষণে নিজেই মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন, 'চুপ! চুপ করো, লক্ষ্মীটি ... মামণি আমার, আমিই ভুল করেছি। আমার ওভাবে বলাটা ঠিক হয় নি। আমি আর কখনো ওসব কথা বলব না। তুমি শুধু কেঁদো না। তোমার মনে এভাবে আঘাত দেওয়াটা আমার কখনই উচিত হয় নি।'

ইভা বাবার কোলে মাথা রেখে চুপটি করে শুয়ে রইল আর বাবা ওর ওপর ঝুঁকে পড়ে সব চাইতে কোমল শব্দগুলোই মৃদুভাষে বলে যেতে লাগলেন। একসময় ম্লান হেসে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'মামণি, তুমি তো আমাকে কোনো চুলের গুচ্ছ দিলে না?'

'এগুলো সবই তোমার আর মামণির। ফুপু যদি চান, যতগুলো খুশি নিতে পারেন। আমি নিজের হাতে ওদের দিয়ে গেলাম এই কারণে, আমি চলে গেলে ওদের কেউ কোনোদিন মনে রাখবে না, বাপী।'

এই ঘটনার পর থেকে ইভা দ্রুত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। ও যে খুব শিগগিরই এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে, তাতে আর কারো সামান্যতমও সন্দেহ রইল না। মিস ওফেলিয়া দিনরাত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ইভার শুশ্রূষা করে যান। এখন থেকে টমের অধিকাংশ সময়ই কাটে ইভার ঘরে। বেচারি ইভা সারাক্ষণ বিছানায় শুয়ে থাকতে খুবই অস্বস্তি বোধ করে, কেউ একটু বাইরে নিয়ে গেলে অসম্ভব আনন্দ পায়। টমও এই কাজটা করতে পারলে সব চাইতে খুশি হয়। বালিশের ওপর ইভার হালকা দেহটাকে শুইয়ে দুহাতে দোলাতে দোলাতে ঘরময় পায়চারি করে, বারান্দায় নিয়ে যায়। কখনো কখনো সকালে সমুদ্রের দিক থেকে যখন ঝিরঝিরে মিষ্টি বাতাস বয়ে আসে, টম ওকে বাগানে কমলা গাছের তলায় সেই পরিচিত আসনটা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যায়। সেখানে ওকে কোলের ওপর বসিয়ে একের পর এক ওর সব চাইতে প্রিয় স্তোত্রগুলোকে গেয়ে শোনায়।

কখনো কখনো সেন্ট ক্লেয়ারও ওইভাবে মেয়েকে নিয়ে পায়চারি করেন। কিন্তু যেহেতু তাঁর দেহের শক্তি টমের চাইতে অনেক কম, কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। সেইরকম কোনো মুহূর্তে ইভা বলে, 'বাপী, তোমার কষ্ট হচ্ছে, এবার টম চাচাকে দাও। বেচারি এই কাজটা করতে পারলে খুব খুশি হয়।

'আমিও তো খুশি হই, মামণি।'

'তুমিতো আমার জন্যে সব, সবই করো বাপী। আমার পাশে রাত জেগে বসে থাক, আমাকে বই পড়ে শোনাও। কিন্তু টম চাচা তো ওসব কিছু করতে পারে না' শুধু এই কাজটাই করতে পারে আর গান শোনাতে পারে। আমার জন্যে এটুকু করতে পারলে ও খুব আনন্দ পায়।'

শুধু টম নয়, এ বাড়ির প্রতিটা দাস-দাসীই ইভার জন্যে কিছু করতে পারলে কৃতার্থ মনে করত। বেচারি মামি সবসময়ই চাইত ওর সব চাইতে প্রিয়পাত্রী ইভার জন্যে কিছু করতে, কিন্তু মেরি দিন রাত ওকে অসম্ভব ব্যস্ত রাখত। আসলে চাকর-বাকররা বিশ্রাম নেবে, এটা মেরি আদৌ সহ্য করতে পারত না। রাতে অন্তত কুড়িবার মামিকে উঠতে হবে, হয় পা টেপা, নয়তো মাথায় হাত বুলানোর জন্যে। এ ছাড়াও আছে, বার বার রুমাল খোঁজ, দেখে এসো ইভার ঘরে কিসের শব্দ হলো, বড্ড উঁচু হয়ে গেছে, পর্দা একটু নামিয়ে দাও কিংবা বড্ড অন্ধকার লাগছে, পর্দাটা সরিয়ে দাও। এই ধরনের হাজার কাজ। কখনো ইভার ঘরে আসতে গেলে দিনের বেলায় বেচারিকে লুকিয়ে চুরিয়ে আসতে হতো।

মামি কখনো একটু ছুটি চাইলেই মেরি বলত, 'অসম্ভব, এখন আমার যা শরীরের অবস্থা, যত্ন না নিলে মেয়েটার দেখাশোনা করব কেমন করে?'

শুনতে পেলে সেন্ট ক্লেয়ার জবাব দিতেন, 'সে কী! আমার তো ধারণা ছিল ওফেলিয়া এই দায়িত্বটা থেকে তোমাকে মুক্তি দিয়েছে।'

'বাঃ, এই না হলে পুরুষ মানুষের মতো কথা। মেয়ের এইরকম একটা অবস্থায় কোনো মাই তার দায়িত্ব কারো কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে স্বস্তিতে থাকতে পারে না। আমার মনের মধ্যে যে কী হয়, সেটা তোমরা জানবে কেমন করে? আমি তো আর তোমার মতো মায়া-মমতাহীনভাবে সমস্ত দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি না।'

স্ত্রীর কথা শুনে সেন্ট ক্লেয়ার অতি দুঃখের মধ্যেও একটু ম্লান না হেসে পারলেন না। বন্ধুদের মধ্যে ইভার সব চাইতে অন্তরঙ্গ ছিল মা, বাবাকে বিব্রত না করে মাকে ও নিজের মনের কথা সব বলতে পারত। আর টমও উপলব্ধি করতে পারত ওর প্রতিটা ভাবনা, ওর রহস্যময় প্রতিটা উক্তি।

আজকাল টম রাতে নিজের ঘরে না ঘুমিয়ে বারান্দাতে শোয়, যাতে ইভার সামান্যতম প্রয়োজনেও সে সঙ্গে সঙ্গে উঠতে পারে।

ওফেলিয়া ঠাট্টা করে বললেন, 'কী ব্যাপার টম, তুমি আবার এখানে শুতে শুরু করলে কেন?'

'আস্তে, মিস ওফেলিয়া; স্যার শুনতে পাবেন!' ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে টম সতর্ক করে দিল, তারপর নিচু গলায় বলতে শুরু করল, 'ধর্মশাস্ত্রে আছে, গভীর রাতে ঈশ্বর তাঁর

প্রিয়তমের দরজায় দেবদূতকে পাঠান। আমি তাঁরই প্রতীক্ষায় রাতে ঘুমাতে পারি না, পাছে তিনি এসে ফিরে যান আর আমি দেখতে না পাই। আমি জানি মিস ইভা যখন স্বর্গে প্রবেশ করবে, দেবদূতেরা স্বর্গের দ্বার এতখানি উন্মুক্ত করে দেবেন যে আমরাও তাঁর মহিমা দেখতে পাব।'

'কেন টম, ইভা কি তোমাকে বলেছে ও আজ খুব অসুস্থ অনুভব করছে?'

'না, মিস ওফেলিয়া, ও শুধু আমাকে বলেছে কাল খুব ভোরে দেবদূতের রথ আসবে ওকে নিতে।'

টম আর ওফেলিয়ার মধ্যে যখন এই কথাবার্তা হয়, তখন রাত দশটা কি এগারোটা। সারা দিনের সমস্ত কাজ মিটিয়ে উনি এবার বিশ্রাম নেবেন। অন্যান্য দিনের তুলনায় ইভা আজ বেশ ভালোই ছিল। সবার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলেছে, নিজের সবচেয়ে প্রিয় ছোট ছোট দামি জিনিসগুলো গুছিয়েছে, অনেকগুলো আবার বন্ধুদের দিয়েও দিয়েছে, সারাটা সন্ধ্যে বাপীর সঙ্গে গল্প করেছে। ইভাকে তাঁর এত স্বাভাবিক মনে হয়েছে যে তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, এবার ও খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে। বহুদিন পরে মেয়েকে চুমু দিয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে তিনি হালকা মন নিয়ে শুতে গিয়েছিলেন।

সারা রাত মিস ওফেলিয়া ইভার শয্যার পাশে জেগেই বসেছিলেন। কিন্তু গভীর রাতে, যখন রহস্যময় অথচ সব চাইতে দুর্লভ শুভক্ষণটি এল, উনি হয়তো একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন, নইলে স্পষ্টই দেখতে পেতেন ভঙ্গুর বর্তমান আর চিরন্তন ভবিষ্যতের মাঝের যবনিকাটা কীভাবে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়ে গেল আর রাজকীয় দীপ্তিতে স্বর্গের দূতরা প্রবেশ করল ঘরের ভেতরে।

ভেতরে কাদের যেন অস্পষ্ট পায়ের শব্দে ওফেলিয়ার তন্দ্রা ছুটে গেল। চকিতে চমকে উঠে আলোটা বাড়িয়ে দিতেই পরিবর্তনটা ওঁর চোখে পড়ল। তাড়াতাড়ি বাইরের দরজা খুলে উনি টমকে ডাকলেন। টম শুধু জেগে নয়, বাইরে দাঁড়িয়ে তখন এই ডাকটার জন্যেই প্রতীক্ষা করছিল।

ওফেলিয়া বললেন, 'টম, একটা মুহূর্তও দেরি না করে ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো।' কথাটা বলেই উনি আবার ফিরে এসে সেন্ট ক্লেয়ারের দরজা ধাক্কাতে লাগলেন। 'আগাস্টিন! আগাস্টিন! শিগগির একবার এসো।'

ওফেলিয়ার শব্দগুলো ভারি একটা কফিনের মতো সেন্ট ক্লেয়ারের বুকে এসে আছড়ে পড়ল। পরক্ষণেই তিনি দৌড়ে এসে ইভার ওপর ঝুঁকে পড়লেন। ইভা কিন্তু তখনো ঘুমাচ্ছে।

ইভার মুখে যন্ত্রণা বা গ্লানিমার কোথাও কোনো ছায়া নেই, বরং সুস্থ স্বাভাবিকের চাইতে আরো উজ্জ্বল টলটলে মুখখানা যেন ঐশ্বরিক একটা দীপ্তিতে ঝলমল করছে।

সবাই নিস্পন্দ হয়ে এমন অপলক চোখে ইভার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে যে ঘড়ির টিকটিক শব্দকে মনে হচ্ছে অসহ্য। কয়েক মিনিটের মধ্যেই টম ডাক্তারকে নিয়ে ফিরে এল। ডাক্তার শুধু একবার তাকিয়ে দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর অত্যন্ত চাপা গলায় মিস ওফেলিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই পরিবর্তনটা কখন ঘটেছে?'

'একটু আগে, ঠিক মাঝ রাত্তিরে।'

এমন সময় মেরি পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল। 'কী ব্যাপার, আগাস্টিন! কী হয়েছে?'

'চুপ! ইভা ...!'

কথাটা শুনতে পেয়ে মামি চাকর-বাকরদের খবর দিল। নিমেষের মধ্যে সারা বাড়ি জেগে উঠল। আলো হাতে ওদের ছুটে আসতে দেখা গেল। শোনা গেল পায়ের শব্দ, বারান্দার দরজা-জানলা ঘিরে সবাই ভিড় করে দাঁড়াল। সেন্ট ক্লেয়ার ওসব কিছুই দেখেন নি বা শোনেন নি, তাঁর দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ফুলের মতো নিষ্পাপ মুখটাকে ঘিরে যে ভাব ফুটে উঠছে, কেবল তারই দিকে।

'হায়, ও যদি একটিবার জাগত ... একটা কথাও বলত!' তারপর ঝুঁকে ইভার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মৃদুস্বরে ডাকলেন, 'ইভা, মামণি আমার!'

ইভার নীল টানাটানা চোখ দুটো যেন ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হলো, অস্পষ্ট একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল সারা মুখে। মাথাটা একটু তোলারও চেষ্টা করল।

'তুমি আমাকে চিনতে পারছ, মামণি?'

'বাপী!' কথাটা বলে ইভা কোনোরকমে সেন্ট ক্লেয়ারের গলাটা জড়িয়ে ধরল, কিন্তু পরমুহূর্তেই তা শিথিল হয়ে খসে পড়ল।

সেন্ট ক্লেয়ার দেখলেন গভীর যন্ত্রণায় রেখাগুলো আবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে ইভার সারা মুখে, শ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে। তিনি আর কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না, অদূরে নিশ্চল প্রতিমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকা টমের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন, 'উঃ, কী ভয়ঙ্কর! আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে টম!'

বালিশে মাথা রেখে যেন অসম্ভব ক্লান্তিতে ইভা ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছে, স্থির হয়ে রয়েছে দীর্ঘায়ত চোখের নীলাভ মণি দুটো। যার সঙ্গে পার্থিব যন্ত্রণার এতটুকুও সম্পর্ক নেই। হাসি-হাসি মুখের অভিব্যক্তিতে জড়িয়ে রয়েছে আশ্চর্য রহস্যময় একটা দীপ্তি।

ইভার শয্যা ঘিরে সবাই নিস্পন্দ নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

সেন্ট ক্লেয়ার মৃদুভাষে ডাকলেন, 'ইভা।'

ইভা সাড়া দিল না।

'ইভা, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ আমাদের, বলবে না?'

অদ্ভুত স্নিগ্ধ একটা হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে, অস্ফুটস্বরে ও বলল, 'আনন্দ প্রেম ... শান্তি!' তারপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে চলে গেল মৃত্যুর ওপারে।

দুহাতে মুখ ঢেকে সেন্ট ক্লেয়ার আর্তনাদ করে উঠলেন, 'বিদায় মামণি আমার, চিরকালের মতো বিদায়! তোমার সুন্দর মুখখানা আমি আর কোনোদিন দেখতে পাব না, তোমার মিষ্টি গলার স্বর আমি আর কোনোদিনও শুনতে পাব না। আমাদের সবাইকে ছেড়ে তুমি চিরকালের মতো চলে গেলে, তোমাকে আর কখনো দেখতে হবে না দৈনন্দিন জীবনের ধূসর আকাশ। বিদায় সোনামণি আমার, চিরকালের মতো বিদায়!'

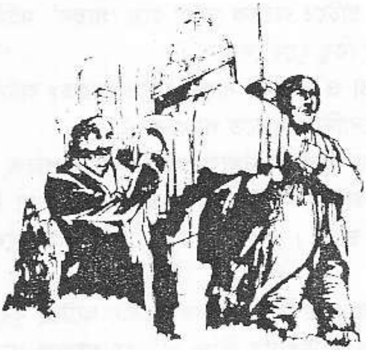

বাইশ

পুনর্মিলন

ইভার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মিটে যাবার কয়েক দিন পরেই সেন্ট ক্লেয়ার সপরিবারে ফিরে এলেন নিউ অর্লিয়েন্সে। পেছনে পড়ে রইল সমুদ্রের ধারের বাংলো বাড়ি, গাছগাছালি দিয়ে ঘেরা বাগান আর সেই ছোট্ট কবরটা।

খাওয়া, পরা, ঘুমানো থেকে শুরু করে সব কিছু আবার স্বাভাবিক গতিতেই বয়ে চলেছে। শুধু সেন্ট ক্লেয়ারের জীবনেই যা একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। যদিও তিনি সবার সঙ্গেই কথা বলেন, হাসেন, খবরের কাগজ পড়েন, রাজনীতি নিয়ে বির্তকের ঝড় তোলেন, ব্যবসায়িক ব্যাপারেও মন দেন, তবু তাঁর বুকের ভেতরটা সামুদ্রিক ঝিনুকের মতো একেবারে ফাঁকা হয়ে গেছে। মাথায় শোকের চিহ্ন, কালো টুপিটা না থাকলে কেউ কখনো বুঝতেই পারত না যে তাঁর জীবনে কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

তাঁর এই নির্লিপ্ততা শুধু বাইরের লোক কেন, মেরিও কখনো বুঝতে পারে নি। তাই ও কখনো কখনো মিস ওফেলিয়ার কাছে অভিযোগ করত, 'একটা জিনিস ভাবতে আমার খুব অবাক লাগে, এতদিন যে লোকটা ছিল মেয়ে বলতে একেবারে অজ্ঞান, আজ সেই লোকটা মেয়েকে এত তাড়াতাড়ি কী করে ভুলে যেতে পারল, আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না! বললে আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না, আজকাল ও ভুলেও কখনো ইভার কথা উচ্চারণ করে না!'

ওফেলিয়া আস্তে আস্তে বলতেন, 'কিন্তু আমি জানি ও সবসময়ই ইভার কথা ভাবে। আসলে ওর ভাবনাটা ফল্গুস্রোতের মতো, ওপর থেকে কিছু বোঝা যায় না।'

'কী জানি বাবা, আমার তো তা বিশ্বাস হয় না! লোকের মনে দুঃখ হলে কোনো না কোনোভাবে সে প্রকাশ করবেই। এই তো, আমার দুঃখকে কি একটা মুহূর্তের জন্যে চেপে রাখতে পারছি?'

'স্যার কিন্তু আগের চাইতে অনেক রোগা হয়ে গেছেন', মামি প্রতিবাদ না করে পারত না। 'উনি আজকাল আর কিছু মুখে দেন না।'

'কিন্তু আমাকেও তো ও দুএকটা সান্ত্বনা দিতে পারত? আমি মা, 'মামার বুকের মধ্যে যে কী হয়, সেটা ও কোনোদিনই বুঝতে পারে না।'

অথচ কেউ একটু চোখ মেলে দেখলে স্পষ্টই বুঝতে পারত, সেন্ট ক্লেয়ারের জীবনের যা কিছু স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, সবই ছিল ইভাকে ঘিরে। যা কিছু কিনতেন, গড়তেন, সাজাতেন, সবই ইভার জন্যে। এখন ও নেই, তাই তারও কোনো ভাবনা নেই, কিছু করারও নেই।

সেন্ট ক্লেয়ারের জীবনে যা কিছু পরিবর্তন সেটা ঘটেছে খুব ধীরে ধীরে এবং সম্পূর্ণ ভেতর থেকে। উদাস চোখে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর মনে হয় ইভা যেন ঊর্ধ্বাকাশ থেকে ডাকছে, যেন ওর ছোট্ট হাত দিয়ে জীবনের পথটাকে দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু তিনি চিরকাল নিজেরই চেতনা আর বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সকল কিছু ব্যাখ্যা করেছেন, কখনো ধর্মের বাধ্যবাধকতা দিয়ে জীবনকে পরিচালনা করেন নি। ফলে ধর্মের অলীক মোহকে তিনি যেমন কোনোদিন প্রশ্রয় দিতেন না, তেমনি মানবিক ধ্যান-ধারণা আর মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব দিতেন অপরিসীম। তা সত্ত্বেও আকজাল তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে ইভার বাইবেলটা পড়েন, ওর প্রতিটা কথা নিজের মনে তন্নতন্ন করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন।

নিউ অর্লিয়েন্সে ফিরে আসার পরেই সেন্ট ক্লেয়ার ইভার কাছে প্রতিশ্রুতি মতো টমকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে আইনের প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিলেন, আশা করা যাচ্ছে খুব শিগগিরই অনুমতি পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যে, যত দিন গেছে, সেন্ট ক্লেয়ার তত বেশিই টমের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। টমের মতো এমন বিশ্বস্ত, ইভার প্রতি এমন অনুরক্ত মানুষ তিনি আর একজনও দেখেন নি। টম যেমন তার তরুণ মনিবকে অনুক্ষণ ছায়ার মতো অনুসরণ করত, সেন্ট ক্লেয়ারেরও ঠিক তেমনি, টমকে দেখলেই তাঁর প্রিয়তমা কন্যা ইভার কথা মনে পড়ে যেত।

টমকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে আদালতে আবেদন জানানোর পরেই সেন্ট ক্লেয়ার একদিন বললেন, 'টম, আমি তোমাকে মুক্তি দেবার কথা ভেবেছি। সুতরাং বাক্স -প্যাঁটরা গুছিয়ে তুমি কেন্টাকিতে রওনা হবার জন্যে প্রস্তুত হতে পারো।'

অপ্রত্যাশিত আনন্দের আলোয় টমের সারা মুখ ঝলমল করে উঠল। প্রার্থনার ভঙ্গিতে আকাশের দিকে হাত তুলে সে বলল, 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, কর্তা!'

টমের কথায় সেন্ট ক্লেয়ার প্রচ্ছন্ন একটা বেদনা অনুভব না করে পারলেন না। কেননা টম যে তাঁকে ছেড়ে যাবার জন্যে এতটা উন্মুখ হয়ে রয়েছে, তিনি তা জানতেন না। তাই কিছুটা ক্ষুণ্ন স্বরেই তিনি বললেন, 'কিন্তু, টম, তুমি এখানে এমন একটা কিছু দুরবস্থার মধ্যে ছিলে না যে চলে যাবার জন্যে একেবারে ব্যস্ত হয়ে উঠেছ?'

'ঠিক তা নয়, স্যার। স্বাধীন মানুষ হব, সেই জন্যেই নিজের আনন্দকে চেপে রাখতে পারি নি।'

'কেন টম, স্বাধীন না হয়েও তুমি কি এখানে স্বাধীন মানুষের চাইতে সুখে ছিলে না?'

'টম বিনীতভাবেই জবাব দিল, 'না, স্যার।' কেন টম, আমি তোমাকে যে ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ, থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি, তোমার নিজের উপার্জনে কী কখনো তা করা সম্ভব হতো?'

'সবই বুঝি, স্যার। আপনি খুবই দয়ালু কিন্তু অপরের ভালো জিনিস খাওয়া পরার চাইতে নিজের জিনিসেই বেশি সুখ, তা সে যত খারাপই হোক না কেন। আমার ধারণা এটাই স্বাভাবিক, কর্তা।'

'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছ, টম। আশা করছি মাসখানেকের মধ্যেই তুমি এখান থেকে চলে যেত পারবে।'

'না স্যার তা হয় না। আপনি একটা মানসিক অশান্তির মধ্যে রয়েছেন। আপনি যতদিন চাইবেন আমি এখানে থাকব।'

'না না টম, আমার জন্যে তোমাকে এখানে ধরে রাখতে চাই না। অনুমতি পাবার পরের দিনই তুমি এখান থেকে চলে যাবে, আর বাড়িতে গিয়ে তোমার ছেলেমেয়েদের আমার ভালোবাসা জানাবে।'

ইভার মৃত্যুতে মেরি বা মামি, কেউই কম আঘাত পায় নি। মামি তো আজো দিনরাত লুকিয়ে লুকিয়ে কেবল কাঁদে। কিন্তু মিস ওফেলিয়া ইভার মৃত্যুতে শোকের চাইতে জীবনের সত্যিকারের শিক্ষা পেয়েছেন অনেক বেশি। যে জংলি টপসিকে উনি শাসন করে, শিক্ষা দিয়েও মানুষ করতে পারেন নি, সেই টপসিকে ইভা বশ করতে পেরেছিল অন্তরের গভীর ভালোবাসা দিয়ে। এই ভালোবাসার শিক্ষাই ওফেলিয়ার হৃদয়কে একেবারে আলোকিত করে দিয়েছিল। তাই ইভার অসমাপ্ত কাজগুলোকে উনি নিজের কাজ বলেই মনে করতেন।

সেদিন বিকেলে চায়ের পর ওফেলিয়া হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'চাকর-বাকরদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তুমি কিছু ভেবেছ, আগাস্টিন?'

আগে না ভাবলেও, এখন তিনি প্রায়ই ভাবেন। তবু মুখে বললেন, 'না।'

'কিন্তু এখন থেকেই ওদের সম্পর্কে তোমার ভাবা উচিত আগাস্টিন।'

'কেন?'

'বলা যায় না, হঠাৎ যদি তোমার মৃত্যু হয় তখন ওদের কী হবে?'

'মৃত্যু' শব্দটা যেন ছুরির ফলার মতো বিঁধল তাঁর বুকে। কাগজটা সরিয়ে রেখে তিনি উদাস চোখে তাকিয়ে রইলেন ফোয়ারাটার দিকে, পড়ন্ত আলোয় যার উৎক্ষিপ্ত জলধারা অজস্র চুনী-পান্নার মতো ঝিকমিক করছে। আপন মনেই তিনি আবার উচ্চারণ করলেন, 'মৃত্যু'! শব্দটা কত সহজ অথচ কী ভয়ঙ্কর! এর আগে শব্দটার গুরুত্ব তিনি কখনো এমন গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি, এখন মনে হচ্ছে সবার জীবনেই এটা অবশ্যম্ভাবী।'

ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ওফেলিয়া বললেন, 'আমি তোমাকে আঘাত করার জন্যে বলি নি, আগাস্টিন।

'আমি জানি, ওফেলিয়া, তুমি ইভার কথা ভেবেই বলেছ। আমি যে ওদের কথা আদৌ ভাবি নি, তা কিন্তু নয়। ভেবেছি একটু একটু করে ওদের সবাইকে মুক্তি দেব। টমের জন্যে ইতোমধ্যে আদালতে আবেদনও করেছি। মুক্তির পরেও টপসি থাকবে তোমার কাছে। ওর তো আর দেখাশোনা করার কেউ নেই, কোথায় থাকবে বলো?'

'টপসি এখন ভালো হয়ে গেছে, ও আরো ভালো হবে।'

'সবচেয়ে মুশকিল কী জানো, ওফেলিয়া ... আমি অনেক ভেবে দেখেছি, শুধু মুক্তি পেলেই হবে না, ওদের দরকার সুশিক্ষা আর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। নইলে টপসি মুক্তি পেয়ে কী করবে বলো, যদি নিজের রুটিটুকু ও নিজে না উপার্জন করতে পারে? আমরা এমনই অলস আর স্বার্থপর যে কখনো কখনো ওদের প্রতি সদয় হয়ে ভালো ব্যবহার করেছি, কিন্তু কখনো শিক্ষিত করে তোলার কথা ভাবি নি।'

খুশির চোখে ওফেলিয়া ভাইয়ের দিকে তাকালেন। 'সত্যি আগাস্টিন, আগের চাইতে তুমি এখন অনেক বদলে গেছ!'

'হ্যাঁ ওফেলিয়া, এখন আমি অনেক দুঃসাহসী হয়ে উঠেছি। আগে আমার ভয় ছিল, কিন্তু এখন আমার হারাবার মতো আর কিছুই নেই। তাই ভেবেছি নতুন করে আর একবার চেষ্টা করে দেখব গোড়া থেকে শুরু করা যায় কি না।'

'আগাস্টিন!'

'হ্যাঁ ওফেলিয়া, হাঙ্গেরিয়ানরা যদি তাঁদের লক্ষ লক্ষ ভূমিদাসদের মুক্তি দিতে পারেন, আমিই বা এই কটা ক্রীতদাসকে মুক্তি দিতে পারব না কেন? সারাটা দেশের তুলনায় তা কিছু না হলেও, নতুন করে শুরু করব। শুধু মুক্তি নয়, শিক্ষারও ব্যবস্থা করব।'

'যদি তুমি বল, আমি জেন, রোসা, আর টপসির লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্ব নিতে পারি।' উচ্ছ্বসিত হয়ে ওফেলিয়া বলে উঠলেন।

'এ সম্পর্কে পরে আমি তোমাকে বিস্তারিত সব বলব, ওফেলিয়া। এখন আমি রাস্তা থেকে একটু ঘুরে আসব। কেন জানি না, আজ সারাদিন মনটা খুব খারাপ হয়ে রয়েছে। কেবলই আমার অতীত দিনগুলোর কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে।'

টুপি আর ছড়ি নিয়ে মনিবকে বের হতে দেখে টম দ্রুত পায়ে আঙিনা পেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল সে তার সঙ্গে যাবে কিনা।

সেন্ট ক্লেয়ার বললেন, 'না টম, তোমার আসার দরকার নেই। একটু ঘুরে আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরে আসব।'

টম বারান্দায় বসে রইল। সায়াহ্নের অন্ধকার সরিয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠেছে। ফোয়ারার কৃত্রিম উৎসধারার দিকে তাকিয়ে সে জলের মৃদু কলতান, শুনতে লাগল। শুনতে শুনতেই টম ভাবতে লাগল নিজের বাড়ির কথা, শিগগিরই সে যে একজন স্বাধীন মানুষ হবে এবং স্বেচ্ছায় নিজের ঘরে ফিরে যেতে পারবে, তার কথা। কীভাবে নিজে পরিশ্রম করে স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের কিনে নেবে, তাও সে কল্পনা করল। আনন্দের সঙ্গে অনুভব করল নিজের সবল পেশিগুলো, যা দিয়ে সে স্ত্রী আর ছেলেমেয়েদের স্বাধীনতা কিনে নিতে পারবে।

এক সময়ে সে তার মহৎ-হৃদয় তরুণ মনিবের কথাও ভাবতে লাগল, শেষে তার ভাবনার সবটুকু অধিকার করে নিল মূর্তিময়ী ইভা। তার কেনই যেন মনে হলো দেবদূতের মতো উজ্জ্বল মুখ, সোনালি চুল নিয়ে ইভা এখন ফোয়ারার জলধারার ওপার থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। ইভার কথা ভাবতে ভাবতেই একসময় তন্দ্রা নামল তার চোখের পাতায় আর স্বপ্নে সে দেখল ফুলসাজে ইভা ঠিক সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। মুখখানা আশ্চর্য

উজ্জ্বল, দুচোখে স্বর্গীয় দীপ্তি, মাথার চারপাশে ঘিরে স্বর্ণীল বর্ণচ্ছটা। টম কাছে এগিয়ে যেতেই ও অদৃশ্য হয়ে গেল। ঠিক তখনই সে অস্পষ্ট শুনতে পেল অনেকগুলো পায়ের শব্দ আর মিলিত কণ্ঠস্বর।

ধড়ফড়িয়ে জেগে উঠতেই সে দেখতে পেল, কতকগুলো লোক চাদরে ঢাকা একটা দেহকে বয়ে আনছে। মুখের ওপর লণ্ঠনের আলো পড়তেই টম স্তম্ভিত বিস্ময়ে আর্তনাদ করে উঠল, তার সেই বুকফাটা হাহাকার ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল সারা বাড়ি। ওফেলিয়া যেখানে বসে বুনছিলেন, বৈঠকখানার সেই খোলা দরজার দিকে লোকগুলো দেহটাকে বয়ে নিয়ে গেল।

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে সেন্ট ক্লেয়ার একটা ক্যাফেতে ঢুকে ছিলেন সান্ধ্যপত্রিকাটা পড়ার জন্যে। তিনি যখন পড়ছিলেন, হঠাৎ দুই ভদ্রলোকের মধ্যে মারামারি বাধে। আসলে দুজনেই তখন প্রায় সম্পূর্ণ মাতাল। সেন্ট ক্লেয়ার এবং আরো কয়েকজন ভদ্রলোক তাঁদের ছাড়িয়ে দিতে যান। একজনের হাত থেকে ধারালো ছোরাটা কেড়ে নিতে যাবার সময় লোকটা প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করতে না পেরে সেন্ট ক্লেয়ারের পাঁজরে মারাত্মকভাবে আঘাত করে।

চিৎকার চেঁচামেচি আর করুণ বিলাপে সার বাড়ি ভরে উঠেছে। আলো হাতে দাসদাসীরা পাগলের মতো ছুটছে, কেউ মাটিতে পড়ে আছাড় খাচ্ছে, কেউবা আর্তস্বরে ককিয়ে মাথার চুল ছিঁড়ছে। খবরটা শোনা মাত্র মেরি তো মূর্চ্ছাই গেছে। সেই তুলনায় টম আর ওফেলিয়া অনেক বেশি শান্ত। ওফেলিয়ার নির্দেশেই বৈঠকখানায় দ্রুত শোয়ানোর ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু শয্যাটা রক্তে ভিজে যেতে খুব একটা সময় লাগল না। যন্ত্রণা এবং অজস্র রক্তপাতের ফলেই সেন্ট ক্লেয়ার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু ওফেলিয়া নিপুণ তৎপরতা ও শুশ্রূষায় একটু পরেই আবার তিনি ধীরে ধীরে চোখে মেললেন এবং এমন অবাক হয়ে সবার মুখের দিকে তাকালেন, যেন কী ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারছেন না।

ডাক্তার এসে খুব ভালো করে পরীক্ষা করে দেখলেন। কিন্তু ওঁর মুখের অভিব্যক্তি দেখে স্পষ্টই বোঝা গেল কোনো আশা নেই। তা সত্ত্বেও সবাইকে ঘর থেকে বার বার দিয়ে, টম আর ওফেলিয়ার সাহায্যে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ওষুধ দিয়ে বেঁধে দিলেন।

ঘর থেকে বার করে দিলেও চাকর-বাকরেরা কেউ বারান্দা থেকে নড়ল না। প্রতিটা দরজা-জানালায় ওরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে রইল। ওফেলিয়াকে অনেক কষ্টে বোঝাতে হলো যে ওদের চুপ করে থাকার ওপরেই মনিবের মরা-বাঁচা নির্ভর করছে।

সেন্ট ক্লেয়ার অতিকষ্টে বললেন, 'হায়রে, ওদের জন্যে আমি কিছুই করতে পারলাম না!' তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠল আত্মধিক্কারের যে তিক্ত বেদনা তা সহ্য করা সত্যিই খুব কঠিন। অসহ্য যন্ত্রণায় কিছুক্ষণের জন্যে তিনি চোখ বন্ধ করে রইলেন। তারপর শয্যার পাশে নতজানু হয়ে বসে থাকা টমের হাতে হাত রেখে কোনোরকমে উচ্চারণ করলেন, 'টম! আহারে বেচারি!'

সাগ্রহে টম বলে উঠল, 'কিছু বলছেন, স্যার?'

'আমি চলে যাচ্ছি টম ... প্রার্থনা করো।' ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি কোনো পাদরির কথা বলছেন?'

সেন্ট ক্লেয়ার মাথা নেড়ে নিষেধ করলেন, তারপর টমের হাতে চাপা দিয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন, 'তুমি প্রার্থনা কর, টম।'

হৃদয়ের সবটুকু শ্রদ্ধা, একাগ্রতা উজাড় করে দিয়ে টম প্রার্থনা করতে লাগল, আধবোজা চোখের প্রান্ত থেকে গড়িয়ে এল অশ্রুধারা।

প্রার্থনা শেষ হবার পর হাত বাড়িয়ে সেন্ট ক্লেয়ার টমের হাতটা আঁকড়ে ধরলেন, ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে রইলেন তার মুখের দিকে, কিন্তু কোনো কথা বলতে পারলেন না। একটু পরে ধীরে ধীরে বুজে এল তাঁর চোখের পাতা, তবু তিনি টমের হাতটা ঠিক তেমনিভাবেই আঁকড়ে আছেন, কেননা স্বর্গের সিংহ-তোরণে সাদা-কালোর কোথাও কোনো প্রভেদ নেই। থেকে থেকে তাঁর বিশীর্ণ ঠোঁট দুটো শুধু নড়ছে, কিন্তু কোনো শব্দই তেমন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

ডাক্তার বললেন, 'উনি প্রলাপ বকছেন।'

সেন্ট ক্লেয়ার মাথা নাড়লেন, 'না, বহুকাল পরে আমি নিজের ঘরে ফিরে চলেছি!'

কথা বলার ক্লান্তিতে তাঁর মুখে ঘনিয়ে উঠল মৃত্যুর ছায়া, কিন্তু সে শুধু ক্ষণিকের জন্যে। ছায়াটা সরে যেতেই তাঁর মুখ ঘুমিয়ে থাকা কোনো শিশুর মতোই সুন্দর মনে হলো। ঠিক ওভাবেই খানিকক্ষণ থাকার পর সহসা তিনি যেন পরিপূর্ণ আলোয় চোখ মেললেন, যন্ত্রণাবিহীন অসীম তৃপ্তিতে শুধু ছোট্ট করে বললেন, 'মা!' তারপর সব শেষ হয়ে গেল।

তেইশ

জীবন্ত পণ্যগুলি

যে কথাটা প্রায়ই শোনা যায়, দয়ালু মনিবের মৃত্যুতে নিগ্রো ক্রীতদাস-দাসীরা অসম্ভব অসহায় হয়ে পড়ে কথাটা যে কী নির্মম সত্যি, সেন্ট ক্লেয়ারের মৃত্যুর পরেই তা অক্ষরে

অক্ষরে প্রমাণিত হলো। সেন্ট ক্লেয়ার আর মেরির মাঝখানে চাকর-বাকরদের জন্যে যে আড়ালটুকু ছিল, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হতে না হতেই তা চোখের নিমেষে উধাও হয়ে গেল।

সেদিন মিস ওফেলিয়া নিজের ঘরে কী যেন একটা কাজে ব্যস্ত ছিলেন, হঠাৎ দরজায় টোকা দেওয়ার শব্দ শুনতে পেলেন। দরজা খুলে দেখলেন রোজা দাঁড়িয়ে রয়েছে। চুলগুলো আলুথালু, সুন্দর। মুখখানা শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটো জলে ভেজা।

'কী ব্যাপার রোজা, তুমি কাঁদছ কেন?'

'ও, মিসিস ...' মেঝেতে আছড়ে পড়ে রোজা ওফেলিয়ার পা দুটো জড়িয়ে ধরল। 'আপনি আমাকে বাঁচান ... আপনি নিজে মিস মেরিকে একটু বলুন ... উনি আমাকে চাবুক মারার জন্যে পাঠাচ্ছেন ...'

'সে কী!'

'এটা দেখলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন।' ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ রোজা ওফেলিয়ার হাতে দিল।

ইতালিয় ধাঁচে মেরির নিজের হাতে লেখা ওটা একটা নির্দেশ। চাবুক-ঘরের রক্ষকের কাছে লেখা হয়েছে, এই পত্রবাহক.ক যেন পনেরো ঘা চাবুক মারা হয়।

চিরকুটটা পড়ে ওফেলিয়া বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন, 'কেন, তুমি কী করেছিলে?'

'আমার কী অপরাধ আমি নিজেই জানি না মিসিস। মিস মেরির জামাকাপড় গোচ্ছাছিলাম, হঠাৎ উনি ঠাস করে আমার গালে একটা চড় মারলেন। জানি না, হয়তো আমার গোছানোটা ওঁনার ঠিক পছন্দ হয় নি। কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকাতেই উনি রেগে উঠে বললেন, 'আমি নিজে কিছু দেখি না বলে তোরা আজকাল বড্ড বেড়ে উঠেছিস!' তারপরেই এটা লিখে দিয়ে বললেন, 'নিয়ে যা। আমার হুকুমের একটুও নড়-চড় হলে একদম খুন করে ফেলব।'

কাগজটা হাতে নিয়ে ওফেলিয়া স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, কী করবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না।

চোখ মুছতে মুছতে রোজা বলল, 'যদি মিস মেরি বা আপনি আমাকে চাবুক মারতেন, আমি কিছু মনে করতাম না। কিন্তু চাবুক-ঘরের ওই লোকটা যে কী ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর ... আর সে যে কী লজ্জা, আপনি কল্পনাও করতে পারলেন না, মিসিস!'

চাবুক মারার ঘরে মেয়েদের, বিশেষ করে তরুণীদের পাঠানোর অর্থ যে কী কুমারী ওফেলিয়া খুব ভালো করেই জানতেন, তবু মুখে কোনোরকম উদ্বিগ্নতা প্রকাশ না করে শান্ত স্বরেই বললেন, 'তুমি এখানে একটু বস, আমি মেরির সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।'

নিজের ঘরে মেরি আরাম-কুর্সিতে বসে রয়েছে, মামি পাশে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে দিচ্ছে আর জেন মাটিতে বসে পা টিপছে।

ওফেলিয়ার পায়ের শব্দে মেরি চোখ মেলল। ওফেলিয়া কোনোরকম ভূমিকা না করেই বললেন, 'রোজার ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে এলাম, মেরি।'

'বলুন!'

'নিজের ত্রুটির জন্যে ও সত্যিই খুব অনুতপ্ত।'

'ওর ঔদ্ধত্য আমি অনেক সহ্য করেছি, আর নয়।'

'তুমি অন্য কোনোভাবে ওকে শাস্তি দিতে পার না, অন্তত চাবুক-মারার ঘরে পাঠানোর মতো লজ্জাকর ...'

'লজ্জাকর!' মেরি হেসে উঠল। 'ওর ঠিক এই শিক্ষাটা অনেকদিন আগেই পাওয়া উচিত ছিল। শুধু ও নয়, এবার থেকে আমি ঠিক করেছি, কোথাও এতটুকু বেহায়াপনা দেখলেই কালো পেত্নীগুলোকে সোজা চাবুক-মারার ঘরে পাঠিয়ে দেব ... দেখি ওরা ঠিক হয় কিনা।'

'এ এক ধরনের নিষ্ঠুরতা, মেরি!'

'আপনার কাছে মনে হলেও, এ ধরনের শাস্তি ওদের কাছে আদৌ নিষ্ঠুরতা নয় এবং এসব না করলে ওরা একেবারে মাথায় চড়ে বসবে।'

এর পরেও তর্ক করা অর্থহীন ভেবে ওফেলিয়া চলে এলেন, কিন্তু ফিরে গিয়ে রোজাকে কী বলবেন কিছুই বুঝতে পারলেন না।

এই ঘটনার কয়েকদিন পর টম আনমনে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, অ্যাডলফ তার পাশে এসে দাঁড়াল। সেন্ট ক্লেয়ারের মৃত্যুর পর ও-ই মুষড়ে পড়েছে সবচাইতে বেশি। কেননা অ্যাডলফ ভালো করেই জানত মেরি তাকে আদৌ পছন্দ করে না, কিন্তু মনিব যতদিন বেঁচে ছিলেন, ব্যাপারটাকে ও তেমন গুরুত্ব দেয় নি। অথচ এবার ওর-কপালে কী ঘটবে, সেই অজানা আশঙ্কাতেই বেচারি একেবারে কাঁটা হয়ে রয়েছে। সেন্ট ক্লেয়ারের ভাই অ্যালফ্রেডের সঙ্গে যোগাযোগ করে আইনজ্ঞের পরামর্শ মতোই মেরি এখানকার যাবতীয় সম্পত্তি, তার সঙ্গে সমস্ত ক্রীতদাসদেরও বিক্রি করে দিয়ে বাবার কাছে ফিরে যাবে বলে স্থির করেছে।

'আমাদের সবাইকে যে বিক্রি করে দেওয়া হবে, তুমি কি জানো, টম?'

জানি।

'তুমি কেমন করে জানলে?'

'মিসিস যখন উকিলের সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি তখন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে সব শুনেছি। দু-একদিনের মধ্যেই আমাদের সবাইকে নিলামে পাঠানো হবে।'

গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টম বলল, 'ঈশ্বরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!'

'এমন মনিব আমরা আর কোনোদিনও পাব না।' অ্যাডলফ বলল। 'তবে মিসিসের কাছে কাজ করার চাইতে আমি নিলামে বিক্রি হতেও রাজি আছি।'

অ্যাডলফ চলে যেতেই টমের হৃদয় বিষণ্ণতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। বন্দরের প্রায় কাছে এসে ভরাডুবি হলে নাবিকের চোখের সামনে যেমন শেষবারের মতো ভেসে ওঠে গির্জার চূড়া, তার প্রিয় জন্মভূমির পরিচিত ঘর-বাড়ির দৃশ্যাবলি। ঠিক তেমনিভাবে টমেরও চোখের

সামনে ভেসে উঠল অতিপরিচিত একটা স্মৃতি। স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে আর তার স্বাধীনতা। হৃদয়ের গহীন নিভৃতে এই স্বাধীনতাই ছিল তার চিরকালের স্বপ্ন, তার অতি গর্বের বস্তু। এত কাছে পেয়েও এভাবে হারাতে হবে সে স্বপ্নেও ভাবি নি। তাই কোনোরকমে চোখের জল চেপে রেখে বেদনার্ত স্বরে সে আবার বলে উঠল, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, ঈশ্বর!'

তবু টম যেন কিছুতেই স্বস্তি পেল না। ইভার মৃত্যুর পর থেকে যিনি তাকে কিছুটা করুণার চোখে দেখতেন, টম মনে মনে ভাবল সেই মিস ওফেলিয়ার সঙ্গে একবার দেখা করবে।

'কী ব্যাপার টম, তুমি কি আমাকে কিছু বলবে?' দরজার সামনে তাকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওফেলিয়া জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, মিস ওফেলিয়া।' ভেতরে প্রবেশ করার পরেও টম চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। 'সংকোচ কী, বলো?'

'ইভার ইচ্ছা অনুযায়ী মাস্টার সেন্ট ক্লেয়ার আমাকে মুক্তি দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী তিনি আদালতে আবেদনও করেছিলেন। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এ ব্যাপারে মিসিসের সঙ্গে একবার কথা বলেন, উনি হয়তো মনিবের ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন।'

কুমারী ওফেলিয়ার চোখে ফুটে উঠল দুশ্চিন্তার ছায়া, তবু মুখে বললেন, 'আমি নিশ্চয়ই কথা বলব, টম। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে মিসেস সেন্ট ক্লেয়ারের ওপর। উনি তোমার জন্যে তেমন একটা কিছু করবেন বলে আমার মনে হয় না। তবু আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব টম।'

রোজার সম্পর্কে সেই তিক্ত ঘটনার পর থেকে মিস ওফেলিয়া নিজেকে একরকম গুটিয়েই নিয়েছিলেন এবং নিজের বাড়িতে ফিরে যাবার জন্যে প্রস্তুতও হচ্ছিলেন। কিন্তু টমের ব্যাপারে কিছু না বলাটা অন্যায় হবে ভেবেই উনি মেরির সঙ্গে দেখা করলেন।

মেরি তখন কী রকম কাপড়ে পোশাক তৈরি করলে ঠিকমতো শোক প্রকাশ করা হবে, তাই নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ওফেলিয়াকে দেখে বলল, 'এই কাপড়টাতে আমাকে কেমন মানাবে বলে আপনার মনে হয়?'

'আমার চাইতে সেটা তুমি নিজেই ভালো যাচাই করতে পারবে বলে আমার মনে হয়, মেরি।'

'আসলে কী জানেন, বিদেশে পরে যাবার মতো আমার আদৌ ভালো কোনো পোশাক নেই।'

ওফেলিয়া অবাক হলেন। 'কেন, তুমি বিদেশে যাচ্ছ নাকি?'

'হ্যাঁ, সপ্তাখানেকের মধ্যেই বাবার কাছে চলে যাব ঠিক করেছি।'

'এত তাড়াতাড়ি কি তোমার পক্ষে চলে যাওয়া সম্ভব হবে?'

'চিঠিতে অ্যালফ্রেড জানিয়েছে, উকিলের পরামর্শ মতো ও আসবাবপত্র আর ক্রীতদাসদের নিলামে বিক্রি করে দিতে পারবে। বাড়িটা আপাতত উকিলের জিম্মাতেই থাকবে।'

'তুমি যখন চলেই যাচ্ছ, তোমাকে একটা কথা বলি। আগাস্টিন টমকে মুক্তি দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং সেই মতো আদালতে আবেদনও করেছিল। আশা করি তুমি বাকি কাজটুকু শেষ করে যাবে।'

'আদৌ না।' মেরি স্পষ্টই জানিয়ে দিল। 'এ বাড়ির যত দাসদাসী, তার মধ্যে টমের দামই সবচাইতে বেশি। সুতরাং ওকে আমি কোনোমতেই ছাড়তে পারব না। তাছাড়া ও স্বাধীনতা নিয়ে বা করবেই কী? ও তো বেশ সুখেই আছে।'

'ও কিন্তু মনেপ্রাণেই স্বাধীনতা চায়, আর আগাস্টিনও ওকে তা দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।'

'ওরা তো স্বাধীনতা চাইবেই। আসলে ওরা কোনো কিছুতেই সন্তুষ্ট নয় এবং যা নেই তা পাবার জন্যে একেবারে উদ্‌গ্রীব। আমি কিন্তু ওদের স্বাধীনতা দেওয়ার বিরুদ্ধে। একটা নিগ্রোকে কোনো মনিবের অধীনে রেখে দিলে সে ভদ্রভাবে জীবনযাপন করবে, কিন্তু স্বাধীনতা দিলেই সে হয়ে উঠবে উচ্ছৃঙ্খল, মাতাল আর কুড়ের বেহদ্দ। স্বাধীনতা দেওয়াটা ওদের কোনোমতেই উচিত নয়।'

কিন্তু টম অধ্যবসায়ী আর ধার্মিক। বিক্রি করলে ওর ভাগ্যে হয়তো কোনো খারাপ মনিব জুটতে পারে।'

'ওটা বাজে কথা। প্রায় সব মনিবই ভালো হয় এবং তারা চাকর-বাকরদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে।'

ওফেলিয়া দেখলেন এরপর তর্ক করা বৃথা, তবু টমের মুখ চেয়েই উনি শেষ চেষ্টা করলেন। 'তবু তোমাকে না বলে পারছি না, মেরি, তোমার স্বামী ওকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল এবং আকস্মিক মৃত্যু না ঘটলে সে নিশ্চয়ই তা করত, কেননা ইভার মৃত্যুশয্যার পাশেই সে এই প্রতিজ্ঞা করেছিল। আমি আশা করেছিলাম তুমি তার সে ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাবে।'

সহসা রুমালে মুখ ঢেকে মেরি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'বুঝতে পেরেছি, আপনারা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন। কেউ আমার দুঃখের দিকে একবার ফিরেও তাকাচ্ছেন না।'

এরপরেও দাঁড়িয়ে থাকা অর্থহীন ভেবে ওফেলিয়া চলে এলেন এবং নিজের পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব ছিল, ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে মিসেস শেলবিকে চিঠিতে জানালেন যদি উনি টমের মুক্তির কোনো ব্যবস্থা করতে পারেন খুব ভালো হয়।

পরের দিনই টম, অ্যাডলফ এবং আরো পাঁচ-ছয় জন ক্রীতদাসদাসীকে সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে নিলামের জন্যে ক্রীতদাস রাখবার গুদামঘরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং নিলাম শুরু না হওয়া পর্যন্ত এখানেই এদেরকে অপেক্ষা করতে হবে।

চব্বিশ

ক্রীতদাস গুদামঘর

ক্রীতদাস-দাসী জমা রাখার গুদামঘরের বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে পাঠকের মনকে আর ভারাক্রান্ত করে তুলতে চাই না। তবে গুদামঘরের তুলনায় নিলামের জায়গাটা অনেক বেশি সুন্দর। চমৎকার একটা গম্বুজের নিচে, মর্মর পাথর-বাঁধানো প্রকাণ্ড চত্বরে নানা দেশ থেকে আসা বহু লোকের সমাগম হয়েছে। পর পর দুটো সারিতে বিপরীতমুখী বসে থাকা ক্রীতদাস-দাসীদের ঘিরে ক্রেতারা ঘুরছে, পণ্যগুলিকে যাচাই করে দেখছে, মনে মনে হিসেব করছে কিংবা চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে ইংরেজি আর ফরাসিতে পরিচিত সহব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনা করছে। এ ছাড়া আরো এক ধরনের লোক রয়েছে, যারা কিনুক না কিনুক, সময় কাটানো আর মজা লোটার জন্যেই ভিড় জমিয়েছে, যারা ক্রীতদাসের চাইতে ঘোড়ার গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করতেই বেশি ভালোবাসে।

টম, অ্যাডলফ আর সেন্ট ক্লেয়ারের অন্যান্য চাকর-বাকররা যেখানে রয়েছে, সেখানেই ভিড় জমেছে সবচাইতে বেশি। ওই দলটার সঙ্গে সুসান আর এমিলিন নামে অন্য একটি পরিবার থেকে আসা মা-মেয়েও রয়েছে। দুজনকেই বেশ ভদ্র, সুন্দর দেখতে, বয়সেও অল্প।

চশমার ফাঁক দিয়ে অ্যাডলফকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাকপরা একজন তরুণের কাঁধ চাপড়ে বয়স্ক এক ভদ্রলোক হঠাৎ উল্লাসে বলে উঠলেন, 'আরে, অ্যাডলফ যে, কী ব্যাপার, এখানে আবার কী মনে করে?'

তরুণ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'ঘরের কাজের জন্যে আমার একজন চাকর দরকার। মিস্টার সেন্ট ক্লেয়ারের চাকর-বাকরদের নিলাম করা হচ্ছে শুনে ভাবলাম একবার দেখে আসি ...'

তরুণের কথা শুনে ভদ্রলোক চোখ কপালে তুললেন। 'তুমি কি পাগল হলে নাকি! সেন্ট ক্লেয়ারের লোকজনদের কিনতে যাবে কোন দুঃখে? এক-একটা কুড়ের বেহদ্দ!'

শোভন ভঙ্গিতে তরুণ ঠোঁট চেপে মুচকি মুচকি হাসল। 'আমি জানি। কিন্তু ওরা তো আর জানে না কার পাল্লায় পড়ছে। দুদিনেই বাছাধনদের টের পাইয়ে দেব কত ধানে কত চাল।' অ্যাডলফকে দেখিয়ে তরুণ বলল, 'ওই লোকটার দেহের গঠন আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। ভাবছি ওটাকেই কিনব।'

অলক্ষে টম প্রতিটা ক্রেতার মুখই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল যদি ওদের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পায়, যাকে সে তার মনিব হিসেবে ভাবতে পারে। কিন্তু ওদের মধ্যে সে একজন সেন্ট ক্লেয়ারকেও দেখতে পেল না।

বেঁটের ওপর, প্রশস্ত বুক, অত্যন্ত বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক, যাকে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় এই ব্যবসায় রীতিমতো পোড়খাওয়া মানুষ, কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসছে এবং প্রতিটা ক্রীতদাসকেই অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করছে। লোকটার পরনে নোংরা পাৎলুন আর গায়ে ডোরা-কাটা শার্ট, বুকের কাছে বোতামগুলো সব খোলা। লোকটাকে দেখামাত্র টম মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠল এবং ধীরে ধীরে লোকটা যতই তার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল, টমের আতঙ্কের মাত্রা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। বেঁটে হলেও লোকটা নিঃসন্দেহে অমিত শক্তির অধিকারী। বুলেটের মতো নিরেট গোল মাথা, ধূসর দুটো চোখ খসখসে ঝাঁকড়া ভ্রূ, মাথার চুলগুলো এলোমেলো আর খাড়া খাড়া। বিরাট রুক্ষ মুখ, বলিষ্ঠ লোমশ হাতের নখগুলো বড় বড় আর বিশ্রী রকমের নোংরা।

টমকে দেখেই লোকটা মুহূর্তেই জন্যে থমকে দাঁড়াল। তারপর মুখ ফাঁক করে দাঁতগুলো দেখার পর হঠাৎ টমের চোয়াল চেপে ধরল। পেশিগুলো টিপে পরীক্ষা করে দেখাবার জন্যে টমকে জামার আস্তিন গোটাতে হলো। এমন কী পেছন ফিরিয়ে দাঁড় করিয়ে পদক্ষেপ পরীক্ষা করার জন্যে টমকে দিয়ে লাফও দেওয়াল। সব শেষে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় মানুষ হয়েছিস?'

'কেন্টাকিতে।'

'কী কাজ করতি?'

'মনিবের খামারবাড়ি দেখাশোনা করতাম।'

'হুঁ, দেখে আমারও তাই মনে হয়েছে।'

তামাক-পাতা চিবানো বেশ খানিকটা থুতু ফেলে লোকটা মা আর মেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মার দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে হঠাৎ লোমশ হাত বাড়িয়ে খপ করে মেয়েটাকে ধরে টেনে টেনে নিয়ে এল নিজের কাছে। বয়সে এমিলিনিকে নিতান্ত কিশোরীই বলা চলে, তবু ওর কাঁধ, বুক, হাত ভালো করে টিপে টিপে পরীক্ষা করে দেখল, তারপর নিতান্ত হেলা ভরেই ঠেলে দিল মার দিকে।

লোকটার অমন কদাকার চেহারা দেখে এমিলিন এমনিতেই ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল, এবার যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল। আর ঠিক তখনই শোনা গেল জোরে জোরে হাতুড়ি পেটানোর শব্দ:

'চুপ চুপ ... সবাই চুপ কর!'

পরক্ষণেই নিলামের হাঁক-ডাক শুরু হয়ে গেল।

অ্যাডলফ চড়া দামে বিক্রি হয়ে গেল এবং সুন্দর দেখতে সেই তরুণই তাকে কিনে নিল। সেন্ট ক্লেয়ারের অন্যান্য চাকর-বাকরদেরও বিভিন্ন ক্রেতারা কিনে নিল। বাকি ছিল কেবল টম।

নিলামদার তাকে বলল, 'এই যে, শুনছ? এবার তুমি ওঠ।'

কাঠের পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে টম উদ্বিগ্ন চোখে চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু চিৎকার-চেঁচামেচি আর জটপাকানো একটা ভিড় ছাড়া আলাদা করে সে আর কিছুই উপলব্ধি করতে পারল না। নিলামদার ফরাসি আর ইংরেজিতে তার গুণ বর্ণনা করে নিলাম ডাকতে শুরু করল এবং শুধু শেষের '... ডলার' শব্দগুলো টমের কানে এসে পৌঁছতে লাগল। ডাক শুরু হবার অল্পক্ষণের মধ্যে শেষ হাতুড়ির ঘা শোনা গেল। নিলামদার টমের সর্বোচ্চ দাম এবং মনিবের নাম ঘোষণা করে দিল।

কাঠের পাটাতন থেকে ঠেলে নামিয়ে দিতেই দেখা গেল বুলেটের মতো নিরেট মাথা, কদাকার দেখতে সেই বেঁটে লোকটাই টমের মনিব। লোমশ হাতে টমের কাঁধটা চেপে ধরে রুক্ষস্বরে সে বলল, 'এই, এপাশে সরে দাঁড়া!'

টম স্পষ্ট করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার হাতুড়ি পিটিয়ে নিলাম ডাকা শুরু হলো ... ফরাসি আর ইংরেজি ভাষায় শোনা গেল সুসানের গুণ বর্ণনা করতে। শেষ হাতুড়ির শব্দে সুসানও বিক্রি হয়ে গেল। পাটাতন থেকে নেমে দাঁড়িয়েই ও মেয়েকে খুঁজল। এমিলিন হাত বাড়িয়ে মাকে আঁকড়ে ধরল। বয়স্ক সেই ভদ্রলোক, যিনি মাকে কিনলেন, বেদনাকাতর চোখে তাকাল তাঁর মুখের দিকে।

সুসান মিনতি করল, 'স্যার, দয়া করে আপনি আমার মেয়েকেও কিনে নিন! ও খুব ভালো আর অসম্ভব কাজের ...'

'পারলে আমি নিজেই খুশি হতাম', ভদ্রলোক সহানুভূতির সঙ্গেই বললেন, 'কিন্তু আমার সাধ্যে কুলোবে বলে মনে হচ্ছে না। তবু দেখি একবার চেষ্টা করে ...'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই এমিলিনের ডাক শুরু হয়ে গেল। লজ্জায় বেদনায় ওর চিবুকের পাশ দুটো আরক্তিম হয়ে উঠেছে, চোখের পাতায় ফুটে উঠেছে ভয়-চকিত একটা আর্তি। মুহূর্তের জন্যে সুসানের মনে হলো মেয়েকে বুঝি এর চাইতে সুন্দর আর কোনোদিনও দেখায় নি।'

বয়স্ক ভদ্রলোক আন্তরিকভাবেই চেষ্টা করেছিলেন এমিলিনকে কিনে নেবার, কিন্তু দেখলেন মেয়েটির দাম তাঁর সাধ্যকে অতিক্রম করে চলে গেছে। তাঁর প্রতিপক্ষ, বুলেটের মতো নিরেট মাথা সেই লোকটার জেদের কাছে তাঁর হার না মেনে কোনো উপায় ছিল না। অবশেষে কদাকার দেখতে সেই বেঁটে লোকটাই এমিলিনকে কিনে নিল।

লোকটার নাম সাইমন লেগ্রি। রেড নদীর ধারে তার তুলো চাষের আবাদ আছে। টম আর অন্য দুজন ক্রীতদাসের সঙ্গে এমিলিনকে নিয়ে লেগ্রি জাহাজঘাটের পথ ধরল।

মা আর মেয়ে। দুজনেই কাঁদছে, নিলামে এ তো হামেশাই দেখা যায়। তবু বয়স্ক ভদ্রলোক মনে মনে অনুতপ্ত না হয়ে পারলেন না। সুসানকে নিয়ে তিনি পাড়ি দিলেন অন্য পথে।

পঁচিশ

পাড়ি

রেড নদীর ওপর দিয়ে একখানা ছোট স্টিমার ভেসে চলেছে। তারই নিচের ডেকে অপরিচ্ছন্ন একটা প্রান্তে টম বসে রয়েছে। তার হাতে পায়ে বাঁধা রয়েছে লোহার শেকল। লোহার শেকলের চাইতেও ভারি বোঝা যেন চেপে বসেছে তার অন্তরে। তার ভাগ্যের আকাশ থেকে চাঁদ আর প্রতিটা তারা যেন উধাও হয়ে গেছে, কেবল ঢেকে রয়েছে গাঢ় মেঘ। তার দৃষ্টির সামনে দিয়ে এই যে নদীর পাড় আর গাছগাছালিগুলো চলে যাচ্ছে, এগুলো যেমন আর কোনোদিন ফিরে আসবে না, কেন্টাকিতে তার শান্তির নীড়, তার বউ আর ছেলেমেয়ে, শেলবিদের মতো সুন্দর মনিব, সেন্ট ক্লেয়ারের প্রাসাদপম অট্টালিকা, উদার-হৃদয় মনিব, স্বর্গীয় সুষমামাখা ইভার সুন্দর মুখ, দীর্ঘায়ত নীল চোখ আর উজ্জ্বল সোনালি চুল, তার একটুখানি সুখ আর অবকাশের সেই দুর্লভ মুহূর্তগুলো, চিরকালের মতো বিদায় নিয়ে চলে গেছে! তার পরিবর্তে সামনে যে কী আছে সে নিজেই জানে না।

টমের নতুন মনিব, সাইমন লেগ্রি, নিউ অর্লিয়েন্সের বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট আট জন ক্রীতদাস-দাসী কিনেছিল এবং তাদের সকলকে দুজন দুজন করে হাতকড়া পরিয়ে স্টীমারে তুলেছিল। ওদের গোছগাছ করে বসাতে না বসাতেই স্টীমার ছেড়ে দিল এবং তখনই লোকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ওদের দিকে ভালো করে তাকাবার অবকাশ পেল।

আট জনের মধ্যে টমের পোশাক-সবচাইতে ভালো আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পরনে একই রঙের সুট, গায়ে ইস্ত্রি-করা লিনেনের সাদা সার্ট, পায়ে ঝকঝকে পালিশ করা বুট। টম যে রীতিমতো স্বচ্ছল কোনো পরিবারের ছিল, টমকে দেখলে সেটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

অন্য সবার সঙ্গে নিতান্ত একটা করে পুঁটলি ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কিন্তু টমের সঙ্গে ছিল মাঝারি আকারের একটা তোরঙ্গ। তোরঙ্গের জিনিসপত্র সব পরীক্ষা করতে করতে লেগ্রি অতি পুরনো একটা পাৎলুন আর জীর্ণ একখানা কোট দেখতে পেল। আসলে এই পোশকটা টম আস্তাবলে কাজ করার সময়ে পরত। লেগ্রি এখন সেই জীর্ণ পোশাকটা বার করে তোরঙ্গের ওপর রাখল, তারপর টমকে বলল, 'এই, উঠে দাঁড়া।'

টম উঠে দাঁড়াল।

লেগ্রি তার হাতকড়াটা খুলে দিল।

'এই পোশাকটা খুলে, যা ওখানে গিয়ে ওই কোট-প্যান্টটা পরে আয়।'

কোনো কথা না বল টম কাঠের বাক্সগুলোর আড়ালে চলে গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই পোশাক পাল্টে আবার ফিরে এল।

'এবার বুট জোড়াটা খুলে ফ্যাল।'

টম তাই করল।

সাধারণত ক্রীতদাসদের যা বরাদ্দ, সেইরকম একজোড়া শক্ত, জীর্ণ জুতো ছুড়ে দিয়ে লেগ্রি বলল, 'এ দুটো পরে নে।'

এতটুকুও দ্বিরুক্তি না করে টম জুতোজোড়া পরে নিল। তার একটাই মাত্র সান্ত্বনা, পোশাক পাল্টাবার সময় সে তার অতিপ্রিয় বাইবেলটা পকেটে পুরে নিতে পেরেছিল।

লেগ্রি আবার তার হাতে হাতকড়াটা পরিয়ে দিল। এবার সে টমের প্রথম কোটের পকেটগুলো হাতড়ে দেখতে লাগল। প্রথমেই সে সিল্কের সুন্দর রুমালটা নিল নিজের পকেটে। টমের পকেট থেকে পাওয়া অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস, একসময় যেগুলো ইভাকে বিপুল আনন্দ দিত, লেগ্রি সেগুলো টান মেরে ছুড়ে ফেলে দিল নদীতে।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে টম তার প্রার্থনাসংগীত বইখানা বার করে নিতে ভুলে গিয়েছিল, লেগ্রি সেখানা উল্টে-পাল্টে দেখল।

'হুঁ! ধার্মিক! ... তার মানে তুই গির্জায় যাস?'

'হ্যাঁ, হুঁজুর।'

'আমার ওখানে হই-হল্লা, প্রার্থনা, গান গাওয়া ওসব কিছু চলবে না। মন দিয়ে শুনে রাখ', মেঝেতে পা ঠুকে, ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ চোখে টমের দিকে তাকিয়ে লেগ্রি বলল, 'এখন থেকে আমিই তোর গির্জা! আমি যা বলব, তাই শুনবি। কী বললাম, বুঝতে পেরেছিস?

টমের বুকের অতল থেকে কেমন যেন আর্তস্বরে চিৎকার উঠল, 'না!' কিন্তু সাইমন কোনো কণ্ঠস্বর শুনতে পেল না, কেননা সেই কণ্ঠস্বর একমাত্র অন্তর্যামী ছাড়া আর কারো পক্ষেই শোনা সম্ভব ছিল না।

নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকা টমের দিকে পলকের জন্যে তাকিয়ে থেকে লেগ্রি তোরঙ্গটা নিয়ে স্টিমারের সামনের দিকে চলে গেল। সেখানে গিয়ে 'ভদ্র হতে চাওয়া' নিগ্রোটার জামা-কাপড় থেকে শুরু করে যা কিছু ছিল, এমন কী তোরঙ্গটা পর্যন্তও নাবিকদের মধ্যে নিলামে বিক্রি করে দিল। বলা বাহুল্য, বিক্রয়-সমস্ত অর্থই সে পকেটে রাখল। তারপর টমের কাছে ফিরে এসে বলল, 'এখন থেকে মিছেমিছি ওই ভারী বোঝাটা বয়ে বেড়াবার কোনো দরকার নেই। তোকে যে পোশাকটা দিয়েছি ওটারই যত্ন নিস। আমার ওখানে কোনো নিগ্রোই একটা পোশাক না ছিঁড়লে অন্য পোশাক পায় না মনে রাখিস, তোকেও এই একটা পোশাকে একবছর চালাতে হবে।'

টমের অদূরে, দলের অন্যান্যদের মধ্যে এমিলিন তখন বিষণ্ণমুখে চুপচাপ বসে ছিল, সম্ভবত মার কথা ভাবতে ভাবতেই তার সুন্দর চোখ-দুটো জলে ভরে উঠেছিল। ওর দিকে চোখ পড়তেই লেগ্রি ধমকে উঠল, 'কি রে, অমন মুখ গোমড়া করে বসে আছিস কেন?'

লেগ্রির কদাকার মুখখানার দিকে তাকাতেই এমিলিন যেন ভয়ে আঁতকে উঠল। সম্ভবত সেটা লক্ষ করেই লেগ্রি আগের চাইতে আরো ভয়ঙ্কর গলায় হুঙ্কার ছাড়ল, 'এই ছুঁড়ি, কানে শুনতে পাচ্ছিস না? আমি যখন কথা বলব, সঙ্গে সঙ্গে হাসি মুখে উঠে দাঁড়াবি। কি রে, কথাটা কানে গেছে?'

ভয় দেখানো সত্ত্বেও এমিলিন সেই মুহূর্তে কোনো জবাব দিতে পারল না।

দুপা পিছিয়ে এসে, ড্যাব-ড্যাব চোখ দুটোকে আরো বাইরের দিকে ঠেলে বার করে লেগ্রি হেঁড়ে গলায় বলে উঠল, 'তোদের সবাইকে আমি আগে থেকে সাবধান করে রাখছি, কেউ যদি আমার মুখের ওপর একবারও ... করেছিস তো এক ঘুঁষিতে চোয়ালের হাড় পর্যন্ত গুঁড়িয়ে দেব। এই যে আমার ঘুঁষিটা দেখছিস, নিগ্রোদের মেরে মেরে এটা একেবারে কামারের হাতুড়ির মতো শক্ত হয়ে গেছে। আমি এখনো পর্যন্ত কোনো নিগ্রো দেখি নি, যে আমার একখানা ঘুঁষি খেয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে নি। বুঝতেই পারছিস, আমার মধ্যে দয়ামায়া বলে কোনো পদার্থ নেই। আমি যখনই কথা বলব, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াবি, যখনই কিছু করতে বলব, সঙ্গে সঙ্গে করবি। তাহলেই দেখবি আমার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবি। আর আমার সঙ্গে চালাকি করার চেষ্টা করলে বুঝতে পারবি, তোরও আয়ু ফুরিয়ে এসেছে!'

কথাগুলো বলে লেগ্রি বড় বড় পা ফেলে ওপরের ডেকে চলে গেল। বিহ্বল আতঙ্কের সেই মুহূর্তে কেউ কোনো কথা বলতে পারল না।

অনড় দুঃখের বোঝা বুকে নিয়ে স্টিমার রেড নদীর উচ্ছৃঙ্খল ঘোলা জলের স্রোত কাটিয়ে তরতর করে ছুটে চলেছে, বিমর্ষ যাত্রীরা ম্লানচোখে তাকিয়ে রয়েছে লালচে কাদাভরা নদীর খাড়াই তটের দিকে।

অবশেষে স্টিমার ছোট একটা শহরের ঘাটে এসে ভিড়ল। লেগ্রি তার মালপত্তর নিয়ে নেমে গেল।

ছাব্বিশ

আঁস্তাকুড়

বিশ্রী দেখতে নড়বড়ে একটা ওয়াগন ধুলোয় ভরা আরো কুৎসিত একটা পথ ধরে, যেন পরম ক্লান্তিভরে, ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। ওয়াগনের ভেতরে টম আর তার শৃঙ্খলিত

সঙ্গীরা নতমুখে চুপচাপ বসে রয়েছে। সাইমন লেগ্রি বসেছে কোচোয়ানের পাশে, সামনের আসনে।

পথটা আসলে পরিত্যক্ত আর দুর্গম, পাইনের নির্জন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে গেছে। পাতায় পাতায় জেগে উঠছে বাতাসের করুণ মর্মর। কোথাও কোথাও সাইপ্রেসের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব গুঁড়িগুলো জলাভূমির ওপরে একেবারে হেলে পড়েছে আর তাদের গায়ে গজিয়ে উঠেছে কুৎসিত দেখতে কালো কালো সব ছত্রাক। কোথাও কোথাও বা হেলেপড়া গা আর তার ভাঙা ডালপালার মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে জঘন্য মোকাসিন সাপগুলো।

পথটা এমনই বিপদসঙ্কুল আর নির্জন যে বেশি পয়সা দিলেও অনেকে গাড়ি নিয়ে আসতে চায় না। পৃথিবীর নির্জনতম কোনো প্রান্তে এসে পড়ার আশঙ্কায় ক্রীতদাস-দাসীদের ভারাক্রান্ত মনগুলো নতুন করে আরো গাঢ় বিষণ্ণতায় ভরে উঠল। যদিও লেগ্রি মাঝে মাঝেই তার পকেট থেকে সুরার পাত্রটা বার করে গলায় ঢালছিল আর ওদের অবদমিত মনগুলোকে চাঙ্গা করে তোলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তাতে খুব বেশি ফল হলো না।

গাড়িটা এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গে লেগ্রি যত বেশি উল্লসিত হয়ে উঠে, শৃঙ্খলিত ক্রীতদাস-দাসীরা যেন ততই ঝিমিয়ে পড়ে।

লেগ্রি বাজখাঁই গলায় হেঁকে ওঠে, 'কি রে, তোরা সব অমন পেঁচার মতো মুখ করে বসে আছিস কেন ... গানটান কর।'

বিশেষ কাউকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলা হয় নি বলে কেউই তেমন আর গান করল না। তাছাড়া গান গাওয়ার মানসিকতাও কারো ছিল না।

একটু চুপ করে থাকার পর লেগ্রি রুক্ষ আঙুলে এমিলিনের কানের লতিটা আলতো করে ধরে জিজ্ঞেস কর, 'কি রে, তুই কানে কিছু পরিস না?'

চকিতে আঁতকে উঠে এমিলিন ছোট্ট করে জবাব দিল, 'না, স্যার!'

'ঠিক আছে, তুই যদি ভালো হয়ে থাকিস, তোকে একজোড়া মাকড়ি কিনে দেব।' পাশের মহিলাটিকে জড়িয়ে ধরে এমিলিনকে থরথর করে কাঁপতে দেখে সাইমন হো হো করে হেসে উঠল। 'আরে না না, আমাকে অত ভয় পাবার কিছু নেই। ভালোভাবে থাকলে আমি কাউকে কিচ্ছু বলি না। তুই যদি ভদ্র হয়ে থাকিস, তোকে আমি শক্ত কাজ দেব না, আমার কাছেই বেশিক্ষণ কাটাতে পারবি।'

এইভাবে চলতে চলতে লেগ্রি একসময় এমন মাতাল হয়ে পড়ল যে নিজেই হেঁড়ে গলায় গান ধরল। আরো কিছুক্ষণ চলার পর দূর থেকে চোখে পড়ল লেগ্রির তুলো চাষের আবাদ। আবাদটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে। আগে এটা ছিল শৌখিন এক ভদ্রলোকের, যিনি নিজে সবকিছু দেখাশোনা করতেন। কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ দেউলিয়া অবস্থায় মারা যান এবং লেগ্রি প্রায় জলের দামে সম্পত্তিটা কিনে নেয়। আজ যত্নের অভাবে আবাদটার হতকুৎসিত চেহারা স্পষ্টই চোখে পড়ে।

একসময় আবাদসংলগ্ন বিশাল বাড়িটার সামনে ছিল মসৃণ সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ একটা লন, লনের চারদিক ঘিরে ফল আর ফুলের বাগান, মাঝে মাঝে সুন্দর সুন্দর সব নিকুঞ্জ আর কারুকার্য—করা থামের গায়ে মধুচক্র। কিন্তু এখন আর স সৌন্দর্য নেই। সারা বাগান আগাছা আর ঝোপঝাড়ে ভরে গেছে, লনের এখানে ওখানে ভাঙা টব, বালতি আর গামলার স্তূপ, কারুকার্য-করা থামগুলো এখন ঘোড়া বাঁধার খুটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়, পাথর-বাঁধানো ফুলের টবগুলোর জঞ্জালের স্তূপ, শুকিয়ে গেছে ফোয়ারার জলধারা।

ইটের থামওয়ালা দোতলা বাড়িটা বেশ বড়ই, চারদিকে চওড়া বারান্দা। প্রতিটা ঘরের দরজা খুললেই এক বারান্দায় আসা যায়। কিন্তু বাড়িটার এখন জীর্ণ দশা। কোথাও পলেস্তরা খসে গেছে, কোনো জানলার খড়খড়ি নেই, কোনোটার আবার পাল্লা খুলে গেছে, কোনোটা বা ঝুলছে একটা মাত্র কব্জার ওপর। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ওটা বুঝি একটা ভুতুড়ে বাড়ি এবং এর ত্রিসীমানাতেও কেউ কখনো ঘেঁষে না।

ঝাঁকড়া চায়নাবীথির নিচ দিয়ে নুড়ি-বিছানো চওড়া পথ ধরে গাড়িটা ধীরে ধীরে বাড়িটার দিকে এগিয়ে চলল। পথের দুধারে পড়ে রয়েছে ভাঙা তক্তা, খড়ের টুকরো কাঠের পিপে, টিনের বাক্স। চাকার শব্দে কদাকার দেখতে তিন চারটে কুকুর হঠাৎ কোত্থেকে ভয়ঙ্কর রাগে গর্জন করতে করতে টম আর তার সঙ্গীদের দিকে ছুটে এল। জীর্ণ পোশাকপরা কয়েকজন নিগ্রোকে অতিকষ্টে তাদের সামলে রাখতে হলো।

কুকুরগুলোকে আদর করতে করতে লেগ্রি টমদের দিকে ফিরে বলল, 'কিরে, চেহারাগুলো দেখেছিস একবার? পালানো নিগ্রোদের খুঁজে বার করার জন্যেই এদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ভুলেও যদি কখনো সে চেষ্টা করিস তো ছিঁড়ে একেবারে টুকরো টুকরো করে ফেলবে। সাবধান! কথাটা মনে থাকে যেন!' তারপর কানাবিহীন টুপি মাথায় একজন নিগ্রোর দিকে ফিরে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার সাম্বো, এদিককার খবর কী?'

'ভালো, স্যার।'

'আর কুইম্বো', অন্য একজন নিগ্রোকে উদ্দেশ্য করে লেগ্রি বলল, 'তোকে যা যা করতে বলেছিলাম, করেছিস?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

সাম্বো আর কুইম্বো, এই দুজন ক্রীতদাসই সাধারণত লেগ্রির তুলোর আবাদ দেখাশোনা করা থেকে শুরু করে আর যা কিছু দুষ্কর্ম আছে তার সবগুলোই করে। নিজের শিকারি বুলডগগুলোর মতো লেগ্রি এদেরকেও একটু একটু করে কীভাবে নিষ্ঠুর আর বর্বর হয়ে উঠতে হয় তার শিক্ষা দিয়েছে এবং দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে লেগ্রির মতো এদের হৃদয়ও হয়ে উঠেছে কঠিন আর বিবেকহীন। কৃষ্ণাঙ্গ হয়েও স্বজাতির প্রতি এদের ব্যবহার এখন একজন শ্বেতাঙ্গ সর্দার কিংবা বন্য কোনো পশুর চাইতেও হিংস্র। কিন্তু যেহেতু অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গের মতো লেগ্রি বিশ্বাস করে, ক্রীতদাসেরা অকৃতজ্ঞ এবং সুযোগ পেলেই বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তাই দুষ্কর্মের অংশীদার হওয়া সত্ত্বেও লেগ্রি এদেরকেও বিশ্বাস করে না। এর চাইতেও বড় কথা, সাম্বো আর কুইম্বো, এরা নিজেরাই পরস্পরকে বিশ্বাস

করে না। বাইরে গলায় গলায় ভাব থাকলেও এরা পরস্পরকে ঘৃণা করে এবং লেগ্রির কাছে গোপনে পরস্পরের নামে অভিযোগ করে। লেগ্রি নিজেও তাই চায়, কেননা এতে তারই লাভ সবচাইতে বেশি। বাড়ি, বাড়ির বাইরে আবাদের যা কিছু খবরাখবর সে এই দুজনের মাধ্যমেই পেয়ে যায়।

লেগ্রির দুপাশে দৈত্যের মতো বিশাল চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিশ্বস্ত দুজন ক্রীতদাসের ঝুলেপড়া চোয়াল, বিশ্রী মুখ, ঘৃণা আর অবজ্ঞায় মেশা চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হলো এ পরিবেশে ওরাই সবচাইতে কুৎসিত দুটো জীব।

'সাম্বো, এদের বাসায় নিয়ে যা। আর ...' এমিলিনের সঙ্গে বাঁধা মহিলাটিকে খুলে সাম্বোর দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এটা তোর জন্যে।'

মহিলাটি সংকোচে একেবারে কুঁকড়ে উঠল। করুণস্বরে বলল, 'স্যার, নিউ অর্লিয়েন্সে আমার স্বামী আর ছেলেমেয়ে আছে!'

'তা হোক, তুই ওর সঙ্গে থাকবি।'

'কিন্তু, স্যার।'

চাবুক উঁচিয়ে লেগ্রি হুঙ্কার ছাড়ল, 'ফের কথা!' তারপর এমিলিনের দিকে ফিরে বলল, 'তুই আয় আমার সঙ্গে।'

টম আগেই নজর করেছিল, ওপরের তলার জানলা থেকে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা সবকিছু লক্ষ করছিল, এমিলিনকে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করার সময় মহিলাটি লেগ্রিকে দ্রুত কী যেন বলল। তার জবাবে লেগ্রি ধমকে উঠল, 'তুমি চুপ করে থাকো। আমার যা খুশি তাই করব।'

সাম্বোর সঙ্গে যেতে হলো বলে টম আর কিছু শুনতে পেল না।

লেগ্রির বাড়ি থেকে ক্রীতদাস-দাসীদের আস্তানাগুলো অনেকখানি দূর, আবাদভূমির এক অংশে। দুধারে সারি সারি চালা, মাঝখানে নোংরা একটা পথ। ওখানকার অবস্থা দেখে টমের মন দমে গেল। মনে মনে সে আশা করছিল নিজের জন্যে একখানা আলাদা চালা পাবে। চালাখানা যেমনই হোক না কেন, নিজে তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নেবে, সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় নিজের নিভৃত আবাসে ফিরে এসে সে বাইবেলখানা খুলে বসতে পারবে। কিন্তু তার পরিবর্তে টম দেখল চালার ভেতরে কোথাও কোনো আসবাব নেই, কেবল মাটির ওপরে খড় বিছানো, অজস্র পায়ের চলাফেরায় যা একেবারে নোংরা হয়ে রয়েছে।

সাম্বোকে টম জিজ্ঞেস করল, 'আমার কোনটা?'

'জানি না। এত নিগারের আমদানি হয়েছে যে এক-একটা চালাতে অনেককে একসঙ্গে থাকতে হবে বলে আমার মনে হচ্ছে।'

সন্ধ্যের পর ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে, জীর্ণ পোশাকে ক্রীতদাসেরা ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসতে শুরু করল। নারী আর পুরুষ উভয়দেরই মুখের দিকে টম আগ্রহ ভরে তাকিয়ে দেখতে লাগল, যদি বন্ধুত্ব করার মতো একটা মুখও খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু ওরা সবাই নিভে যাওয়া এক-একটা ছায়ার মতো, মনুষ্যত্বের শেষ কণাটুকুও যেন নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই দল বেঁধে ওদের হাজির হতে হয় মাঠে। তুলো সংগ্রহের কাজটা যে খুব কঠিন, তা নয়। কিন্তু কাঠ-ফাটা রোদে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে যাওয়া সত্যিই ক্লান্তিকর আর অসম্ভব একঘেয়ে। এমনিভাবে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ-ভালোবাসাবিহীন একটা যন্ত্রের মতো কাজ করতে করতে এরা এমনই যান্ত্রিক হয়ে গেছে যে স্বার্থপরতা ছাড়া ওদের কাছ থেকে ভালো কিছু আশা করাটাই অর্থহীন। জীর্ণবাস, শীর্ণ কঙ্কালসার চেহারায় মেয়েদের আর আলাদা করে চেনাই যায় না।

দিনের শেষে ঘরে ফিরে এসেও ওদের কাজ রয়েছে। প্রত্যেককে যাঁতায় গম ভেঙে রুটি সেঁকে নিজের খাবার নিজেদেরকেই তৈরি করে নিতে হবে। তাও সে আহার্যের পরিমাণ আবার যথেষ্ট নয়, কিন্তু কোনো উপায় নেই। লোকের তুলনায় যাঁতার সংখ্যাও এত কম যে, যারা সবল, দুর্বল আর মেয়েদের ঠেলে সরিয়ে দিয়ে নিজেরা আগে গম ভেঙে নেয়। দুর্বলরা সুযোগ পায় সবার শেষে।

'এই নে, তোর গম।' এমিলিনের সঙ্গে সেই মহিলাটির দিকে গমের ছোট একটা থলি ছুড়ে দিয়ে সাম্বো বলল। 'কী নাম তোর?'

'লুসি।'

'বাঃ, চেহারার তুলনায় তোর নামটা তো বেশ ভালোই। তা তুই যখন আমার সঙ্গেই থাকবি, তখন আমার গমটাও ভেঙে খাবারটা বানিয়ে রাখিস।'

'না, কখনো না!' হতাশার মধ্যেও দুঃসাহসী হয়ে লুসি তীব্র প্রতিবাদ করল। 'আমি তোমার সঙ্গে কোনোদিনও থাকব না। চলে যাও এখান থেকে!'

'এক লাথিতে শেষ করে দেব! পা উঁচিয়ে সাম্বো বিশ্রীভাবে ভয় দেখাল।

'ইচ্ছে করলে মেরে ফেলতে পার। তবু আমি তোমার সঙ্গে থাকব না, কখনো না!'

কুইম্বো তখন যাঁতার সামনে অপেক্ষমাণ দুই-তিন জন দুর্বল মহিলাকে গম ভাগ করে দিচ্ছিল। সাম্বোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সাম্বো, আমি কিন্তু মনিবকে সব বলে দেব ...'

'আমিও বলব, তুমি মেয়েদের যাঁতা-ঘরে যেতে দাও নি', সাম্বো বলল, 'তুমি ওদের নিজের ঘরে আটকে রেখেছিলে ...'

সারাদিনের পথশ্রমের ক্লান্তিতে আর ক্ষুধায় টমের তখন প্রায় মূর্ছা যাবার অবস্থা। কুইম্বো তার দিকে গমের একটা থলি ছুড়ে দিয়ে বলল, 'এই নিগার, নে। এই দিয়ে তোকে সারা সপ্তা চালাতে হবে।'

থলেটা কুড়িয়ে নিয়ে টম অপেক্ষা করল। একটু বেশি রাত্রে সবার গম ভাঙা হয়ে যাবার পর নিজের জন্যে গম ভাঙতে গিয়ে দেখল দুজন বৃদ্ধা তখনো তাদের গম ভেঙে উঠতে পারে নি। সে ওদের গমগুলো ভেঙে দিল, তারপর নিজের গম ভাঙতে বসল। কাজটা নিতান্ত তুচ্ছ হলেও, ওদের অন্তর কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। যদিও এখানে নিজের রুটি নিজেকেই বানিয়ে নিতে হয়, তবু বৃদ্ধা দুজন স্বেচ্ছায় টমের জন্যে রুটি বানিয়ে দিতে লাগল আর টম আগুনের ধারে বসে তার পকেট থেকে বাইবেলখানা বার করল।

একজন বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করল, 'ওটা কী?'

'বাইবেল।'

হা, ঈশ্বর! কেন্টাকিতে যখন ছিলাম, তারপর থেকে এ জিনিসটা আমি আর কখনো চোখেও দেখি নি।'

আগ্রহভরে টম বৃদ্ধার মুখের দিকে তাকাল। 'তুমি কেন্টাকিতেই মানুষ হয়েছ বুঝি?'

'হ্যাঁ, বেশ ভদ্র একটা পরিবারেই ছিলাম!' বৃদ্ধা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'কিন্তু কখনো স্বপ্নেও ভাবি নি এরকম একটা জঘন্য পরিবেশে এসে পড়তে হবে!'

গভীর সহানুভূতির সঙ্গে টম আস্তে আস্তে বলল, 'হ্যাঁ, সত্যিই এটা দুর্ভাগ্যজনক!'

'কেন্টাকিতে আমি মিসিসকে বহুবার এই বইটা পড়তে শুনেছি। কিন্তু এখানে চিৎকার চেঁচামেচি আর অসভ্য গালাগালি ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।'

টম বলল, 'তোমরা যদি চাও, আমি তোমাদের খানিকটা পড়ে শোনাতে পারি।'

'হ্যাঁ, পড়ো।'

টম পড়ে চলল, "শ্রমের ভারে তোমরা, যাহারা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত, আমার কাছে আইস; আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।"

'বাঃ, শব্দগুলো বেশ ভালো তো!' দ্বিতীয় বৃদ্ধা প্রশ্ন করল, 'কথাগুলো কে বলছে?'

টম ছোট্ট করে শুধু বলল, 'প্রভু।'

'প্রভু কোথায় থাকে যদি একবার জানতে পারতাম ...'

'প্রভু, সবখানে, এমন কী এখানেও রয়েছেন।'

'আমি জানি নেই', দ্বিতীয় বৃদ্ধা বলল, 'থাকলে আমাদের বিশ্রামের কথা কখনো বলত না।'

টম তর্ক করল না। একটু পরে বৃদ্ধারা নিজেদের চালায় চলে গেল বড় রান্না ঘরটায় টম চুপচাপ একা বসে রয়েছে। নিভে আসা আগুনের রক্তিম শিখাগুলো কাঁপছে তার মুখে।

সে জানে, আত্মপ্রত্যয়বিহীন সহজ সরল যে মানুষগুলো সারাটা জীবন পশুর মতো কেবল পরিশ্রম করেছে, মুখ বুঝে সহ্য করেছে দুঃখ বেদনা আর অত্যাচার, ভবিষ্যৎ যাদের নিঃসীম হতাশায় ভরা, একদিনে তাদেরকে কোনোকিছু বিশ্বাস করানো অত সহজ নয়। তাদেরকে যে কেমন করে বোঝাবে, কেউ যদি ঈশ্বরের কাছে সাহায্য চায়, ঈশ্বর স্বেচ্ছায় তাঁর হাতটা বাড়িয়ে দেন!

হাত দুটো বুকের কাছে জড়িয়ে, বাইবেলখানা কোলের ওপর নিয়ে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে টম একসময় দেখল রূপালি মেঘের ফাঁকে সুন্দর গোল চাঁদ উঠেছে, যেন ঈশ্বর তারই দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন।

খাওয়া দাওয়া সেরে টম যখন তার জন্যে বরাদ্দ চালাটায় ফিরে এল দেখল খড়ের বিছানাতে জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে। বিশ্রী একটা দুর্গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে রয়েছে। তবু অসম্ভব ক্লান্ত থাকার জন্যে নোংরা কম্বলটা কোনোরকমে টেনে নিয়ে নিজেকে টান টান করে মেলে দিতেই সে ঘুমিয়ে পড়ল।

সাতাশ

নির্যাতন

খুব শিগগিরই টম অনুমান করে নিতে পারল কী ধরনের অবস্থার মধ্যে তাকে জীবনযাপন করতে হবে। চারদিকেই সে দেখল শুধু নোংরামি, কদর্যতা আর অত্যাচার। এখানকার সকলেরই জীবন দুঃখ, কান্না আর অসুস্থতায় ভরা। তবু সে মনে মনে ঠিক করল নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করবে আর ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবে। একমাত্র ঈশ্বরই পারেন তাকে আশার আলো দেখাতে, তাকে মুক্তি দিতে।

লেগ্রিও লক্ষ করল লোকটা অত্যন্ত কর্মঠ। যে কাজই দেওয়া হোক না কেন সব ব্যাপারে অসম্ভব দক্ষ ও বিশ্বস্ত। তাই লেগ্রি মনে মনে স্থির করল টমকেই তার কাজকর্ম তদারক করতে দেবে। বিশেষ প্রয়োজনে মাঝে মাঝে তাকে দুচারদিনের জন্যে বাইরে যেতে হয়। তখন আবাদ দেখাশোনার ভার টমের ওপর দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হতে পারবে। অন্যদিকে সে আবার মনে মনে টমকে ভয় করত। প্রচ্ছন্ন ঘৃণা আর বিদ্বেষে ভরে উঠত সারা মন। কেননা টম খাঁটি মানুষ, মহৎ তার হৃদয়। কারুর মনে সে কষ্ট দেয় না, কাউকে ঘৃণা করে না। তার চাইতেও বড় কথা, অন্যের দুঃখ দেখে সে নিজেই কষ্ট পায়। অথচ লেগ্রির স্বভাব ঠিক তার বিপরীত। মনে মনে সে সংকল্প করল, টমকে তার কাজের উপযুক্ত করে তুলবে। সে জন্যে প্রথমেই দরকার, টমের হৃদয়কে 'কঠিন' করে তোলা এবং সেই পদ্ধতির দিকেই সে ধীরে ধীরে এগোতে লাগল।

একদিন টম তুলো তুলে নিজের থলিতে ভরে রাখছিল, হঠাৎ দেখল লুসিও ঠিক তার পাশাপাশি তুলো তুলছে। কিন্তু ও এত দুর্বল আর অসুস্থ যে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই পারছে না। টম ধীরে ধীরে ওর পাশে সরে এসে নিজের থলি থেকে বেশ কিছু তুলো ওর থলিতে ভরে দিল।

আতঙ্ক মেশানো চোখে লুসি বলল, 'না না, দিও না! ওরা দেখতে পেলে আর রক্ষে রাখবে না।'

'অ্যাই, কি হচ্ছে কী?' হঠাৎ কোত্থেকে সাম্বো চাবুক দোলাতে দোলাতে খ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে এল। আসলে লুসির ওপর সাম্বোর রাগ ছিল সেই প্রথম দিন থেকে। তাই আড়াল থেকে সে সবসময় ওকে চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করত এবং কোনো ছুতো পেলেই তাকে নির্মমভাবে চাবুক মারত। এখন হাতে নাতে ধরতে পারায় সাম্বো রেগে একেবারে আগুন হয়ে উঠল। ভারী বুট দিয়ে সজোরে লাথি মারল লুসির পেটে, চাবুকের একটা ঘা বসিয়ে দিল টমের মুখে।

টম নীরবে আবার তার কাজ করতে লাগল। কিন্তু লুসি সহ্য করতে না পেরে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

'দাঁড়া, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া তোর আমি বার করে দিচ্ছি!' কোটের হাতা থেকে একটা পিন খুলে সাম্বো লুসির গায়ে ফুটিয়ে দিল।

'ওঠ, শিগগির ওঠ ... ভেবেছিস আমার সঙ্গে শয়তানি করে তুই পার পেয়ে যাবি?'

অসহ্য যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে লুসি চোখ মেলল, তারপর যেন অতিমানবিক একটা শক্তিতে লাফিয়ে উঠে আবার নিজের কাজ করতে লাগল।

বিশ্রীভাবে হাসতে হাসতে স ম্বো বলল, 'হ্যাঁ, যদি মরতে না চাস, ঠিকমতো কাজ করে যা।'

কাজ করার শক্তি কিন্তু লুসির ছিল না। সাম্বো চলে যেতেই টম তার তলিতে যত তুলো ছিল সব লুসির থলিতে ভরে দিল।

লুসি বাধা দিল। 'না না, আমাকে দিও না। জানতে পারলে ওরা তোমাকে কঠোর শাস্তি দেবে।'

'তোমার চাইতে আমি বরং সেটা বেশ সহ্য করতে পারব।' কথাটা বলেই টম আবার নিজের কাজে মন দিল।

বিকেল গড়িয়ে যখন সন্ধ্যে, ক্লান্ত শ্রান্ত মানুষের একটা মিছিল, মাথায় তুলোর বিশাল বিশাল সব গাঁটরি নিয়ে হাজির হলো লেগ্রির বার-বাড়িতে। এখানে প্রতিটা গাঁটরি ওজন করে তবে গুদামজাত করা হয়। একটা শ্লেটে প্রত্যেকের নামের পাশে লেগ্রি তার গাঁটরির ওজনটা লিখে রাখে। দাঁড়ি-পাল্লায় তোলা এবং নামানোর কাজে সাম্বোর কুইম্বো তাকে সাহায্য করে।

ক্লান্ত পায়ে এক-একজন ঘরে ঢুকছে আর মাপার পর লেগ্রি তার নামের পাশে ওজনটা টুকে রাখছে। টমের গাঁটরির ওজন পূর্বনির্ধারিত ওজনের সমান হওয়া সত্ত্বেও লেগ্রি তাকে অপেক্ষা করতে বলল। টমের মনে কেমন যেন খটকা লাগল। নিশ্চয়ই স্যাঙাতটা তার নামে মনিবের কান ভারি করেছে।

বোঝার ভারে একেবারে নুইয়ে পড়ে লুসি যখন ঘরে ঢুকল, টম উদ্বেগের সঙ্গে ওর ওজনটা লক্ষ করতে লাগল। নির্দিষ্ট ওজনের সমান হওয়া সত্ত্বেও লেগ্রি বিশ্রীভাবে খেঁকিয়ে উঠল, 'কি রে, আবার তুই কম তুলেছিস? সরে দাঁড়া, তোর মজা আমি টের পাওয়াচ্ছি!'

লুসি অস্ফুট আর্তনাদ করে একপাশে সরে দাঁড়াল।

সবার মাপা শেষ হবার পর লেগ্রি টমকে বলল, 'এদিকে আয়। তুই খুব ভালো করেই জানিস, সাধারণ কাজকর্ম করার জন্যে তোকে আমি কিনি নি। তোকে আমি সর্দার করব।

www.alorpathsala.org

আমি চাই তুই এখন থেকেই কাজ শুরু করে দে। ওই মেয়েটাকে নিয়ে গিয়ে চাবুক মার। আশা করি এতদিন দেখে দেখে কাজটা তুই ভালোই শিখেছিস।'

'না, হুজুর', বিনীত স্বরেই টম বলল, 'আমাকে ক্ষমা করবেন। ও কাজ আমি কখনো করি নি এবং করতে পারব না।'

'কী বললি, উল্লুক!' লেগ্রি সজোরে চাবুকের একটা ঘা কষিয়ে দিল টমের মুখে। 'আগে যে কাজ কখনো করিস নি, এখন তোকে সেই কাজ করতে হবে।'

টম কোনো জবাব দিল না। লেগ্রি তাতে আরো রেগে গিয়ে তাকে বেদম কিল চড় ঘুঁষি লাথি মারতে লাগল। শেষে এক সময়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'কী, এখনো বলবি পারব না?'

'হ্যাঁ, স্যার।' গালের ওপর থেকে রক্তের ধারা মুছতে মুছতে টম বলল। 'আমি খাটতে পারি, যত দিন বাঁচব আপনার জন্যে দিনরাত পরিশ্রম করে যাব। কিন্তু যে কাজ করা উচিত নয়, তা আমি কখনো করব না ... কোনোদিনও না!'

টমের সম্ভ্রম জড়ানো নম্রস্বরে লেগ্রি স্তম্ভিত হয়ে গেল। পরক্ষণেই মনিবের অহমিকাবোধ তাকে আবার জাগিয়ে তুলল। হাত পা নেড়ে বিশ্রীভাবে সে চিৎকার করে উঠল, 'কী উচিত-অনুচিত সেটা তোর কাছে শিখতে হবে? আমি মনিব, আমি তোকে যা বলব সেটাই তোর করা উচিত। তুই কি ভাবিস নিজে খুব ভদ্র হয়ে গেছিস! তোর কি মনে হয় মেয়েটাকে চাবুক মারা অন্যায়?'

'হ্যাঁ স্যার, মেয়েটা অসুস্থ আর দুর্বল। ওর প্রতি কোনো নিষ্ঠুর আচরণ আমি করতে পারব না। আপনি যদি আমাকে মেরে ফেলতে চান, মেরে ফেলুন। তবু আমি কারুর গায়ে হাত তুলব না। তার আগে আমার মৃত্যু হওয়া অনেক ভালো!'

ভয়ঙ্কর ঝড়ের আশঙ্কায় ঘরের ভেতরের সবাই তখন ভয়ে কাঁটা হয়ে রয়েছে। লেগ্রিও রাগে থরথর করে কাঁপছে, বড় বড় চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে। তবু হিংস্র পশু যেমন শিকারকে হত্যা করার আগে তাকে নিয়ে খেলে, লেগ্রি ঠিক সেই রকম নিজেকে সামলে রেখে বিদ্রূপভরে বলে উঠল, 'আমরা সব পাপী, আর উনিই একমাত্র ধার্মিক! উনি আমাদের নরক থেকে উদ্ধার করার জন্যে এসেছেন! হ্যাঁ রে উল্লুক, তুই কি জানিস না, বাইবেলে লেখা আছে : "ভৃত্যগণ, প্রভুর অনুগত হও?" আমিই তোর প্রভু। তোর জন্যে কি আমাকে গুনে গুনে ভালো কয়েক শো ডলার দিতে হয় নি?' বুটসহ একটা লাথি কষিয়ে লেগ্রি বলল, 'এখনো কি বলতে চাস, দেহ-মনে তুই আমার না?'

অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও টম শান্ত, স্থির। যেন ভেতরের ঐশ্বরিক একটা শক্তিতে সে বলীয়ান। রক্ত আর অশ্রুধারার মধ্যেই দীপ্তস্বরে সে বলল, 'না, হুজুর, দেহটা আপনার কিন্তু মনটা আপনার নয়। এটাকে আপনি এখনো কিনতে পারেন নি, কোনোদিন কিনতে পারবেনও না। এটার জন্যে যিনি মূল্য দিতে পারেন, তিনি বহুকাল আগেই কিনে রেখেছেন। আপনি আমাকে নিয়ে যা খুশি করুন না কেন, মনটার কোনো ক্ষতি করতে পারবেন না।'

'আচ্ছা, দেখি পারি কিনা! সাম্বো কুইম্বো, এই কুকুরটাকে নিয়ে গিয়ে এমন মার দে যাতে এক মাসের মধ্যে আর নড়তে না পারে।'

ভয়ঙ্কর দৈত্যের মতো দেখতে দুজন নিগ্রো দুপাশ থেকে এসে টমকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল। অদ্ভুত একটা জিঘাংসায় ঘাতকের মুখগুলো তখন উল্লসিত হয়ে উঠেছে। ভয়ে দুহাতে মুখ ঢেকে লুসি আর্তনাদ করে উঠল।

আটাশ

কেসি

রাত তখন গভীর! ভেঙেপড়া, পরিত্যক্ত গুদামঘরের এক কোণে টম রক্তাক্ত দেহে পড়ে রয়েছে আর মাঝে মাঝে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে। ঘরটা পুরনো যন্ত্রপাতি, ভাঙা বাক্স, নষ্ট হয়ে যাওয়া তুলোর গাঁটরি আর নানা ধরনের টুকিটাকি জিনিসে একেবারে ঠাসা।

ঘরটা যেমন স্যাঁতসেঁতে, তেমনি ঠাণ্ডা। নড়াচাড়ার ক্ষমতা নেই বলে আরো বেশি করে ছেঁকে ধরেছে মশার ঝাঁক। অসহ্য যন্ত্রণার চাইতেও যা মারাত্মক কষ্টদায়ক, তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছে বুকের ছাতি।

'ঈশ্বর! হে ঈশ্বর, আমায় শক্তি দাও!' কাতরাতে কাতরাতেই টম বেদনার্ত স্বরে প্রার্থনা জানাল।

এমন সময় সে কার যেন পায়ের শব্দ শুনতে পেল, চোখে এসে পড়ল লণ্ঠনের আলোর ক্ষীণ একটা রেখা।

'কে?' ভারি চোখের পাতা দুটোকে টম কোনোরকমে মেলার চেষ্টা করল। 'ঈশ্বরের দোহাই, আমাকে একটু জল দাও।'

একজন মহিলা লণ্ঠনটা মাটিতে নামিয়ে রেখে টমের মাথাটা একটু তুলে ধরে জলের পাত্রটা এগিয়ে দিল।

পরম আগ্রহে টম পান করতে লাগল।

পাত্রে আরো খানিকটা জল ঢেলে মহিলাটি আশ্চর্য মিষ্টি গলায় বলল, 'সবটুকু খেয়ে নাও। আমি জানি, এখন এটাই তোমার সবচাইতে বেশি প্রয়োজন।'

আকণ্ঠ পান করার পর টম বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিসিস ।'

'আমাকে মিসিস বোলো না । আমি তোমারই মতো একজন হতভাগ্য ক্রীতদাসী ।'

স্তব্ধ বিস্ময়ে টম মহিলাটির মুখের দিকে তাকাল, মনে হলো দীর্ঘ পল্লবঘেরা সুন্দর টানাটানা চোখ দুটো সে যেন আগে কোথাও দেখেছে । ছিপছিপে লম্বা চেহারা । বছর চল্লিশ বয়স মুখখানা আশ্চর্যসুন্দর । সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মমতাময়ী একটা শ্রী । গলার স্বরটাও ভারি মিষ্টি ।

'আমার নাম কেসি । ভেবো না, তোমার জন্যে এই প্রথম আমি জল নিয়ে এলাম । গভীর রাতে, সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর আমাকে বহুবারই এখানে আসতে হয়েছে । বৈঠকখানার জানলার ফাঁক দিয়ে আমি সবই দেখেছি । তোমার জন্যে যতটা কষ্ট পেয়েছি, কারুর জন্যে আর এমন কষ্ট পাই নি । এখানে কাউকে আমার মানুষ বলেই মনে হয় না ।' কথা বলতে বলতেই কেসি নিপুণ হাতে তুলোর একটা গাঁটরি খুলে গদির মতো বিছিয়ে তার ওপর একটা চট পেতে দিল । 'একা আমি তো তোমাকে তুলতে পারব না । তুমি বরং এদিকে একটু গড়িয়ে এসো, টম চাচা ।'

শেষের শব্দটায় টম চাবুক খাওয়ার চাইতেও বেশি চমকে উঠল, অদ্ভুত একটা যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠল বুকের ভেতরটা । মাস্টার জর্জ আর ইভা ছাড়া কেউ আর কোনোদিন তাকে এত নিবিড়, এমন মিষ্টি করে ডাকে নি । যেন শুধু এই ছোট্ট শব্দটার জন্যেই সে এখনো বেঁচে আছে । টম কৃতজ্ঞতা জানাবার কোনো ভাষা খুঁজে পেল না, কেবল শুকনো ঠোঁট দুটো মৃদু নড়ে উঠল, সজল হয়ে উঠল তার গভীর চোখ দুটো ।

শয্যার সামনে উবু হয়ে বসে কেসি ভিজে রুমাল দিয়ে ক্ষতস্থানগুলোর ওপর আলতো করে বুলিয়ে দিতে লাগল । কৃতজ্ঞতা-ভেজা চোখে টম তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, কেসির মাথা থেকে ওড়নাখানা খসে গেছে, ঘন পল্লবঘেরা সুন্দর চোখ দুটো বেদনায় ম্লান, মুখের চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে একরাশ কোঁকড়ানো কালো চুল ।

হাতটা একটু তুলে টম কী যেন বলতে যেতেই কেসি বাধা দিতে লাগল । তোমাকে কিচ্ছু বলতে হবে না, টম চাচা, আমি সব জানি, তোমার মতো সৎ, সাহসী মানুষ আমি জীবনে খুব কমই দেখেছি, এবং তুমি যা করেছ সেটাই ঠিক । তবু আমি বলব, তুমি ওর সঙ্গে পারবে না, ওটা একটা আস্ত শয়তান! তুমি বরং ওর কথামতোই চলো ।'

'হা, ঈশ্বর, তা কী করে সম্ভব?'

'ঈশ্বরকে ডেকে কোনো লাভ নেই, উনি আমাদের কথা শুনতে পান না ।' শান্তস্বরেই কেসি বলল । 'আমার ধারণা ঈশ্বর নেই, আর যদি থাকেনও উনি আমাদের বিরুদ্ধে । স্বর্গ-মর্ত্য, সবাই আমাদের বিরুদ্ধে । সবাই আমাদের ঠেলে দিচ্ছে নরকের দিকে ।'

'হ্যাঁ, একদিক থেকে কথাটা ঠিক । তবুও, মিসিস ...'

'তুমি এখানকার কিছুই জানো না, টম চাচা; কিন্তু আমি জানি । আজ পাঁচ বছর ধরে আমি এই জায়গাটা দেখছি । দেহ আর মন, দুটোই বিসর্জন দিয়েছি ওই লোকটার পায়ের তলায় । অথচ ওই লোকটাকে আমি শয়তানেরই মতো ঘৃণা করি । এই যে পরিত্যক্ত ঘরটায় রক্তাক্ত দেহে তুমি পড়ে পড়ে কাৎরাচ্ছ, আশেপাশে দশ মাইলের মধ্যে এমন কোনো লোক নেই যে তোমাকে দেখতে আসবে । চাবকাতে চাবকাতে ও যদি তোমাকে মেরে ফেলে, কিংবা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার জন্যে ভয়ঙ্কর কুকুরগুলোকে লেলিয়ে

দেয়, ঈশ্বর বা মানুষ, কেউই তোমাকে বাঁচাতে আসবে না, কেউ না। আর লোকটা যে কী হিংস্র, শুনলে তোমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠবে। আমি যতটুকু জানি বা দেখেছি, তার কিছুটাও যদি বলি, অনেকেই হয়তো ভয়ে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপবে। তা সত্ত্বেও এই পাঁচটা বছর আমি ওর সঙ্গে বাস করে আসছি আর দিনরাত, প্রতিটা মুহূর্ত দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করছি। তার ওপর আবার বছর পনেরো বয়সের একটা মেয়েকে এনে জুটিয়েছে। এমিলিন আমাকে নিজে মুখে বলেছে, ও মানুষ হয়েছে একটা ভদ্র পরিবারে, বাড়ির কর্ত্রী ওকে নিজে হাতে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। লুকিয়ে লুকিয়ে ও আবার সঙ্গে করে বাইবেলটাও নিয়ে এসেছে। কিন্তু আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি, ওই বাইবেলখানা নিয়েই ওকে সোজা নরকের পথে এগিয়ে যেতে হবে! ঈশ্বর ওকে কোনো সাহায্যই করবেন না।'

'না মিসিস, না!' বন্ধ চোখের পাতায় টম কেঁপে উঠল। 'আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, ও চাইলে ঈশ্বর ওকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। মিসিস, একদিন আমারও সব ছিল, বউ, ছেলে-মেয়ে, ঘর-বাড়ি, দয়ালু মনিব, আর কয়েকটা দিন উনি যদি বেঁচে থাকতেন, আমি মুক্তিও পেতাম। কিন্তু আজ সে-সব চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে, তবু ঈশ্বরের প্রতি আমার এই শেষ বিশ্বাসটুকু কিছুতেই হারাতে পারব না!'

কিছুটা অবাক হয়েই কেসি টমের মুখের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইল।

'আমি জানি মিসিস, সবকিছুতেই তুমি আমার অনেক ঊর্ধ্বে। তবু হতভাগ্য এই মানুষটার কাছ থেকে একটা কথা শুনে রাখ, একটু আগেই তুমি বলছিলে, ঈশ্বর আমাদের বিরুদ্ধে, উনি আমাদের কথা শুনতে পান না। যেহেতু আমরা গরিব, তাই আমাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। কিন্তু ঈশ্বরের আপন সন্তানের ক্ষেত্রেই বা কী ঘটেছিল একবার ভেবে দেখো! উনি কি আমাদেরই মতো কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে নির্জন আস্তাবলে জন্মান নি? ওঁকে কি একটাই মাত্র ভেড়ার চামড়া পরে ঘুরে বেড়াতে হয় নি? উনি কি সারাটা জীবন গরিব ছিলেন না। ওঁ আমাদের ভুলতে পারেন না। আমরা যদি ওঁকে স্মরণ করি, উনি চিরকালই আমাদের পাশে থাকবেন। আমরা যদি সাহায্য চাই, উনি আমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। কিন্তু আমরা যদি ওঁকে অস্বীকার করি, উনি আমাদের এড়িয়ে চলবেন।'

'কিন্তু উনি কেন আমাদের এমন একটা জায়গায় এনে ফেললেন যেখানে আমরা পাপ করতে বাধ্য হই?' অভিযোগের সুরেই কেসি বলল।

একটু বিরতির পর শান্তস্বরে টম বলল, 'আমার মনে হয় বাধ্য আমরা নাও হতে পারি।'

'কিন্তু তুমি ওদের জানো না, টম চাচা, ওরা হয়তো আবার কালই আসবে এবং তখন তোমার কপালে কী ঘটবে ভাবতে আমি এখনই শিউরে উঠছি!'

'ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করবেন।'

'যেভাবে হোক, ওরা তোমাকে বাধ্য করাবেই।'

'না না, তা কখনই হতে পারে না! হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে শক্তি দাও! যা অন্যায়, তা যেন আমাকে কখনো না করতে হয়!'

'এর আগে বহুবার আমি অনেককে ও-রকম কাতর প্রার্থনা জানাতে শুনেছি টম চাচা; কিন্তু কোনো ফল হয় নি। একএক করে সবাইকে ওই শয়তানটার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে হয়েছে। এমিলিন প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে, তুমিও করছ। কিন্তু কী লাভ? বাধ্য না করানো পর্যন্ত ও ছাড়বে না, না পারলে খুন করতেও এতটুকু দ্বিধা করবে না।'

www.alorpathsala.org

'বেশ, তাহলে মরব। তারপরে তো ওরা আমার আর কিছু করতে পারবে না।'

'টম চাচা, একদিন আমি তোমার মতোই ভাবতাম, তোমার মতোই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতাম।' টমের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কেসি বলে চলল, 'জীবনে আমি বহুবার মরতে চেয়েছিলাম, কিন্তু আত্মহত্যা করার মতো সাহস আমার ছিল না।

'আমাকে দেখে তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, ছোটবেলা থেকে শুধু স্বচ্ছলতা নয়, রীতিমতো প্রাচুর্যের মধ্যেই মানুষ হয়েছি। খুব বড় একটা বাড়িতে থাকতাম, পুতুলের মতো সবসময়ই সুন্দর সুন্দর সব পোশাক পরতাম। যারাই বেড়াতে আসত, সবাই আমার রূপ-গুণের প্রশংসা করত। বাড়ির সামনে বড় একটা বাগান ছিল, কমলাগাছের ছায়ায় আমি ভাইবোনদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতাম। একটু বড় হবার পর আমাকে কনভেন্টে ভর্তি করে দেওয়া হলো। সেখানে আমি ফরাসি ভাষা, গান, সেলাই আর নানারকমের হাতের কাজ শিখতাম। লেখাপড়ায় আমি ছিলাম সবার ওপরে।

'আমার যখন চোদ্দ বছর বয়স, বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। চার ঘণ্টা আগেও আমরা কিছু বুঝতে পারি নি। সেবার নিউ অর্লিয়েন্সে কলেরায় উনিই প্রথম মারা যান। আমার মা ছিলেন ক্রীতদাসী, বাবা আমাকে সবসময়ই মুক্তি দেবার কথা বলতেন। কিন্তু ব্যাপারটা এমন হঠাৎ ঘটে যাবে, আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারি নি। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মিটে যাবার পরের দিনই আমার বাবার বিয়ে-করা স্ত্রী তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি চলে গেলেন। বিপুল পরিমাণ দেনা শোধ করার জন্যে চাকর-বাকরদের সঙ্গে সমস্ত সম্পত্তিই বিক্রি করে দিতে হলো। জানি না কেন, ওরা শুধু আমাকেই বিক্রি করল না।

'আদালত থেকে সম্পত্তিটা দেখাশোনা করার জন্যে একজন তরুণ উকিল প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন, আমার সঙ্গে মিষ্টি হেসে কথা বলতেন। ওঁকে আমার মনে হতো এ পৃথিবীর সবচাইতে সুন্দর মানুষ। সেই সন্ধ্যেটার কথা কখনো ভুলব না, যেদিন আমরা দুজনে গল্প করতে করতে বাগানের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। বাবার মৃত্যুর পর থেকে সমস্ত ব্যাপারটাই এমন দ্রুত ঘটে গিয়েছিল যে সবকিছুতেই আমার কেমন যেন অবাক লাগত, আর নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হতো। উনিই আমাকে সেদিন সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন, আমাকে নাকি বহুবার কনভেন্টে যাওয়া-আসার পথে দেখেছেন এবং আমাকে ওঁর খুব ভালো লাগে। আমার বন্ধু ও অভিভাবক হতে পারলে উনি খুব খুশি হবেন। অথচ উনি যে আগেই দুহাজার ডলার দিয়ে আমাকে কিনে নিয়েছেন, সে কথা কখনো বলেন নি।

'আমি স্বেচ্ছায় হেনরির কাছে চলে গেলাম, কেননা আমি ওকে সত্যিই ভালোবাসতাম। হেনরি এমন সুন্দর আর উদারমনা যে ভালো না বেসে আমার কোনো উপায় ছিল না! গাড়ি-বাড়ি-ঘোড়া, চাকর-বাকর, আসবাপত্র আর পোশাক থেকে শুরু করে অর্থ দিয়ে যা কিছু কেনা যায় ও আমাকে সবই দিয়েছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কী শুধু ভালোবাসা ছাড়া ওর কাছ থেকে আমি কোনোদিনই কিছু চাই নি। ওকে আমি ঈশ্বরের চাইতে, আমার নিজের সত্তার চাইতেও বেশি ভালোবাসতাম। সম্ভবত আজো বাসি।

'আমি শুধু ওর কাছে একটা জিনিসই চাইতাম, হেনরি আমাকে বিয়ে করুক। আমার সম্পর্কে ও সবসময়ই যে-সব কথা বলত তা যদি সত্যি হয়, আমার ধারণা ছিল ও খুশি হয়েই আমাকে বিয়ে করবে। কিন্তু সে সম্পর্কে কখনো কিছু বললেই ও বলত সেটা সম্ভব

নয়। আমরা যদি পরস্পরের বিশ্বস্ত থাকি, ঈশ্বরের চোখে সেটাই বিয়ে। হেনরি যা বলত আমি তাই-ই বিশ্বাস করতাম। দিনরাত প্রতিটা মুহূর্ত আমি ওকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতাম। অসুস্থ হয়ে পড়লে রাত জেগে সেবা করতাম। সাত সাতটা বছর বিশ্বস্ততার কোথাও কোনো ত্রুটি ছিল না।

আমাদের ফুটফুটে দুটি সন্তান হয়েছিল। প্রথমটা ছেলে। ওর চোখ মুখ কপাল চুল সবই ছিল ঠিক হেনরির মতো; যেমন সুন্দর দেখতে, তেমনি মিষ্টি স্বভাব। আর পরেরটা মেয়ে। ও দেখতে ছিল ঠিক আমার মতো। ছেলের চেয়ে হেনরি মেয়েটাকেই বেশি ভালোবাসত, আদর করে ডাকত কখনো এলিজা কখনোবা এলিস বলে।'

অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও টম মনে মনে চমকে না উঠে পারল না। এতক্ষণ হাতড়ে বেড়ানো মুখটাকে মনে হলো এবার সে যেন চিনতে পেরেছে। তবু মুখে কিছু না বলে সে নির্নিমেষ চোখে কেসির দিকে তাকিয়ে রইল।

'ছেলে-মেয়ে দুটো আর আমাকে নিয়ে হেনরির গর্বের অন্ত ছিল না। ও বলত আমি নাকি লুসিয়ানার সব চাইতে রূপসী মহিলা। খোলা গাড়িতে চড়ে আমরা যখন শহরের মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াতাম, সবাই অবাক হয়ে আমাদের দিকে তাকাত। একজন মানুষের পক্ষে যতটা সুখী হওয়া সম্ভব, আমি ছিলাম ঠিক ততটাই সুখী। কিন্তু সে সুখ আমার কপালে বেশি দিন সইল না। কোত্থেকে মূর্তিমান দুর্ভাগ্যের মতো এসে হাজির হলো হেনরির চাচাতো ভাই। ওর কাছেই শুনলাম দেনা মেটানোর জন্যে হেনরি আমাদের তিন জনকেই বিক্রি করে দিয়েছে। প্রথমটায় আমি আদৌ বিশ্বাস করি নি। কিন্তু হেনরির নিজে হাতে সই করা কাগজটা দেখার পর আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তাতে কোনো লাভ হলো না, লোকটা আমাদের নিয়ে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তখনই বুঝতে পারলাম সমস্ত ব্যাপারটাই পূর্ব পরিকল্পিত। কিছুদিন আগে শ্বেতাঙ্গ একটি মেয়ের সঙ্গে হেনরির আলাপ হয়েছিল, তাকে বিয়ে করার জন্যেই ও আমাদের বিক্রি করে দিল।

'সেই ঘটনার পর থেকে আমি কোনোদিনের জন্যে একা ফোঁটাও চোখের জল ফেলি নি। লোকটাকে দেখলেই আমার গা ঘিনঘিন করত, তবু ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারতাম না। ও আমাকে সবসময়ই ভয় দেখাত ওর কথা না শুনলে আমার ছেলে-মেয়ে দুটোকে অনেক দূরে কোথাও বিক্রি করে দেবে। হাত-পা বাঁধা একা পশুর মতো আমাকে ও সারাক্ষণই হুকুম করত, সবসময়ই ছেলেমেয়েদের ত্রুটি খুঁজে বার করার চেষ্টা করত। আমি ওদের আগলে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতাম, কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলাম না। আমার অজান্তেই লোকটা ছেলে-মেয়ে দুটোকে বিক্রি করে দিল। যখন জানতে পারলাম, আহত বাঘিনীর মতো আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম। চাবুক মেরেও লোকটা আমাকে শায়েস্তা করতে পারল না। যখন দেখল আমাকে কোনোমতেই বাগে আনা সম্ভব নয়, তখন স্টুয়ার্ট নামে একজন ভদ্রলোকের কাছে আমাকে বিক্রি করে দিল।

'কেন জানি না, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট আমাকে কিছুটা সহানুভূতির চোখেই দেখতেন। এমন কী খুঁজে পেলে আমার ছেলে-মেয়ে দুটোকে কিনে নেওয়ারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। হেনরির ভাই যেখানে আমার ছেলেটাকে বিক্রি করেছিল, সেই হোটেলে খবর নিয়ে জানা গেল পার্ল নদীর ওপারে একজন আবাদকারীর কাছে ওকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। সেই ওদের শেষ খবর আমি পেয়েছিলাম। এলিজার খবর ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট পেয়েছিলেন।

কেন্টাকির একটা ভদ্র পরিবারে ওকে বিক্রি করা হয়েছিল। কিন্তু বাড়ির কর্ত্রী অজস্র অর্থের বিনিময়েও এলিজাকে বিক্রি করতে রাজি হন নি। তারপর থেকে আমি এলিজারও আর কোনো খবর পাই নি।

'তুমি জানো না টম চাচা, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না, ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট কেনার আগে আমার আর একটা সন্তান হয়েছিল। জন্মের কয়েকদিন পরেই আমি নিজের হাতে তাকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়েছি! আমি চাই নি আর কোনো সন্তান হারানোর ব্যথা সহ্য করতে। যন্ত্রণা ছাড়া তাকে আমি আর কী দিতে পারতাম, তুমি বলো?

'ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্ট সত্যিই আমার সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করতেন, ওঁর রুচিও ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই যে বাড়ি, আবাদ সবকিছুই উনি নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন, সবকিছুই তখন ছিল ছবির মতো সুন্দর সাজানো, কিন্তু হঠাৎ এখানেও একবার মড়ক দেখা দিল। যারা বাঁচতে চেয়েছিল, সবাই মরল। আর যার আদৌ বাঁচার কোনো প্রয়োজন ছিল না, সেই আমিই বেঁচে রইলাম! তারপর এই শয়তানটা ক্যাপ্টেন স্টুয়ার্টের যেখানে যা কিছু ছিল সব জলের দামে কিনে নিল। সেই থেকে আজো আমি ওর হাতের পুতুল হয়ে রয়েছি।'

কখনো টমকে উদ্দেশ্য করে, কখনোবা স্বগোক্তির ভঙ্গিতে কেসি এমন তীব্র ক্ষোভ, বেদনা আর গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে ওর জীবনকাহিনী শুনিয়ে গেল যে টম নিজেই নিজেকে অপরাধী না ভেবে পারল না। ছড়িয়েপড়া ঘনকালো চুলের মাঝে কেসির সুন্দর করুণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে টম নতুন এক ধরনের যন্ত্রণা অনুভব করল। কেননা কেসির কোমল হাতের স্পর্শে নির্মম আঘাতের যন্ত্রণা সে তখন প্রায় ভুলেই গিয়েছিল, তার পরিবর্তে বুকের ভেতর উদ্বেল হয়ে উঠেছিল সন্তানহারা মায়ের এক করুণ হাহাকার। বেদনাকাতর শুকনো চোখের কোল বেয়ে তখন গড়িয়ে এসেছিল দুফোঁটা অশ্রু, এলিজার মা কেসিকে টম কী বলে সান্ত্বনা দেবে সে নিজেই বুঝতে পারছিল না।

'এরপরেও কি তুমি বলবে, টম চাচা, ঈশ্বর, আছেন?'

'হ্যাঁ কেসি, আমি বিশ্বাস করি উনি আছেন।'

'বেশ, যদি ধরেই নেই উনি আছেন, তাহলে তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে বলবে, ওপর থেকে সবকিছু তাকিয়ে দেখেও উনি এত অন্যায়, অবিচার মুখ বুজে সহ্য করলেন? ওদেরকে একটু শাস্তিও দিলেন না?'

'শেষ বিচারের দিন উনি প্রতিটা অপরাধীকেই শাস্তি দেবেন, কেসি।'

'আমি বিশ্বাস করি না!' রাগে কেসি যেন ফুঁসে উঠল। 'ওরা এমনই হীন আর নিষ্ঠুর যে আমাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। আমাদের দুঃখ-কষ্ট, ছেলেমেয়েদের যন্ত্রণার কথা ওরা ভুলেও ভাবে না। যেন এসব কোনো ব্যাপারই নয়, অতি তুচ্ছ। যেন আমাদের ওপর অত্যাচার করাটা ওদের জন্মগত অধিকার।'

শয্যার পাশ থেকে উঠে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে করতেই কেসি বলল, 'তুমি জানো না টম চাচা, ছোটবেলায় আমি ধর্মে বিশ্বাস করতাম, ঈশ্বরকে ভালোবাসতাম, প্রতিদিন প্রার্থনা করতাম। কিন্তু দিনরাত নির্যাতন করে করে ওই শয়তানগুলোই আমার হৃদয়কে একেবারে পাষাণ করে দিয়েছে। মাঝে মাঝে আমার কী মনে হয় জানো, টম চাচা', লণ্ঠনের স্বল্প আলোতেও টম কেসির চোখ দুটোকে জ্বলে উঠতে দেখল। 'রাতের

অন্ধকারে দুহাতে গলা টিপে লেগ্রিটাকে খুন করে ফেলি! ওরা যদি আমাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে, আমি তাতে ভয় পাই না। আর সত্যিই যদি কখনো শেষ বিচারের দিন আসে, ঈশ্বর আমাকে শাস্তি দিতে চান, আমি একা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেব, যারা আমার দেহ-মন, ছেলেমেয়েদের ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে!'

টমের বুকের মধ্যে কেমন যেন একটা অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে, কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে, তবু কাতর চোখে তাকিয়ে সে কোনোরকমে বলল, 'ঈশ্বর তোমাকে কখনো শাস্তি দেবেন না, দিতে পারেন না। শুধু তুমি যদি ওঁর কাছে একটিবার ক্ষমা চাও, উনি তোমাকে একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নেবেন।'

বলতে গিয়ে হাঁপাচ্ছে দেখে কেসি তাড়াতাড়ি শয্যার পাশে হাঁটু মুড়ে বসে টমের কপালে হাত বোলাতে বোলাতে মিষ্টি গলায় বলল, 'তুমি আর একটাও কথা বলবে না, তোমার এত কষ্ট হবে আমি ঠিক বুঝতে পারি নি, টম চাচা। তোমার জন্যে আমি তো আর কিছুই করতে পারলাম না, এই জলটুকু সব খেয়ে ফেলো।'

টম নিঃশব্দে হাঁ করল। সেই মুহূর্তে শান্ত স্থির, মমতাস্নিগ্ধ মুখটার দিকে তাকিয়ে টম কেসিকে চিনতে পারল না, মনে হলো ইভাই যেন তার পাশে সে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

হাত দিয়ে শয্যাটা ঠিক করে ছোটখাটো দু-একটা জিনিস গুছিয়ে কেসি লণ্ঠনটা তুলে নিল। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার আগে বলল, 'বিদায়, টম চাচা। এখন তুমি একটু ঘুমানোর চেষ্টা করো।'

উনত্রিশ

সাইমন লেগ্রি

লেগ্রির বৈঠকখানাটা বেশ বড়। একসময় খুব সুন্দর সাজানো ছিল, কিন্তু এখন ওটার জীর্ণ দশা স্পষ্টই চোখে পড়ে। মাঝে মাঝে পলেস্তরা খসে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে দেওয়ালের

সাঁটা কাগজের রঙ। এখানে ওখানে ছড়ানো রয়েছে জিন, ঘোড়ায় চড়ার উঁচু বুট, চাবুক, ওভারকোট, ইত্যাদি। ছেঁড়া কাপড় আর হাবিজাবি জিনিসের মধ্যে কুকুরগুলো তাদের শোবার জায়গা করে নিয়েছে। ঘরটা অসম্ভব স্যাঁতসেঁতে বলে দিনের বেলাতেও কাঠকয়লার উনুন জ্বালানো হয়।

সাইমন লেগ্রি পুরনো একটা কাঠের চেয়ারে বসে অন্য একটা কুর্সিতে বুটসহ পা তুলে দিয়ে চুরুট টানছে আর চোখ বুঝে কী যেন ভাবছে। কেসি তার পাশে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একদিকে লেগ্রি যেমন কেসির ওপর অমানুষিক অত্যাচার করত, অন্য দিকে তেমনি আবার মনে মনে অসম্ভব ভয়ও করত। এ বাড়িতে একমাত্র কেসিই পারত বন্য গোঁয়াড় মানুষটাকে বশ করতে। তা সত্ত্বেও কেসি পারতপক্ষে লেগ্রির কাছে কখনো কিছু চাইত না। টমের জন্যে বাধ্য হয়েই আজ ওকে আসতে হয়েছে।

'না, কেসি', লেগ্রি বলল, 'তোমার আচরণ দিনদিন শোভনতার সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে।'

'আর তোমার আচরণটা খুব শোভন, তাই না? তুমি টম বলে ওই লোকটার সঙ্গে কী রকম ব্যবহার করলে, একবার ভেবে দেখেছ? ওই লোকটা কি তোমার সব চাইতে ভালো কর্মী ছিল না? বিশেষ করে, এখন এই তুলা তোলার সময়ে বারোশো ডলার দিয়ে ওকে কিনে তোমার কী লাভটা হলো শুনি?'

'হ্যাঁ, সেটা অবশ্য ঠিক। কিন্তু কেউ যখন নিজের গোঁ বজায় রাখার চেষ্টা করে তখন সেটা অবশ্যই ভেঙে দেওয়া দরকার।'

কেসি বাঁকা চোখে লেগ্রির মুখের দিকে তাকাল। 'তুমি কি সত্যিই ওর গোঁ ভাঙতে পারবে বলে মনে হয়?'

'পারব না?' লেগ্রি চোখ পাকিয়ে বলল, 'কেন পারবে না শুনি? তাহলে বলব ও-ই প্রথম নিগ্রো, যে আমাকে চেনে না! ওর প্রতিটা হাড় আমি গুঁড়িয়ে ছাড়ব, দেখি কালো কুকুরটা সায়েস্তা হয় কিনা।'

'তাতে কিন্তু ক্ষতিটা শুধু তোমারই হবে সাইমন।'

'হোক, তবু আমি দেখতে চাই ও নত হয় কি না।'

এমন সময় সাম্বো ভেতরে ঢুকে লেগ্রিকে অভিবাদন করল, তারপর এগিয়ে এসে কাগজে মোড়া কী যেন একটা সন্তর্পণে বাড়িয়ে দিল তার দিকে।

'কী রে, এতে কী আছে?'

'একটা কবচ, হুজুর।'

'কী বললি?'

'কবচ, স্যার। নিশ্চয় কোনো ডাইনির কাছ থেকে নেওয়া, যাতে চাবুক মারলেও গায়ে না লাগে। এটা ওই নিগারটার গলায় কালো সুতো দিয়ে বাঁধা ছিল।'

অধিকাংশ নিষ্ঠুর মানুষের মতো সাইমন লেগ্রির মনও ছিল নানান কুসংস্কারে ভরা। কাগজের মোড়কটা খুলতেই তার চোখে পড়ল চকচকে একটা রুপোর ডলার আর উজ্জ্বল একগাছা সোনালি চুল। লেগ্রি চুলের গোছাটা তোলার চেষ্টা করতেই সেটা সজীব একটা পদার্থের মতো আঙুলে জড়িয়ে গেল। ডলারটা ছিটকে পড়ল মাটিতে।

'এই কুকুর, এটা কোথায় পেয়েছিস? নিয়ে যা শিগগির! পুরিয়ে ফেল!' আতঙ্কে মাটিতে পা ঠুকে পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে লেগ্রি আঙুল থেকে চুলটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করল, তারপর কোনোরকমে ওটাকে ছিঁড়ে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল। 'কেন এটা তুই নিয়ে এসেছিস আমার কাছে?'

সাম্বো তখন বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কথা বলবে কী, হাঁ করে সে তাকিয়ে রইল মনিবের মুখের দিকে।

লেগ্রি ঘুঁসি পাকিয়ে তেড়ে গেল তার দিকে, সাম্বো সভয়ে দুপা পিছিয়ে গেল।

'খবর্দার বলছি, আর কক্ষনো এসব জিনিস নিয়ে আসবি না আমার কাছে! যা, বেরিয়ে যা এখান থেকে।'

মাটি থেকে ডলারটা কুড়িয়ে নিয়ে সে জানলার দিকে ছুড়ে দিল। ডলারটা সার্সি ভেঙে গিয়ে পড়ল বাইরের অন্ধকারে।

সাম্বো পালিয়ে আসতে পেরে যেন বাঁচল।

লেগ্রি আবার তার চেয়ারে ফিরে এল। চুপচাপ বসে এমনভাবে সে আঙুলটার দিকে তাকিয়ে রইল যেন ওটা ঝলসে গেছে।

কিন্তু ইভার সোনালি একগাছা চুল দেখে লেগ্রি এত বিচলিত হয়ে উঠল কেন? এর জবাব পেতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে তার অতীত জীবনে।

ছেলেবেলা থেকেই সাইমন লেগ্রি ছিল লম্পট আর উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। একমাত্র ছেলের চরিত্র শোধরানোর জন্যে তার মা বহু চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনো ফল হয় নি। স্বভাব আর চরিত্রে লেগ্রি ছিল ঠিক তার বাবার মতো, যেমন উগ্র, তেমনি গোঁয়াড়। মাতাল অবস্থায় রেগে গেলে তার কখনো জ্ঞান থাকত না। কখনো বাড়িতে থাকত, কখনো থাকত না, কখনো বা আবার বেশ কিছু দিনের জন্যে কোনো পাত্তা নেই। সমুদ্রের ওপর লেগ্রির টান ছিল বরাবরের। তার মা ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানাতেন ছেলেকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে। একবার তিনি ফিরিয়েও দিয়েছিলেন। দীর্ঘ কয়েক বছর অনুপস্থিতির পর একবার লেগ্রি যখন ফিরে এল, তখন সে সম্পূর্ণ মাতাল। মা তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে অনেক অনুরোধ করলেন, হাত ধরে মিনতি জানালেন, কিন্তু কোনো ফল হলো না। বরং সে আরো উগ্র হয়ে উঠল, মাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিল। মা তখন তার কাছে নতজানু হয়ে জাহাজে ফিরে না যাবার জন্যে কাকুতি মিনতি করলেন। এতে লেগ্রি অসম্ভব ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল এবং মাকে দুপায়ে মাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর কিছু কাল পরে লেগ্রি যখন তার মাতাল নাবিক বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে একেবারে মত্ত হয়ে রয়েছে, হঠাৎ সে একটা চিঠি পেল। চিঠিটা খুলতেই দীর্ঘ একগাছা সোনালি চুল তার আঙুলে জড়িয়ে গেল। চিঠিতে লেখা ছিল মার মৃত্যু হয়েছে এবং মৃত্যুর সময় তিনি ছেলেকে ক্ষমা করে গেছেন।

আজ আবার ঠিক সে-রকম একগাছা চুল আঙুলে জড়িয়ে যেতেই তার মার কথা মনে পড়ে গেল এবং তিনি যদি তাকে ক্ষমাই করে গিয়ে থাকেন, তাহলে এতদিন পর চুলটা আবার এল কোথা থেকে? স্বভাবতই তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন অজানা একটা আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল।

আঙুলটার দিকে তাকিয়ে লেগ্রি গুম হয়ে চুপচাপ বসে রইল আর অতীত দিনগুলোর কথা ভাবতে লাগল।

ঘরের এক কোণে এমিলিন ভয়ে জড়সেড়া হয়ে বসেছিল, দরজা খোলার শব্দেই সে চমকে উঠল। পরক্ষণেই কেসিকে দেখে দৌড়ে এসে ওকে আঁকড়ে ধরল। 'ও কেসি, তুমি এসে গেছ! খুব ভালো হয়েছে। সারাক্ষণ একা একা আমার ভীষণ ভয় করছিল, ছাদের ওপর থেকে কী রকম একটা বিশ্রী আওয়াজ আসছিল!'

কথাটা গায়ে না মেখে কেসি হালকাভাবেই জবাব দিল, 'ও কিছু নয়। ওরকম আওয়াজ আমি প্রায়ই শুনতে পাই।'

'আচ্ছা কেসি, এখান থেকে অন্য কোথাও পালানো যায় না?'

'কবর ছাড়া আমাদের আর পালানোর কোনো জায়গা নেই।'

'তুমি কখনো চেষ্টা করে দেখেছ?'

'অনেককেই চেষ্টা করতে দেখেছি, কিন্তু কোনো ফল হয় নি।'

'আমার তো মনে হয়, এখানে বাস করার চাইতে জলা অনেক ভালে।' জলায় কেউ বাস করতে পারে না। কুকুরগুলো তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করবে। তারপর ও তোমাকে ...'

উদ্‌গ্রীব হয়ে এমিলিন কেসির মুখের দিকে তাকাল।

'ও আমার কী করবে, কেসি?'

'কী করবে না বরং সেটাই জিজ্ঞেস করো। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জলদস্যুদের চাইতেও ও ভয়ঙ্কর। আমি যা দেখেছি তার কিছুও যদি তোমাকে বলি, রাতের পর রাত তুমি ঘুমোতে পারবে না। আমি এখানে সে অমানুষিক চিৎকার আর বুকফাটা আর্তনাদ শুনেছি, তুমি শুনলে পাগল হয়ে যেতে। জমিতে যাবার পথে আগুনে পুড়ে ঝলসে যাওয়া কয়েকটা গাছ এখনো তার সাক্ষী হয়ে আছে।'

চোখ বুজে দৃশ্যটা ভাবতেই এমিলিন শিউরে উঠল।

'উঃ কী ভয়ঙ্কর! তাহলে এখন আমি কী করব, কেসি?'

'খুব সহজ, যা আমি করেছি।'

'তুমি জানো না কেসি, ও খুব খারাপ।'

'আমার চাইতে ভালো ওকে আর কেউ জানে না, এমিলিন।'

'আমার মা বলতেন ...'

'চুপ!' কেসি ধমকে উঠল। 'আমি কোনো মার কথা শুনতে চাই না। কোনো মা এখানে তার মেয়েকে বাঁচাতে আসবে না।'

'কেসি, তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না।'

'রাগ আমি তোমার ওপর করি নি, এমিলিন। রাগ হচ্ছে আমার নিজেরই ওপরে।'

'উঃ ঈশ্বর, এখন মনে হচ্ছে আমি না জন্মালেই বোধহয় ভালো হতো।'

'শুধু তুমি নয় এমিলিন, আমাদের সবারই না জন্মালে ভালো হতো।'

'আচ্ছা কেসি, আত্মহত্যা করাটা কি পাপ?'

দুহাতে কান চেপে কেসি আর্তস্বরে বলে উঠল, 'জানি না, আমি জানি না, আমি কিচ্ছু জানি না! আমার মনে হয়, যেভাবে আমরা বেঁচে আছি, তার চাইতে বেশি পাপ আর কিছু হতে পারে না।'

দুহাতে মুখ ঢেকে এমিলিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

তখনো ভালো করে ভোর হয় নি। আকাশে জ্বলজ্বল করছে শুকতারা। জানলা দিয়ে টম নিষ্পলক চোখে সেদিকে তাকিয়ে ছিল, এমন সময় বাইরে ভারী বুটের আওয়াজ শোনা গেল।

একটু পরেই ঘরে ঢুকে লেগ্রি ঘৃণা ভরে টমকে লাথি মেরে বলল, 'কিরে, এখন কেমন লাগছে? তোকে বলেছিলাম না দু-একটা শিক্ষা দেব, এবার তোর সাধ মিটেছে তো? না কি আবার বড় বড় জ্ঞান দিতে আসবি?'

টম কোনো জবাব দিল না।

লেগ্রি আবার তাকে একটা লাথি কষিয়ে বলল, 'এই কুকুর, উঠে দাঁড়া।'

যন্ত্রণায় বিবশ, ক্ষতবিক্ষত দেহ নিয়ে টমের পক্ষে উঠে দাঁড়ানো আদৌ সম্ভব ছিল না তবু সে চেষ্টা করল।

তার কষ্ট দেখে লেগ্রি বর্বরের মতো হেসে উঠল।

'কি রে, উঠতে পারছিস না কেন? রাতে ঠাণ্ডায় জমে গেছিস বলে মনে হচ্ছে?'

টম ততক্ষণে শক্তি সঞ্চয় করে উঠে মনিবের সামনে একেবারে সোজা হয়ে দাঁড়াল। এখন আর তার পা কাঁপছে না।

'বাঃ, এই তো উঠে দাঁড়িয়েছিস!' টমের সর্বাঙ্গে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে লেগ্রি খুশির সুরে বলল। 'আশা করি তোর উপযুক্ত শাস্তি এখনো হয় নি। ঠিক আছে, এবার আমার পায়ের কাছে হাঁটু মুড়ে বসে গতকালের অন্যায়ের জন্যে ক্ষমা চা।'

টম একটুও নড়ল না।

লেগ্রি চাবুক কষিয়ে বলল, 'এই কুকুর বস।'

'স্যার, ক্ষমা চাইতে আমি পারি না। যা ন্যায় বলে মনে হয়েছে, আমি তাই করেছি। সুযোগ এলে ভবিষ্যতেও তাই করব। যাই ঘটুক না কেন কোনো অন্যায় কাজ আমি কখনো করতে পারব না।'

'কিন্তু এর ফল কী দাঁড়াবে তুই কল্পনাও করতে পারছিস না। তুই কি ভাবছিস এই শাস্তিই যথেষ্ট? আমি তোকে বলছি, এসব কিছুই নয়। কিন্তু ধর আমি যদি তোকে গাছের গায়ে বেঁধে, তার চারপাশে আগুন ধরিয়ে দিই, আশা করি নিশ্চয়ই সেটা তোর ভালো লাগবে না।'

টম কোনো জবাব দিল না।

'কি রে, এখন একবারে চুপ মেরে গেলি কেন?'

'আমি জানি স্যার, আপনি ওর চাইতেও ভয়ঙ্কর অনেক কিছু করতে পারেন। কিন্তু, আপনি শুধু আমার দেহটাকেই খুন করতে পারেন, তার বেশি কিছু নয়। তারপর আমি মিশে যাব সেই অনন্তের সঙ্গে।'

'অনন্ত' শব্দটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের বুকের ভেতরটা যেন আলোড়িত হয়ে উঠল আর পাপী মানুষের বুকটাকে এমনভাবে কাঁপিয়ে দিল, যেন কাঁকড়া বিছে ওকে হুল ফুটিয়ে দিয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে লেগ্রি কোনোরকমে রাগ সামলে রাখল আর টম, দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়া নির্ভিক কোনো মানুষের মতো, অত্যন্ত সহজভাবেই বলে চলল, 'স্যার, আপনি আমাকে কিনেছেন, আমি চিরটাকাল আপনার বিশ্বস্তই থাকতে চাই। হাতের কাজ আমাকে যা দেবেন, সবই করব। সারাক্ষণ, সমস্ত শক্তি দিয়েই করব। কিন্তু আমার হৃদয়, আমার সত্তা এ পৃথিবীর কোনো মানুষের কাছে দিতে পারব না। ওটা আমি তুলে রেখিছি ঈশ্বরের জন্যে, উনি যখনই চাইবেন আমি যেন উৎসর্গ করতে পারি। মরি বাঁচি, তাতে আমার কিছুই এসে যায় না। আপনি আমাকে চাবুক মারতে পারেন, খেতে না দিতে পারেন, জীবন্ত পুড়িয়েও মারতে পারেন, কিন্তু আমি কোনো কিছুতে ভয় পাই না। আপনি আমাকে যত তাড়াতাড়ি মারতে পারবেন, আমি তত তাড়াতাড়িই সেখানে পৌছতে পারব, যেখানে আমি পৌছতে চাই।'

প্রচণ্ড রাগে কাঁপতে কাঁপতে লেগ্রি বলল, 'আমি তোকে বশ মানাবই।' আপনি কোনোদিনই তা পারবেন না। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করবেন।'

'তোর সাহায্য পাওয়া আমি বার করে দিচ্ছি! হাঁটু মুড়ে বস।'

এক ঘুঁসিতে লেগ্রি টমকে মাটিতে ফেলে দিল।

ঠিক সেই সময়ে লেগ্রি কাঁধে কোমল একটা হাতের স্পর্শ পেল। চমকে ঘুরে তাকিয়েই দেখল, কেসি।

ফরাসিতে কেসি বলল, 'তুমি কি পাগল হয়েছে? মাঠে এখন তুলা তোলার সময়, আর তুমি ওকে এভাবে আধমরা করে ফেলে রাখতে চাও?'

কথাটা যুক্তিসঙ্গত ভেবে লেগ্রি নিরস্ত হলো। তবু কেসির দিকে ফিরে বলল, 'তুমি ছিলে বলে ও আজ বেঁচে গেল, নইলে ওকে আজ আমি মেরেই ফেলতাম।' টমকে বলল, 'এখন কাজের খুব চাপ এবং সবাইকে আমার দরকার, তাই এবারের মতো তুই বেঁচে গেলি। কিন্তু কথাটা আমার মনে থাকবে, তখন দেখব তুই আমার কথা মেনে চলিস কি না।'

রাগে গজরাতে গজরাতে লেগ্রি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কেসি টমের দিকে ফিরে বলল, 'তখন তোমাকে বলি নি, টম চাচা, ও আবার ফিরে আসবে! এখন কেমন আছ?'

টম ম্লান ঠোঁটে হাসল। 'ঈশ্বর তাঁর দেবদূতকে পাঠিয়েছিলেন বলেই সিংহের হাঁ-মুখটা বন্ধ হলো।'

'হ্যাঁ, সেটা শুধু এবারের জন্যে। কিন্তু তুমি অত সহজে ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে না, টম চাচা। দিনরাত ও তোমাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবে, শিকারি কুকুরের মতো তোমার টুঁটি কামড়ে ধরে জীবনের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত শুষে নিয়ে তবে তোমাকে ছাড়বে। আমি ওকে খুব ভালো করেই চিনি।'

'কিন্তু তুমি জানো না, কেসি; ঈশ্বর আমাকে সত্যিই সাহায্য করবেন।'

তিরিশ

বিজয়

কখনো কখনো জীবনে এমন একটা দুর্বিষহ মুহূর্ত আসে, যখন মনে হয় বাঁচার চাইতে মরাটা বুঝি অনেক সহজ। এই বোধটা সাধারণত জন্ম নেয় নিঃসীম একটা হতাশার মধ্যে থেকে। অথচ কোনো শহীদ যখন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়, দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেও অনুভব করে চিরন্তন একটা গৌরবের জন্মলগ্ন।

ঠিক তেমনিভাবে টমও যখন তার জল্লাদের সামনে বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে ছিল, স্পষ্টই অনুভব করতে পারছিল তার অন্তিমলগ্ন ঘনিয়ে এসেছে, দুঃসাহসী একটা গৌরবে তার বুকটা ফুলে উঠছিল, মনে হয়েছিল করুণাঘন যিশুর উজ্জ্বল মুখখানা স্মরণ করতে করতে সে যেকোনো অত্যাচার আর আঘাত সহ্য করতে পারবে। কিন্তু জল্লাদের ছায়াটা দূরে মিলিয়ে যেতে না যেতেই টমের সেই আবেগ বিহ্বল মুহূর্তটাও কেমন যেন স্তিমিত হয়ে গেল, ফিরে এল দুর্বিষহ যন্ত্রণা আর ক্লান্তি। অর্ধঅচেতন, নিঃসঙ্গ একটা হতাশার মধ্যে সে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগল।

ক্ষতস্থান শুকিয়ে আসতে না আসতেই লেগ্রি তাকে নিয়মিত তুলা তোলার কাজে লাগিয়ে দিল। দিনের পর দিন পরিশ্রম আর ক্লান্তি ছাড়াও বিদ্বেষ ভরা নীচমনা ইতরটার যতরকম অন্যায় আর অশুভ ইচ্ছা টমকে কেবলই উত্যক্ত করে তুলতো, ভেঙে দিত তার ধৈর্যের বাঁধ। চারপাশে হীন রুক্ষতার মাঝে বাইবেলটাই ছিল তার একমাত্র সান্ত্বনা। আগে অবসর সময়ে যাওবা আগুনের সামনে বসে একটু আধটু পড়তে পারত, সেরে ওঠার পর এখন আর তাও পারে না। অবসর কোথায়? তুলো তোলার এই মরশুমে লেগ্রি কাউকে একটা মুহূর্তও ফুরসৎ দেয় না। ওদের জীবনে রবিবার বা ছুটি বলে কিছু নেই। এখন সারাটা দিন অমানুষিক পরিশ্রম আর নিষ্ঠুর আচরণ সহ্য করার পর যখন কাজ থেকে ফিরে আসে, নিজেকে মনে হয় যেন একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। একটু পড়ার চেষ্টা করলেই চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে, মাথাটা ঝিমঝিম করে, ইচ্ছে করে অন্যদের মতো নিজের দেহটাকেও একেবারে টানটান করে মেলে দিতে।

এইরকম অদ্ভুত একটা মুহূর্তে টমের ধর্মীয় বিশ্বাস, তার নিবিড় আত্মপ্রত্যয়ও বুঝি দুলে ওঠে। চোখের সামনে প্রতিদিনই সে দেখে, প্রতিটা সত্তা অবদমিত হচ্ছে, নিষ্পেষিত হচ্ছে, আর জয়ী হচ্ছে যা কিছু অশুভ; ঈশ্বর কিন্তু একটা প্রতিবাদও করছেন না! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই যে দুঃখ, এই অন্ধকারের বিরুদ্ধে সে একাই নিজের সত্তার সঙ্গে সংগ্রাম করে আর চোখ বুজে ভাবে মিসেস শেলবিকে পাঠানো মিসেস ওফেলিয়ার লেখা চিঠিটার কথা, ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাকে উদ্ধার করার জন্যে কাউকে না কাউকে পাঠাবেন। মাসের পর মাস সে ব্যাকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে। কিন্তু কাউকে আসতে না দেখে তার বুকের ভেতরটা আরো গাঢ় বিষণ্নতায় ভরে ওঠে, কখনো কখনো মনে হয় ঈশ্বর বোধহয় সত্যিই তাকে ভুলে গেছেন! সেই ঘটনার পর আরো দু-একবার সে কেসিকে দেখেছে, কখনো বা এমিলিনের সঙ্গেও চোখাচোখি হয়েছে। কিন্তু সে শুধু মাত্র কয়েক পলকের জন্যে, কথা বলার কোনো সুযোগ ঘটে নি।

একদিন সন্ধ্যেবেলায়, ক্লান্ত শ্রান্ত দেহে কাজ থেকে ফিরে টম পোড়া কিছু কাঠ দিয়ে আগুন জ্বেলে খাবার তৈরি করছিল আর চিহ্নিত জায়গায় বাইবেলখানা খুলে বারবার পড়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু অল্প আলোয় প্রায় কিছুই দেখতে পারছিল না বলে গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইবেলটা মুড়ে সে আবার পকেটে রেখে দিল।

ঠিক তখনই তার পেছন থেকে কে যেন কর্কশ গলায় হেসে উঠল। চমকে পেছন ফিরে তাকাতেই টম দেখতে পেল দরজার সামনে লেগ্রি দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'তাহলে বুঝতেই পারছিস, ওটাতে এখন আর কোনো কাজ হবে না? দে দে, ওই জঞ্জালটাকে বরং ছুড়ে ফেলে দে!'

লেগ্রির বিদ্রূপের ভঙ্গিটা ক্ষুধা, শীত বা নগ্নতার চাইতে আরো কুৎসিত, আরো নির্মম হয়ে বিঁধল টমের বুকে! তাই কোনো কথা না বলে সে চুপ করে রইল।

লেগ্রি বলল, 'তুই সত্যিই বোকা। আমি তোর ভালোই করতে চেয়েছিলাম। ইচ্ছে করলে তুই সাম্বো আর কুইম্বোর চাইতে অনেক ভালো থাকতে পারতি। মাঠে মাঠে এত পরিশ্রম করতে হতো না, হাতে যেমন প্রচুর সময় পেতে পারতি, তেমনি সবার ওপর খবরদারিও করতে পারতি। ভেবে দেখ, এখনো সময় আছে। নোংরা ওই জঞ্জালটা আগুনের ফেলে দিয়ে তুই বরং আমার গির্জায় যোগ দে।'

'না স্যার, আমি তা পারি না।' শান্ত স্বরেই টম জবাব দিল।

'কেন পারিস না? তুই তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছিস, ঈশ্বর তোকে সাহায্য করছে না। ঈশ্বর যদি থাকত, আমার সঙ্গে তোর কোনোদিনই দেখা হতো না। ধর্ম-টর্ম ওসব বাজে, মিথ্যে একটা অজুহাত। আমিই তোর ঈশ্বর! আমার কথা মেনে চললে তবু বরং তোর জন্যে কিছু একটা করতে পারব।'

'তা হয় না, স্যার। ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন বা নাই করুন, আমি তাঁকে কোনোমতেই ত্যাগ করতে পারি না। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর প্রতি আমার বিশ্বাস আমি কিছুতেই হারাব না।'

'আচ্ছা, আমিও দেখব তুই হারাস কি না! মনে রাখিস, সায়েস্তা তোকে আমি করবই, তখন দেখব কোন ঈশ্বর এসে তোকে রক্ষা করে!'

টমের গায়ে থুতু ফেলে, বুট দিয়ে মাড়িয়ে লেগ্রি চলে গেল।

অবজ্ঞায় ভরা মনিবের এই নিষ্ঠুর আচরণ টমের অন্তরকে ভারি একটা বোঝার মতো দুর্বিষহ করে তুলল, বিবশ করে দিল তার দুঃখ বেদনা আনন্দ আর সাহসকে। নিভে আসা আগুনের সামনে সে অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে রইল। মনিবের নির্মম বিদ্রূপ তাকে যতই পাঁকের অতলে তলিয়ে দিতে চাইল, মরিয়া হয়ে সে ততই চিরন্তন পথের কাটাটাকে আঁকড়ে ধরে থাকার চেষ্টা করল। বসে থাকতে থাকতে একসময় তার চোখের সামনে সবকিছু কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেল আর অনেক দূরে স্পষ্ট হয়ে উঠল জ্যোর্তিময় একটা মূর্তি। মাথায় কাঁটার মুকুট, রক্তাক্ত সারা দেহ, চোখ দুটো অর্ধনির্মিলীত। বিস্ময়ে আনন্দে টম বিস্ফোরিত চোখে অনিন্দ্যসুন্দর উজ্জ্বল মুখটার দিকে তাকিয়ে রইল। আশ্চর্য করুণ চোখ দুটো যেন টমকে বিপুল উচ্ছ্বাসে একেবারে আপ্লুত করে দিল। গভীর আগ্রহে হাত দুটো বাড়িয়ে সে নতজানু হয়ে বসল। তারপর একটু একটু করে মূর্তিটা মিলিয়ে যাবার পরেও মুকুটের কাঁটাগুলো গনগনে আগুনের মতো অনন্য একটা দীপ্তিতে জ্বলজ্বল করতে লাগল আর অনিন্দ্যসুন্দর সেই মুখটাকে দেখল করুণ মমতায় তার ওপর ঝুঁকে পড়ে যেন বলছেন, 'আমার পিতার সিংহাসনে বসবে বলেই আমি তোমাকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি, টম!'

ওইভাবে টম কতক্ষণ বসেছিল, তার খেয়াল নেই। যখন চেতনা ফিরল, আগুনটা নিভে গেছে, বাইরের ঠাণ্ডা আর শিশিরে ভিজে গেছে তার পোশাক। কিন্তু তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে আনন্দের বন্যায়। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বেদনা, হতাশা এখন আর কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। উদ্দীপ্ত বিশ্বাসে সে তখন এমনই এক নতুন মানুষ, সে পৌঁছে গেছে তার ঈপ্সিত আনন্দলোকে।

পরের দিন ভোরের আলো ফুটে উঠতে না উঠতেই অন্যান্যদের সঙ্গে টমও মাঠের দিকে এগিয়ে চলল, কিন্তু আজ তার পায়ের নিচের মাটি অনেক বেশি শক্ত মনে হচ্ছে। নিবিড় একটা প্রশান্তিতে ঝলমল করছে সারা মুখ, যেন পার্থিব যা কিছু তুচ্ছ সে তার অনেক উর্ধ্বে।

সবাই তার পরিবর্তন লক্ষ করে অবাক হয়ে গেল, সব চাইতে বেশি অবাক হলো লেগ্রি। ঘোড়া থেকে নেমে সে সাম্বোকে বলল, 'কী ব্যাপার, আজ শয়তানটার হয়েছে কী? কাল দেখলাম একেবারে ভেঙে পড়েছে, এখন আবার গঙ্গাফড়িং-এর মতো ছটফট করছে!'

'আমি ঠিক জানি না, স্যার। মনে মনে হয়তো পালানোর মতলব এঁটেছে।'

'ও, আচ্ছা!' দাঁতে দাঁত চেপে লেগ্রি বলল। 'ওর পালানোর মতলব আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি!'

চাবুক দোলাতে দোলাতে লেগ্রি টমের দিকে এগিয়ে গেল। 'কি রে কুকুর, কাল তো নড়তেই পারছিলি না, আজ যে দেখছি একেবারে সোজা হয়ে হাঁটছিস?'

'হ্যাঁ, স্যার।'

টমের উল্লসিত কণ্ঠস্বর লেগ্রিকে ক্রুদ্ধ করে তুলল এবং হাতের চাবুকটা দিয়ে সে টমকে নির্মমভাবে চাবুক মারতে লাগল।

কিন্তু টম আজ সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। বিনীতভাবে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেও কোনো আঘাতই যেন তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। ঘোড়ায় চড়ে ফিরে আসার পথে এই

www.alorpathsala.org

দৃশ্যটা বারবার লেগ্রিকে বিব্রত করে তুলতে লাগল। তার নিষ্ঠুর, অশুভ মনের গহনে বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একটা সম্ভাবনার কথা। তার আর টমের মাঝে ঈশ্বর নিজে এমন আড়াল সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যেখানে কোনো চাবুক-আঘাত কিংবা নিষ্ঠুরতা দিয়ে সে আর ওই বিনীত মানুষটাকে কিছুতেই সায়েস্তা করতে পারবে না।

সেদিন রাত্রে, টমের ঘরের সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে আর টম একা চুপচাপ জানালার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, হঠাৎ অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দেখল জানালায় কার যেন ছায়া পড়েছে। প্রথমটায় সে খুব অবাক হয়ে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই কেসিকে চিনতে তার কোনো অসুবিধে হলো না। কেসি হাত দিয়ে ইশারা করে তাকে বাইরে আসার কথা বলল।

টম বেরিয়ে এল। তখন গভীর রাত। চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সবকিছুকেই কেমন যেন অদ্ভুত মনে হচ্ছে, সব চাইতে রহস্যময় মনে হচ্ছে কেসির টানা টানা সুন্দর চোখ দুটোকে।

'কী ব্যাপার মিসিস, এত রাতে?'

'আস্তে টম চাচা, কেউ হয়তো শুনতে পাবে!' ঠোঁটে আঙুল রেখে কেসি সতর্ক করে দিল, তারপর টমের হাত ধরে টানতে টানতে বলল তোমার সঙ্গে কয়েকটা জরুরি কথা আছে। এদিকে এসো, মন্ত্রমুগ্ধের মতো কেসিকে অনুসরণ করে ওরা ঝাঁকড়া একটা গাছের নিচে এসে দাঁড়াল।

'আচ্ছা, তুমি স্বাধীনতা চাও না, টম চাচা?'

'নিশ্চয়ই, চাই বইকি মিসিস। কিন্তু ঈশ্বরের কবে মর্জি হবে একমাত্র তিনিই জানেন।'

'ইচ্ছে করলে আজ রাতেই তুমি তা পেতে পার, টম চাচা।' অদ্ভুত একটা দীপ্তিতে কেসির চোখ দুটো ঝিকমিক করতে থাকে। 'এসো আমার সঙ্গে।'

টম ইতস্তত করল।

'একি, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? এসো।' অপলক চোখে টমের দিকে তাকিয়ে কেসি চাপাগলায় বলল, 'এখন ও গভীর ঘুমে একেবারে অচেতন। আমি ওর সুরার সঙ্গে খুব ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিলাম। খিড়কির দরজাটা খুলে রেখে এসেছি। সেখানে একটা ধারালো কুড়ালও রাখা আছে। ওর শোবার ঘরের দরজাটাও খোলা। আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দেব। আমার হাত দুটো দুর্বল বলে তাই, নইলে কাজটা আমি একাই করতাম। এসো, টম চাচা।'

'না মিসিস, না! কোনো শর্তেই আমি তা পারি না।' কথাটা বলে টম অনড় একটা পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

'আমি শুধু তোমার বা আমার জন্যে বলি নি, টম চাচা। ইচ্ছে করলে আমরা সবাইকেই মুক্তি দিতে পারি। আমি শুনেছি এই জলাভূমি দিয়ে অনেকটা গেলে জঙ্গলে ভরা ছোট ছোট কতকগুলো নির্জন দ্বীপ আছে। সেখানে আমরা সবাই মিলে বাস করতে পারব। অন্তত এখানকার এই জীবনের চাইতে তা আদৌ খারাপ হবে না।'

'না মিসিস, না!' দৃঢ়স্বরে টম বলে উঠল। 'অশুভ কিছু দিয়ে ভালো কাজ কখনো করা যায় না।' বেশ, তাহলে আমি একাই করব।'

চলে যাবে কেসি, সবে পা বাড়িয়েছে, টম ওর পথ আগলে দাঁড়াল।

'ঈশ্বরের দোহাই, মিসিস, আমার একটা কথা শোনো। তুমি ও কাজ কখনো কোরো না। শয়তানের অশুভ ইচ্ছার কাছে তোমার অমন মূল্যবান হৃদটাকে বিক্রি করে দিও না। তাতে ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছু হবে না, হতে পারে না। সময় না আসা পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকেরই অপেক্ষা করা উচিত।'

'অপেক্ষা!' বিদ্রূপে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কেসির কণ্ঠস্বর। 'আমি কি দীর্ঘ বিশটা বছর অপেক্ষা করে থাকি নি? অপেক্ষা করতে করতে কি আমার বুকের ভেতরটা জমে পাথর হয়ে যায় নি?'

'আমি অস্বীকার করছি না, মিসিস।'

'তাহলে তুমি আমাকে আবার কিসের জন্যে অপেক্ষা করতে বলছ? ও কি আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে নির্যাতন করে নি? ও কি শত শত হতভাগ্য নিগ্রোদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলে নি? ও কি তোমার দেহ থেকে প্রতিটা রক্তবিন্দু শুষে নেয় নি? এবার আমি ওর বুকের রক্ত দুহাতে মাখব।'

'না, না, না মিসিস, না!' কেসির নরম হাত দুটো নিজের শক্ত মুঠোয় আঁকড়ে ধরে টম আর্তস্বরে করুণ মিনতি করল। 'তোমার কখনো এ কাজ করা উচিত নয়। যাতে তাঁর সন্তানদের কখনোও রক্ত ঝরাতে না হয়, সেই জন্যে ঈশ্বর নিজে তাঁর রক্ত ঝরিয়েছেন। উনি চান না আমরা নিজেরা নিজেদের রক্ত ঝরাই। আমরা যদি ওঁকে অনুসরণ করি, যারা আমাদের শত্রু তাদেরকেও যদি ভালোবাসি, উনি আমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন।'

'ওর মতো শত্রুকে ভালোবাসব!' কেসি ঢেউ খেলিয়ে হেসে উঠল, অদ্ভুত সেই দীপ্তিতে আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর চোখ দুটো।

গাঢ়স্বরে টম বলল, 'হ্যাঁ মিসিস, উনি আমাদের সেই কথাই বলেছেন। আমরা যদি সবাই সবাইকে সত্যিকারের ভালোবাসতে পারি, এ পৃথিবীতে তাহলে আর কোনো যুদ্ধ, কোনো বিদ্বেষ, কোনো হানাহানি থাকবে না এবং সেটাই হবে প্রকৃত জয়, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের গৌরবময় বিজয়!'

আকাশের দিকে চোখ দুটোকে মেলে দিয়ে এমন গভীর অথচ কোমলস্বরে টম কথাগুলো বলল যে তা কেসির বিক্ষুব্ধ হৃদয়কেও স্পর্শ না করে পারল না, মনে হলো ওর অবদমিত মনের গভীর ক্ষতে কে যেন শিশিরভেজা একটা হিমেল স্পর্শ বুলিয়ে গেল, নমিত হয়ে এল চোখের পাতা দুটো। নিজের মুঠোর মধ্যে টম স্পষ্টই অনুভব করতে পারল ওর নরম মাংসপেশি তখন অনেকটা শিথিল হয়ে গেছে।

'তুমি জানো না, টম চাচা', বেদনাহত স্বরে কেসি বলল, 'মাঝে মাঝে আমার বুকের মধ্যে কী যে কষ্ট হয় তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না।'

'কিন্তু আমি তোমার জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করি মিসিস, তুমি বিশ্বাস করো।' আবেগদীপ্ত স্বরে টম বলল। তার চোখের কোল বেয়ে তখন গড়িয়ে পড়ে অশ্রুধারা। 'আমি জানি, তুমি যদি একবার তাঁকে স্মরণ করো, উনি তোমাকে সাহায্য করবেন, তুমি যদি নতজানু হয়ে একবার প্রার্থনা করো, উনি তোমাকে বুকে তুলে নেবেন।'

সেই মুহূর্তে কেসি কোনো কথা বলতে পারল না, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল আর আনত চোখের পাতা থেকে টুপটাপ ঝরে পড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু।

বেশ খানিকটা নীরবতার পর দ্বিধা জড়ানো স্বরে টম বলল, 'আচ্ছা মিসিস, যদি সম্ভব হয়, এমিলিনকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাওয়া যায় না? অর্থাৎ আমি কিন্তু কোনোমতেই রক্তপাত না ঘটিয়ে যাওয়ার কথা বলছি।'

কেসি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। 'তাহলে তুমি আমাদের সঙ্গে যেতে, টম চাচা?'

'না, মিসিস। ঈশ্বর আমাকে এইসব হতভাগ্য মানুষদের মধ্যে পাঠিয়েছেন, আমি এদের মধ্যেই থাকব। শেষদিনটা ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত আমি এদেরই সঙ্গে ক্রুশকাঠটা বয়ে বেড়াব। কিন্তু তোমাদের কথা আলাদা, তোমাদের পক্ষে এ জায়গাটা নিঃসন্দেহে কুৎসিত। এমিলিনকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারলে সত্যিই খুব ভালো হতো।'

'কবর ছাড়া আর কোথায় যাওয়া সম্ভব আমি নিজেই জানি না। এ পৃথিবীতে পশু পাখিদেরও একটা নিজস্ব আস্তানা আছে। এমন কী সাপ-কুমিরদেরও এমন একটা জায়গা আছে যেখানে ওরা দুদণ্ড শান্তিতে ঘুমাতে পারে। কিন্তু এ পৃথিবীতে কেবল আমাদের মাথা গোঁজবার কোনো ঠাঁই নেই। এমন কী অন্ধকার জলাতেও যদি পালিয়ে যাই, কুকুরগুলো আমাদের ঠিক খুঁজে বার করবে। এ পৃথিবীর সবাই, সবকিছুই আমাদের বিরুদ্ধে। এমন কী ওরই কুকুরগুলো পর্যন্তও আমাদের বিরুদ্ধে।'

'আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আন্তরিক চেষ্টা করলে ঈশ্বর আমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন।'

'তুমি ঠিক বলছ, টম চাচা?'

'হ্যাঁ, মিসিস। তোমাদের হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব। আর একটা কথা, তোমাদের পক্ষে পালানোটা কিন্তু কিছু কঠিন নয় ... যদি সঙ্গে কিছু টাকা থাকে।'

'আমার বেশ কিছু জমানো টাকা আছে, টম চাচা।'

'তাহলে তো খুব ভালোই হবে। তুমি জানো না মিসিস, প্রথম দিন তোমাকে দেখেই আমি চমকে উঠেছিলাম। কিন্তু ঈশ্বর তোমাকে আমার কাছে না পাঠালে আমি তোমাকে কোনোদিনই চিনতে পারতাম না, ভাবতাম তুমি বুঝি সত্যিই কোনো শ্বেতাঙ্গ মহিলা। তাই বলছিলাম, তুমি যদি ফরাসি কোনো সম্ভ্রান্ত মহিলার ছদ্মবেশে এখান থেকে চলে যাও কেউ তোমাকে ধরতে পারবে না। এমিলিন হবে তোমার পরিচারিকা। তোমার মেয়ে এলিজাও ঠিক এমনিভাবে চলে গিয়েছিল, কেউ ওকে চিনতে পারে নি।'

'আমার মেয়ে, এলিজা!' কেসি বিস্মিয়ে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, মিসিস।'

'কেন তুমি ওকে চিনতে নাকি?'

'শুধু চিনতাম না, ও ছিল আমার নিজের সন্তানের চাইতেও বড়। আমি ছিলাম ওর আদরের টম চাচা। আমার মনিবানি, মিসেস শেলবি, অসীম স্নেহ-যত্নে, শিক্ষা-দীক্ষায় এলিজাকে সেই সাত বছর বয়স থেকে নিজের মেয়ের মতো করেই মানুষ করেছিলেন। বিয়ে দিয়েছিলেন জর্জ নামে অত্যন্ত প্রতিভাবান সুন্দর একটি তরুণের সঙ্গে। হ্যারি নামে ওদের ফুটফুটে একটা বাচ্চাও আছে। আমার মনিবানির মতো মমতাময়ী মহিলা আমি জীবনে আর কখনো দেখি নি, তাই কোনো চাকর-বাকরকে উনি কখনো বিক্রি করতে চান নি। ঋণের দায়ে বাধ্য হয়ে কর্তা যখন হ্যারি আর আমাকে অন্য একটা লোকের কাছে বিক্রি করে দিলেন, জানতে পেরে এলিজা সেই রাতেই বাচ্চাটাকে নিয়ে পালিয়ে যায়। এই

ঘটনাটা শুধু জানতাম আমি আর জানতেন মিসেস শেলবি। আমরা দুজনেই ঈশ্বরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানিয়েছিলাম যাতে ওরা কখনো ধরা না পড়ে। মাস্টার শেলবির চিঠিতে জানতে পেরেছিলাম, ধরা ওরা পড়ে নি, ইরি হ্রদ অতিক্রম করে ওরা নির্বিঘ্নেই কানাডায় পৌছতে পেরেছিল। এলিজা এখন সুখে স্বামীর ঘর-সংসার করছে। যদি সম্ভব হয় তোমরাও কানাডায় পৌছে ওদের সঙ্গে মিলিত হতে পারো।'

ঘটনার আকস্মিকতায় কেসি যেন একেবারে স্থবির হয়ে গেছে। অথচ এতদিনের যে সুপ্ত বাসনাটা তুচ্ছ একটা নুড়ির মতো পথের ধুলায় কেবলই পদদলিত হচ্ছিল, হঠাৎ তা যেন আবিষ্কৃত রত্নের মতো রাতের অন্ধকারে দ্যুতিময় হয়ে উঠল। পালাবার সমস্তরকম সম্ভাবনা আর সতর্কতার কথা কেসি বহুকাল আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল, কেবল উৎসাহের অভাবেই তা কখনো বাস্তব হয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু এই মুহূর্তে অত্যন্ত সহজ, সম্ভাব্য একটা পরিকল্পনা ওর মাথায় এল এবং চকিতে ওর আশাকে উজ্জ্বল একটা আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলল।

হঠাৎ টমের হাত দুটো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে কেসি বলল, 'তাহলে কি আমি সত্যিই চেষ্টা করব, টম চাচা?'

'নিশ্চয়ই। ঈশ্বর তোমাদের সাহায্য করুন।'

'বিদায়, টম চাচা।

'বিদায় কেসি।'

একত্রিশ

শহীদ

কেসি আর এমিলিনের পালিয়ে যাওয়ার খবর সাইমন লেগ্রিকে অসম্ভব ক্রুদ্ধ করে তুলল। পরের দিন দুপুরে ঘুম ভাঙার পরেও প্রথমটায় সে কিছু আঁচ করতে পারে নি। কিন্তু প্রতিটা

ঘর আর বাড়ির আশেপাশে বেশ খানিকক্ষণ খোঁজাখুজির পর যখন তার টনক নড়ল, তখন বিকেল গড়িয়ে গেছে। প্রথমে সে খুব অবাক হলো, পরক্ষণেই প্রচণ্ড রাগে যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে আবাদভূমিতে খোঁজ করল। যদি কোনো কারণে এখানে এসে থাকে। সেখানেও ওদের কোনো হদিশ পাওয়া গেল না।

ইতিমধ্যে কেসি আর এমিলিনের পালিয়ে যাওয়ার খবরটা সবাই জেনে ফেলেছে, চারদিকে শুরু হয়ে গেছে হইচই আর স্বতঃস্ফূর্তভাবেই খোঁজাখুজির পালা। দূর থেকে লেগ্রি লক্ষ করল, খবরটা শোনামাত্র টমের চোখ দুটো যেন খুশিতে ঝিকমিক করে উঠল, হাত দুটো ওপরে তুলে কার কাছে করুণা ভিক্ষে চাইল। খুঁজে বার করার কাজে যে-সব ক্রীতদাস নিজে থেকেই লেগ্রির দলে যোগ দিয়েছে, তাদের মধ্যেও সে টমকে দেখতে পায় নি। লেগ্রির ইচ্ছে হলো এক্ষুনি গিয়ে শয়তানটার কলার ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে আসে, কিন্তু গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা তাকে যেন সতর্ক করে দিয়ে বলল ওকে দিয়ে একাজ করানো যাবে না। তাই অহেতুক আর নতুন কোনো ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে সে দলবল নিয়ে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ল।

সুতরাং টম আর অল্প কয়েকজন, যাদের টম প্রার্থনা করতে শিখিয়েছিল, তারা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এসে পলাতকরা যাতে ধরা না পড়ে তার জন্যে প্রার্থনা জানানোর অবকাশ পেল।

সন্ধ্যের পর ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে লেগ্রি যখন ফিরে এল, হতাশার চাইতে টমের প্রতি ঘৃণায় তার সমস্ত অন্তর ভরে উঠল। টমের নিঃশব্দ প্রতিরোধই তাকে সব চাইতে বেশি উত্তেজিত করে তুলেছে। রাতে বিছানায় শুতে যাবার সময়ও সে নিজের মনে বলল, 'আমি ওই কালো কুকুরটাকে ঘৃণা করি! ও আমার। আমি কি ওকে বারো শো ডলার দিয়ে কিনি নি? ওকে দিয়ে কি আমি যা খুশি তাই করাতে পারি না?' লেগ্রি এমনভাবে হাতের মুঠো পাকালো যেন তার হাতে কিছু একটা আছে, যেটাকে সে ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায়। অবশ্য এ কথা ঠিক, মনে মনে টমকে ঘৃণা করলেও, লোকটা কিন্তু বিশ্বস্ত, কর্মী হিসেবে সত্যিই তার কোনো তুলনা হয় না। যেমন করে হোক তাকে নতজানু করাতেই হবে!

পরের দিন সকালে লেগ্রির নিজের দলবল ছাড়াও, আশেপাশের শহর থেকে প্রতিবেশী কয়েকজন আবাদকারী তাদের চাকর-বাকরদের নিয়ে হাজির হলো। দলের প্রথমেই রইল কয়েকজন ঘোড়সওয়ার। হাতে বন্দুক, সঙ্গে শিকলছাড়া ভয়ঙ্কর সেই কুকুরগুলো। সবাই তখন শিকারের নেশায় একেবারে উন্মাদ। লেগ্রি সাম্বোকে আগে থেকেই হুকুম করে রাখল কেসিকে ধরতে না পারলে যেন সোজা গুলি চালায়। তারপর উল্লাসে চিৎকার করতে করতে সমস্ত দলটা কয়েকটা ভাগে ভাগ হয়ে জলার দিকে চলে গেল।

সারাটা দিন ব্যর্থ অনুসন্ধানে কেটে গেল। সন্ধ্যের সময় ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে লেগ্রি ফিরে এল।

কবরের মতো থমথম করছে তার মুখটা। ঘোড়া থেকে নেমে সে সোজা বৈঠকখানায় চলে গেল। কুইম্বোকে বলল, 'টমকে এক্ষুনি এখানে ডেকে নিয়ে আয়! এই ঘটনার মূলে আছে ওই শয়তানটা। আমি জানতে চাই আসল ব্যাপারটা কী।'

সাম্বো আর কুইম্বো পরস্পরকে ঘৃণা করত, কিন্তু টমকে হিংসে করত ওরা দুজনেই। তাই বিপুল উল্লাসে ওরা টমকে ধরে নিয়ে এল। 'চলো না বাছাধন, আজ তুমি মজাটা টের পাবে! কর্তা রেগে একেবারে আগুন হয়ে আছে!'

ব্যাপারটা টম আগেই অনুমান করতে পেরেছিলেন, তাই ওদের কোনো উক্তিই তার কানে গেল না। সে তখন একমনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে চলেছে। একসময় টম স্পষ্ট শুনতে পেল কে যেন বলছে, 'ওদের কাউকে তুমি ভয় করো না, টম। ওরা কেবল তোমার দেহটাকেই খুন করতে পারে, তারপর ওরা তোমার আর কিছুই করতে পারবে না।' ঈশ্বরের কোমল স্পর্শের মতো শব্দগুলো তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলল, হাজার মানুষের শক্তিতে বলিষ্ঠ করে তুলল তার সত্তাকে। চীনাবীথি অতিক্রম করে আসার সময় এখানকার সবকিছুই তার কাছে কেমন যেন অবাস্তব মনে হলো, মানসচক্ষে নিজের আবাসভূমিটাকে সে পরিষ্কার দেখতে পেল, স্পন্দিত বুকে স্পষ্টই উপলব্ধি করতে পারল, ঘনিয়ে এসেছে তার মুক্তির অন্তিম লগ্ন।

'এই কুকুর', পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে টমের কলারটা চেপে ধরে লেগ্রি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'ঠিক করেছি তোকে খুন করে ফেলব।'

শান্তস্বরে টম জবাব দিল, 'সম্ভবত তাই, স্যার।' এমন নিস্পৃহতার লেগ্রি প্রচণ্ড ক্ষেপে গেল। 'নিশ্চয়ই তাই করব, যদি না বলিস ওরা কোথায়।'

টম কোনো জবাব দিল না।

'কি রে কুকুর, কানে শুনতে পাচ্ছিস না?' আগেরই মতো শান্তস্বরে, খুব ধীরে ধীরে টম উচ্চারণ করল।

'বল, তুই কিচ্ছু জানিস না?'

টম নীরব।

'কি রে, জবাব দিচ্ছিস না যে?' সজোরে চাবুক কষিয়ে লেগ্রি ধমকে উঠল, 'তুই কিছু জানিস না?'

'হয়তো কিছু জানি, কিন্তু বলতে পারব না।'

প্রচণ্ড ক্রোধে লেগ্রির শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এল। দুহাতে টমকে ধরে নিজের মুখের কাছে এনে, ভয়ঙ্করভাবে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, 'সেবার তোকে ছেড়ে দিয়েছিলাম বলে কি ভেবেছিস এবারেও তুই পার পেয়ে যাবি? কখনো না! এবার তোকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না। হয় আমি জিতব নয় তোকে খুন করে ফেলব, দুটোর মধ্যে যেকোনো একটা। তোর শরীরের প্রতিটা রক্তবিন্দু গুণে গুণে একেবারে নিঃশেষ করে তবে ছাড়ব।'

'স্যার, আপনি যদি অসুস্থ হতেন, আমার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে যদি আপনার মূল্যবান প্রাণটাকে বাঁচানো সম্ভব হতো, আমি সানন্দে তা দিতাম, যেমন ঈশ্বর স্বেচ্ছায় আমার শরীরে দিয়েছেন তাঁর প্রতিটা রক্তবিন্দু। আমি খুবই তুচ্ছ, তবু আমার অনুরোধ স্যার, আপনি নিজে থেকে এই জঘন্য পাপ কাজটা করবেন না। এতে আমার চাইতে আপনারই বেশি কষ্ট হবে এবং যত দিন না অনুতপ্ত হবেন, আপনি কোনোদিনই মুক্তি পাবেন না।'

টমের কথা বলার ভঙ্গিতে, তার শান্ত সৌম্য মূর্তিতে, তার স্থির চোখের দৃষ্টিতে এমন অলৌকিক একটা কিছু ছিল, যা মুহূর্তের জন্যে লেগ্রিকে বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত করে দিল। নীরবতার সেই মুহূর্তে পুরনো দেওয়ালঘড়ির টিক টিক শব্দটাও স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল।

কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই লেগ্রির অশুভ আত্মাটা যেন জেগে উঠল আর সাতটা মানুষের ক্রোধ একসঙ্গে ফেটে পড়ল প্রচণ্ড আক্রোশে, বিধ্বস্ত করে দিল টমের সৌম্য মূর্তিটাকে।

তারপর রক্ত আর নিষ্ঠুরতায় যে দৃশ্যের অবতারণা হলো, নিজের চোখে দেখা বা শোনা তো দূরের কথা, কোনো মানুষের পক্ষে কল্পনা করে নেওয়াও সম্ভব নয়। আর আমি যদি তোমাদের সে কথা বলি, তোমরা নিশ্চয়ই আতঙ্কে শিউরে উঠবে। তবু এই নিষ্ঠুর বর্বরতাকে আমাদের দেশের আইন তার নিবিড় পক্ষপুটে ঢেকে রাখে, আমাদের দেশের গির্জা নীরবে তাকে সমর্থন করে!

সেই নির্জন রাত্রে, লেগ্রির বৈঠকখানায়, টমকে বাঁচানোর আর কেউ ছিল না। কিন্তু সত্যিই কি তাই? তার যন্ত্রণা, তার লজ্জা, তর আত্মঅবমাননা, সে কি শুধু তার একার, আর কারো নয়? নিশ্চয়ই, আর একজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, যিনি নিজেও রক্তাক্ত আর নির্যাতিত হচ্ছিলেন, নইলে টমের যন্ত্রণা এমন গৌরবময়, টমের অস্তিত্ব কখনো এমন ভাস্বর হয়ে উঠতে পারত না।

লেগ্রি, সাম্বো আর কুইম্বো, তিন জনে পালা করে চাবকে যাওয়া সত্ত্বেও ঝড় তখনো থামে নি, ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসে উঠছে, আছড়ে পড়ছে, তীক্ষ্ণ স্বননে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলছে নিষ্পাপ অপরাধীর সর্বাঙ্গ; অথচ দুঃসাহসী মানুষটার প্রকৃত হৃদয় তখনো শক্ত করে আঁকড়ে রয়েছে সেই চিরন্তন পাথরটাকে। যিশুর মতো টমও উপলব্ধি করতে পেরেছে, অন্যদের বাঁচাতে গেলে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

রক্তাপ্লুত, নির্যাতিত মানুষটার ধৈর্য দেখে একসময়ে সাম্বো নিজে বিচলিত হয়ে উঠল, সভয়ে বলল, 'স্যার, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এবার ছেড়ে দিন!'

'চালা, চালা, সোজা চাবুক চালিয়ে যা!' খ্যাপা ষাঁড়ের মতো লেগ্রি চেঁচিয়ে উঠল। 'যতক্ষণ না নিজে মুখে স্বীকার করছে, ওর আর নিস্তার নেই। ওর প্রতিটা রক্তবিন্দু আমি নিঙড়ে নিয়ে তবে ছাড়ব।'

ধীরে ধীরে চোখ মেলে টম মনিবের মুখের দিকে তাকাল। 'সত্যিই আপনি হতভাগ্য! এখন আপনি আমার আর কিছুই করতে পারবেন না। আপনাকে আমি সর্বান্তকরণে ক্ষমা করে গেলাম!'

কথাটা বলেই টম অচৈতন্য হয়ে পড়ল।

'যাক, এতক্ষণে আপদটা বিদায় হয়েছে বলে মনে হচ্ছে!' দুপা এগিয়ে এসে লেগ্রি একটু ঝুঁকে টমের দিকে তাকাল। 'হুঁ! এবার আর কিছু না হোক, ওর মুখটা অন্তত বন্ধ হবে। সেটাও এক দিক থেকে স্বস্তি!'

হ্যাঁ, একদিক থেকে কথাটা সত্যি হলেও, জীবনে এই যে প্রথম বুকের ভেতরে জ্বলন্ত ক্রোধের লেলিহান শিখাটাকে নেভাতে পারল না, এই পরাজয়ের গ্লানির হাত থেকে তুমি কি সত্যিই কোনোদিন স্বস্তি পাবে, লেগ্রি?

সাময়িকভাবে মনে হলেও, টম কিন্তু সম্পূর্ণ শেষ হয়ে যায় নি। তার শেষের কথাগুলো নিষ্ঠুরতার হাতিয়ার হিসেবে যারা এতক্ষণ সক্রিয় অংশ নিয়েছিল, সেই বর্বর কালো মানুষ দুটোর হৃদয়কে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেল। লেগ্রি ওপরে উঠে যেতেই, ওরা টমের অচৈতন্য দেহটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল, যেন টমের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়াটা ওদের নিতান্তই প্রয়োজন।

সাম্বো বলল, 'এর জন্যে সত্যিকারের শাস্তি মনিবেরই পাওয়া উচিত, আমাদের নয়।'

'আমরাও অপরাধী। টমের কাছে আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত।'

দুজনে মিলে টমের ক্ষতস্থানগুলো ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার করল, তারপর ছেঁড়া ন্যাকড়া আর তুলোর বস্তা দিয়ে শয্যা পেতে ধরাধরি করে তাকে শুইয়ে দিল। তাক থেকে ব্র্যান্ডির বোতলটা পেড়ে জলের সঙ্গে খানকটা মিশিয়ে সাম্বো টমের গলায় ঢেলে দিল।

'টম, শোনো, টম!' আস্তে আস্তে কুইম্বো তাকে নাড়া দিল। 'আমাদের কথা তুমি শুনতে পাচ্ছ?'

একসময় যেন ঘুমের অতল থেকে টম ধীরে ধীরে চোখ মেলল।

'আমরা সত্যিই তোমার সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করেছি, টম।'

ক্ষীণস্বরে টম বলল, 'আমি তোমাদের মনেপ্রাণে ক্ষমা করলাম ভাই। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।'

'আগে করতাম না। কিন্তু এখন তোমাকে বিশ্বাস করি।' আগ্রহভরে সাম্বো বলল।

'আমি বিশ্বাস করি, তুমি বললে ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষমা করবেন।'

'তোমরাও যদি ওঁর কাছে কখনো প্রার্থনা করো, উনি নিজে তোমাদের বুকে টেনে নেবেন।'

টমের নিষ্কলুষ, বেদনার্ত কণ্ঠস্বরে বন্য মানুষ দুটোরও চোখে জল এসে গেল।

বত্রিশ

জর্জ শেলবি

এই ঘটনার দুদিন পর, চীনাবীথির মধ্যে দিয়ে সুন্দর একখানা এক্কা এসে থামল গাড়িবারান্দার নিচে। লাগামজোড়া ঘোড়ার পিঠের ওপর ছুড়ে দিয়েই গাড়ি থেকে নেমে এল ভারি সুন্দর দেখতে একজন তরুণ। সে প্রথমেই গৃহস্বামীর খোঁজ করতে লাগল।

www.alorpathsala.org

এই তরুণটি আমাদের পূর্বপরিচিত জর্জ শেলবি। কেমন করে সে এখানে এসে পৌঁছল, সে কাহিনী শোনাতে গেলে আমাদের কেন্টাকিতে ফিরে যেতে হবে।

মিসেস শেলবিকে লেখা মিস ওফেলিয়ার চিঠিটা দুর্ভাগ্যবশত পাড়াগাঁয়ের কোনো ডাকঘরে মাস দুয়েকের জন্যে আটকে পড়েছিল, তারপর যখন নির্দিষ্ট ঠিকানায় এসে পৌঁছল, টম তখন রেড নদীর জলাভূমি অঞ্চলে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

চিঠিখানা পড়ে মিসেস শেলবি খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেন, কিন্তু সেই মুহূর্তে ওঁর কিছু করার ছিল না। মৃত্যুপথযাত্রী স্বামীর শয্যার পাশে ওঁকে প্রায় সারাক্ষণই আটকে থাকতে হতো। ওঁর শুধু একটাই মাত্র সান্ত্বনা। কিশোর জর্জ এখন পরিণত যুবক, মার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত এবং প্রয়োজনে বাবার সবরকম কাজেই ওঁকে সাহায্য করে। মিস ওফেলিয়া সৌভাগ্যবশত সেন্ট ক্লেয়ারের হয়ে যিনি সম্পত্তি দেখাশোনা করছিলেন, তাঁর নাম-ঠিকানাটাও জানিয়েছিলেন। কিন্তু মিস্টার শেলবির আকস্মিক মৃত্যুর পর আনুষ্ঠানিক এবং সম্পত্তিগত নানান জটিলতায় মিসেস শেলবিকে অসম্ভব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। কেননা নিপুণ দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও মিসেস শেলবি বা জর্জ কেউই দেনার ব্যাপারটাকে আদৌ শোভন চোখে দেখতে পারেন নি। তাই কিছু সম্পত্তি বিক্রি করে সমস্ত ব্যাপারটাকে আয়ত্তে আনতেও তাঁদের বেশ কিছু সময় লেগেছিল।

ইতিমধ্যে আইনজীবী যে ভদ্রলোক সেন্ট ক্লেয়ারের সম্পত্তি দেখাশোনা করছিলেন, তাঁকে লেখা একটা চিঠির জবাবে জানা গেল, টমের ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে তিনি কিছু জানেন না, কেননা সবাইকে একসঙ্গে সরকারি নিলামে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজনবোধে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করাটা সহজসাধ্য ব্যাপার নয় ভেবে জর্জ নিজেই মার অনুমতি নিয়ে টমের খোঁজে নিউ অর্লিয়েন্সের পথে পাড়ি জমাল। প্রথমে সে শুধু এইটুকু জানতে পারল, নিলাম থেকে বিক্রি হয়ে যাবার পর আমাদের এই কাহিনীর নায়ককে রেড নদীতে স্টিমারে চড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু কোথায় তা কেউ বলতে পারল না। অবশেষে পয়সা দিয়ে লোক লাগিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পর জর্জ শেলবি আজ এখানে এসে পৌঁছেছে।

অচিরেই তাকে গৃহস্বামীর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। প্রায় মাতাল অবস্থায় সাইমন লেগ্রি তখন ঘাড় গুঁজে বসে রয়েছে তার বার-বাড়ির বৈঠকখানায়।

'যদি কিছু মনে না করেন, আপনিই মিস্টার সাইমন লেগ্রি?'

আগন্তুককে দেখে লেগ্রি খুবই অবাক হলো।

'হ্যাঁ। কী চাই বলুন?'

'আমি শুনেছি নিউ অর্লিয়েন্সের সরকারি নিলাম থেকে আপনি টম নামে একজন ক্রীতদাসকে কিনেছিলেন। একসময় সে আমাদের বাড়িতে কাজ করত। যদি তাকে কিনে নেওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

ক্রোধে, বিস্ময়ে লেগ্রির ঝাঁকড়া ভ্রূদুটো আপনা থেকেই বেঁকে একেবারে ধনুক হয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে সে কোনোরকমে বলল, 'হ্যাঁ, আমি ওকে কিনেছিলাম বটে। রীতিমতো ভালো পয়সা দিয়েই কিনেছিলাম। কিন্তু ওই কালো কুকুরটা এমন পাজির পা-ঝাড়া যে ওর জন্যেই আমার দুটো ক্রীতদাসীকে হারাতে হয়েছে। আজকের দিনে যার দাম

খুব কম করেও হাজার ডলার! টম সবকিছু জানত এবং ও-ই ওদের পালাতে সাহায্য করেছে। আমি যখন এ ব্যাপারে ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, শয়তানটা কী বলল জানেন? বলল, আমি জানি, কিন্তু বলব না! তখন আমি রাগের মাথায় এমন চাবকালাম যে বাছাধন এখন আর নড়তেই পারছে না। আমি সাধারণত চাকর-বাকরদের কখনো কিছু বলি না, কিন্তু ওটা এমনই গোঁয়াড় যে ...'

ধৈর্য হারিয়ে জর্জ বলে উঠল, 'ও কোথায়? আমি কি ওকে একবার দেখতে পারি?'

সেই মুহূর্তে লেগ্রি কোনো জবাব দিল না।

আবেগে, উদ্বিগ্নতায় জর্জের চোখমুখ লাল হয়ে উঠল, তবু মুখে সে কিছু বলল না।

যে ছেলেটি জর্জের ঘোড়া ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, উল্লাসে বলে উঠল, 'ওই চালা ঘরটাতে রয়েছে।'

লেগ্রি ছেলেটাকে লাথি মেরে, গালাগালি দিয়ে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিল। জর্জ কিন্তু অপেক্ষা না করে দ্রুতপায়ে সেই চালা ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল।

রক্তাক্ত সেই ঘটনার পর থেকে দুদিন টম প্রায় অচৈতন্য অবস্থায় এই চালা ঘরটাতে পড়ে রয়েছে। তার সারা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলেও শক্তিশালী, বলিষ্ঠগঠন দেহের খাঁচা থেকে প্রাণপাখিটা তখনো উড়ে যায় নি। টমের জল্লাদরাই রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি এসে তার সেবা-শুশ্রূষা করেছে, তাকে জল খাইয়েছে। প্রকৃত ভালোবাসার স্পর্শ পেয়ে টম দু-একবার ওদের দিকে কৃতজ্ঞতার চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে নি।

চালায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই জর্জের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল, হৃদপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে উঠল। মুমূর্ষু মানুষটার প্রতি ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতায়, অনুশোচনায় তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। এখানে নাম ছাড়া যে মানুষটার সম্পর্কে কেউ আর প্রায় কিছুই জানে না, তার এই শোচনীয় পরিণতিতে দুঃখ বা কষ্টের চাইতে নিজেকে তার সবচেয়ে বেশি অপরাধী মনে হলো। অনুতাপে বেদনায় জর্জের সংবেদনশীল সুন্দর মুখখানা তখন একেবারে কালো হয়ে গেছে।

'হা, ঈশ্বর; এও কি সম্ভব!' টমের পাশে নতজানু হয়ে জর্জ মৃদুভাষে ডাকল, 'টম চাচা, দীর্ঘদিনের পুরনো বন্ধু আমার!'

জর্জের কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল, যা মৃত্যুপথযাত্রী মানুষটার একেবারে মর্মস্থলে গিয়ে বিঁধল। ধীরে ধীরে মাথাটা একপাশে হেলিয়ে টম ম্লান ঠোঁটে হাসল।

জর্জ একটু ঝুঁকে আসতেই দুফোঁটা উষ্ণ অশ্রু ঝরে পড়ল পৌরুষদীপ্ত, বলিষ্ঠ, কালো মানুষটার বুকের ওপর, যেন ওদুটো তার শেষ সম্মানের প্রতীকচিহ্ন।

'টম চাচা! প্রিয় টম চাচা আমার! তাকিয়ে দেখ, একবার শুধু কথা বলো! দেখো, আমি তোমার মাস্টার জর্জ ... তোমার সেই আদরের ছোট্টো মাস্টার জর্জ! আমায় তুমি চিনতে পারছ না?'

'মাস্টার জর্জ!' আস্তে আস্তে চোখ মেলে অত্যন্ত ক্ষীণস্বরে টম বলল। 'মাস্টার জর্জ!'

একটু একটু করে বিহ্বলতা কাটিয়ে তার অন্তর যেন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, ফিরে এল চোখের দীপ্তি। নির্নিমেষ চোখে জর্জের দিকে তাকাতেই তার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, চিবুক বেয়ে গাড়িয়ে এল অশ্রুধারা।

'ঈশ্বরের অসীম কৃপা, উনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন। আমি জানতাম ... আমি জানতাম ওঁরা আমাকে ভোলেন নি! আঃ, এখন যে আমার কী ভালো লাগছে। এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব! ঈশ্বর, আমাকে তুমি করুণা করো!'

'তুমি মরবে না, টম চাচা! আমি তোমাকে কিছুতেই মরতে দেব না। আমি তোমাকে কিনে নেওয়ার জন্যে এসেছি। আমি তোমাকে বাড়ি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে এসেছি, টম চাচা।' আবেগদীপ্ত স্বরে জর্জ বলল।

'ও, মাস্টার জর্জ, তুমি বড্ড বেশি দেরি করে ফেলেছ। ঈশ্বর আমাকে কিনে নিয়েছে। উনিই আমাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন। সেখানে যাবার জন্যে আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। কেন্টাকির চাইতে স্বর্গ অনেক ভালো।'

'না টম চাচা, না! তুমি মরো না। তুমি মারা গেলে আমার বুক ভেঙে যাবে। যখনই ভাবব অত্যন্ত সাধারণ একটা চালা ঘরের নিচে, কী নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যে, হতভাগ্য ...'

'না না, মাস্টার জর্জ, আমাকে হতভাগ্য বলো না!' শান্তস্বরেই টম বলল। 'অতীতে এক সময় হতভাগ্য ছিলাম, কিন্তু এখন আমি আর হতভাগ্য নই। এখন আমি পৌঁছে গেছি অনন্তের সেই সিংহতোরণে, মাস্টার জর্জ! স্বর্গ এসেছে আমায় নিতে। আজ আমি জয়ী। ঈশ্বরই আমাকে তা দিয়েছেন।'

কাটা কাটা হলেও, শব্দগুলোর মধ্যে এমন একটা গভীর আবেগ আর শ্রদ্ধা জড়ানো ছিল যা তরুণ শেলবিকে বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত করে দিল। টমের বিশীর্ণ অথচ উজ্জ্বল মুখটার দিকে তাকিয়ে সে চুপচাপ বসে রইল।

জর্জের একটা হাত আঁকড়ে ধরে টম বলে চলল, 'আমার এখানকার এই অবস্থার কথা ক্লোকে কিছু বোলো না। ওর বুক ভেঙে যাবে। ওকে শুধু বোলো আমি আর অপেক্ষা করতে পারি নি, তাই চলে গেছি অনন্তের দিকে। আর ওকে বোলো ঈশ্বর সারাক্ষণই আমার পাশে পাশে ছিলেন এবং উনি সবকিছুকেই খুব সহজ আর আলোকিত করে রেখেছিলেন। শুধু মাঝে মাঝে আমার ছেলে-মেয়েগুলোর জন্যে অন্তর কেঁদেছে! ওদের বোলো ওরা যেন আমাকেও কখনো ভুলে না যায়। মাস্টার, মিসিস আর ওখানকার সবাইকে আমার ভালোবাসা জানিও। ওদেরকে বোলো এ পৃথিবীর প্রতিটা মানুষকেই আমি ভালোবাসি।'

'উঃ, ওই লেগ্রি শয়তানটাকে আমি যদি গলা টিপে শেষ করে দিতে পারতাম!' দাঁতে দাঁত চেপে জর্জ অস্ফুট স্বরে বলল।

জর্জের হাতটা আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরে টম বলল, 'না, জর্জ, না। ও কথা বোলো না!'

'কিন্তু আমি খুব ভালো করেই জানি টম চাচা, এর মূল্য ওকে একদিন কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে দিতে হবে!'

'সত্যিই ও খুব হতভাগ্য, জর্জ। একবার অনুতপ্ত হলে ঈশ্বর ওকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করতেন। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে ও কোনোদিনই তা করবে না।'

'না করাই ভালো', ক্ষুব্ধস্বরে বলল, 'আমি ওকে কোনোদিনও স্বর্গে দেখতে চাই না!'

টম ম্লান ঠোঁটে হাসল, 'ও যে আমার কী উপকার করেছে, তুমি জানো না, জর্জ। ও আমার কোনো ক্ষতি করতে পারে নি, বরং স্বর্গের দুয়ারটাকে আমার জন্যে আরো তাড়াতাড়ি খুলে দিয়েছে!'

জর্জ শেলবিকে চিনতে পারার মুহূর্ত থেকে ভেতরের যে চাপা দীপ্তিটা এতক্ষণ টমের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ছিল, সহসা তা যেন নিভে গেল। সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল ম্লানিমার একটা ছায়া, ধীরে ধীরে বুজে গেল চোখের পাতাদুটো। এখন টমকে খুব কষ্ট করে টেনে টেনে শ্বাস নিতে হচ্ছে, অসম্ভব দ্রুত ওঠা-নামা করছে চওড়া বুকটা। একসময় তাও ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এল, ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল খুবই অস্পষ্ট একটা হাসির রেখা। মুখ থেকে ম্লানিমার গাঢ় ছায়াটা সরে গিয়ে ফুটে উঠল সৌম্য একটা প্রশান্তি। আর ঠিক তখনই চোখ দুটোকে পরিপূর্ণভাবে মেলে দিয়ে টম অস্ফুটস্বরে শুধু বলল, 'হা, ঈশ্বর!'

তারপরেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করে সে চিরনিদ্রায় ডুবে গেল।

জর্জ এতক্ষণ টমের হাতটা মুঠোর মধ্যে নিয়ে স্থাণুর মতো বসেছিল, এবার টমের চোখের পাতাদুটো বন্ধ করে দিয়ে জর্জ উঠে দাঁড়াল। বাইরে বেরিয়ে আসতেই সে অদূরে লেগ্রির রুক্ষ মূর্তিটা দেখতে পেল। ওকে দেখেই প্রচণ্ড ক্রোধে, ঘৃণায় জর্জের সারা শরীর রি রি করে উঠল। তবু কোনোরকমে নিজেকে সামলে রেখে, তীক্ষ্ণ চোখে ওর দিকে তাকিয়ে জর্জ বলল, 'আপনার যা করার ছিল, সবই তো করা হয়ে গেছে। এখন ওই দেহটার জন্যে কত দিতে হবে? আমি ওকে ভদ্রভাবে কোথাও কবর দিতে চাই।'

'মরা নিগ্রো আমি বেচি না। আপনি ওকে নিয়ে গিয়ে যেখানে খুশি, যেমন খুশি কবর দিতে পারেন।'

টমের মৃতদেহটাকে ঘিরে তখন দু'তিন জন নিগ্রো দাঁড়িয়ে ছিল। জর্জ সেখানে গিয়ে ওদের বলল, 'দেহটাকে গাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে একটু সাহায্য করো না, ভাই। আর তোমরা যদি কেউ আমাকে একটা কোদাল দিতে পারো খুব ভালো হয়।'

খুশি হয়ে ওরা জর্জের সঙ্গে ধরাধরি করে টমের দেহটা গাড়ি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে এল, অন্য একজন ছুটল কোদাল আনতে। জর্জ কোটটা খুলে আসনের ওপর বিছিয়ে দিল, ওরা মৃতদেহটা শুইয়ে দিল তার ওপর।

বৈঠকখানার সামনে এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে লেগ্রি আপন মনে চুরুট ফুঁকছিল, জর্জ ওর দিকে ফিরে দৃঢ়স্বরে বলল, 'নৃশংস এই ঘটনার জন্যে আমি এখনো পর্যন্ত আপনাকে একটা কথাও বলি নি, কথা বলার উপযুক্ত জায়গা বা সময়ও এটা নয়। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, নিষ্পাপ, সরল এই মানুষটার রক্ত আপনাকে ছেড়ে কথা বলবে না। খুনের অভিযোগে আমি আপনার নামে আদালতে নালিশ করব। আপনার ভালোমানুষির মুখোশ আমি টেনে খুলে দেব।'

'আপনার যা খুশি তাই করতে পারেন।' অবজ্ঞার ভঙ্গিতে লেগ্রি পোড়া চুরুটের শেষ অংশটা মাটিতে ছুড়ে ফেলে দিল। 'আদালতে অভিযোগ করে কোনো ফল হবে না। আশেপাশে এমন একজনও শ্বেতাঙ্গকে যোগাড় করতে পারবেন না, যিনি আপনার হয়ে সাক্ষী দেবেন। আর দক্ষিণের এই আদালতগুলোর কোনোটাতেই নিগ্রোদের সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং আপনি আমার কিছু করতে পারবেন না। তাছাড়া মরা একটা কুকুরের জন্যে মিছেমিছি এত হইচই করেই বা আপনার কী লাভ?'

ছোট্ট একটা শব্দ যেন জর্জের চাপা ক্রোধের বারুদে আগুন ধরিয়ে দিল, দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল তার শিরার প্রতিটা রক্তবিন্দু। চকিতে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুঁসি বসিয়ে দিল লেগ্রির চোয়ালে। চরকির মতো একপাক ঘুরে লেগ্রি সজোরে আছড়ে পড়ল মাটিতে। অসম্ভব রাগে কাঁপতে কাঁপতে জর্জ বলল, 'আর একটাও শব্দ উচ্চারণ করলে আমি জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলে দেব!'

আঘাতের তীব্রতায় লেগ্রি সেই মুহূর্তে মাটি ছেড়ে উঠতে পারল না। দু-তিন জন নিগ্রো ক্রীতদাস, যারা খুব কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, তারা কেউই এগিয়ে এসে লেগ্রিকে সাহায্য করল না, বরং বীরের প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। দৃঢ়পায়ে এগিয়ে গিয়ে জর্জ চালকের আসনে বসল। গাড়িটা ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল। নিগ্রো ক্রীতদাসরা নীরবে গাড়িটাকে অনুসরণ করল।

কোট থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে সাইমন লেগ্রি যখন উঠে দাঁড়াল, গাড়িটা তখন পথের বাঁকে হারিয়ে গেছে।

আবাদের সীমানা ছাড়িয়ে জর্জ শুকনো বালির ছোট একটা টিলা দেখতে পেল। টিলাটা ঝাঁকড়া কয়েকটা গাছের সুন্দর ছায়া দিয়ে ঘেরা। টমকে কবর দেওয়ার জন্যে জর্জ মনে মনে ওই টিলাটাই বেছে নিল।

নিগ্রো ক্রীতদাসেরা স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে চাওয়া সত্ত্বেও জর্জ নিজে হাতে কবরটা খুঁড়ল। সবকিছু প্রস্তুত করার পর টমকে নিয়ে আসার জন্যে ওরা তাকে সাহায্য করল।

'কোটটা কী করব, মাস্টার?'

'না না, ওটা থাকবে! ওটাসহ ওকে কবর দাও। আমি তো তোমাকে কিছু দিতে পারি নি, ওটা তোমার কাছেই থাক, টম চাচা!'

কোটটা জর্জ টমের বুকের ওপর বিছিয়ে দিল, তারপর সবাই মিলে মাটি চাপা দিতে লাগল। সব কাজ সারার পর ওরা সবুজ ডালপালা ভেঙে কবরটার ওপর বিছিয়ে দিল।

ওদের প্রত্যেকের হাতে কয়েকটা নোট গুঁজে দিয়ে জর্জ বলল, 'তোমাদের বিশ্বস্ততার পুরস্কার।'

'ঠিক আছে, এবার যাও।'

ওরা নিঃশব্দে মাথা নিচু করে চলে গেল।

কবরটার সামনে জর্জ নতজানু হয়ে বসল, অশ্রুবিহীন চোখে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, 'তোমার জন্যে আমি প্রতিজ্ঞা করছি, দেশ থেকে অভিশপ্ত এই ক্রীতদাসপ্রথা উচ্ছেদ করার জন্যে একটা মানুষের পক্ষে যা কিছু করা সম্ভব আমি তাই করব।'

আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধুর শেষ বিশ্রামের স্থানটুকু চিহ্নিত করে রাখার জন্যে কোনো স্মৃতি সৌধই গড়ে তোলা হয় নি। তার কোনো প্রয়োজনও ছিল না! ঈশ্বর জানেন সে এখন কোথায় শুয়ে রয়েছে। যখন প্রয়োজন হবে উনি নিজেই এসে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। আর যে মানুষটা সারাজীবন একাই ভারী ক্রুশকাঠিটা বয়ে নিয়ে বেড়াল, তার জন্যে দুঃখ করার কোনো প্রয়োজন নেই, কেননা "তার দুঃখও ঈশ্বরের আশীর্বাদে পরম রমণীয় হয়ে থাকবে।"

তেত্রিশ

স্বাধীন

কেবল একটা মাত্র লাইনেই জর্জ শেলবি মাকে চিঠিতে জানিয়েছিল অমুক তারিখে বাড়ি পৌঁছব। টমের আকস্মিক মৃত্যুতে সে এমনই মুষড়ে পড়েছিল যে বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও গুছিয়ে কিছু লিখতে পারে নি। তার ওপর চোখের জলেও বেশ কয়েকটা কাগজ তাকে নষ্ট করতে হয়েছে। আসলে মাকে কিছু একটা জানাতে হবে তাই, নইলে কাগজ-কলম নিয়ে বসার কোনো মানসিকতাই তার ছিল না।

এদিকে, শেলবি-ভবনে সারাদিন ব্যস্ততার আর অন্ত নেই। জর্জ শেলবির এসে পৌঁছনোর অপেক্ষায় সবাই উন্মুখ।

মিসেস শেলবি বসে রয়েছেন ওঁর সুন্দর সাজানো ভেতরের বসার ঘরটায়। প্রায় সন্ধ্যে তখন। শেষ শরতের ঠাণ্ডাকে দূর করার জন্যে মনোরম আগুন জ্বালানো হয়েছে। খাবার টেবিলে সাজানো রয়েছে ঝকঝকে বাসনপত্র। ক্লো-চাচি নিজের হাতে সবকিছু সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছে।

ক্লো-চাচি আজ সাদা ক্যালিকো কাপড়ের নতুন পোশাকটা পরেছে, মাথার চূড়ো করা চুলের ওপর একটা পাগড়ি বেঁধেছে। খুশিতে ঝিকমিক করছে ওর কালো মুখখানা। টেবিলটা সাজানো প্রসঙ্গে মনিবানিকে কিছু জিজ্ঞেস করার সময় স্পষ্টই বোঝা গেল, ভেতরের চাপা উত্তেজনাটাকে ও যেন কিছুতেই চেপে রাখতে পারছে না। বার বার ওর চোখ গিয়ে পড়ছে বাইরের গাড়ি বারান্দার ওপর।

'মাস্টার জর্জের জন্যে আমি সবচেয়ে ভালো আসনটা সাজিয়ে রেখেছি। আমি জানি বরাবর ওর আগুনের কাছটাই বেশি পছন্দ। কিন্তু স্যালি সবচেয়ে ভালো চায়ের পাত্তরটা কেন বার করল না। যেটা বড়দিনের সময় মাস্টার জর্জ মিসিসের কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল? যাই বলেন মিসিস, আমি কিন্তু ওটাই বার করছি।'

মিসেস শেলবি ছোট্ট করে শুধু বললেন, 'আচ্ছা।'

'মাস্টার জর্জ আজ আসবে ঠিক বলেছে তো?'

'হ্যাঁ, ক্লো।'

'আচ্ছা মিসিস, টমের কথা মাস্টার জর্জ কিছু লেখে নি?'

'না, ক্লো। আমার মনে হয় সময়ের অভাবে ও বেশি কিছু লিখতে পারে নি। শুধু লিখেছে আজ পৌঁছবে। বাড়ি এসে সব বলবে।'

'মাস্টার জর্জ বরাবর ওই একইরকম! সবকিছু সবাইকে নিজে মুখে শোনাতে ভালোবাসে।'

ক্লোর কথা শুনে মিসেস শেলবি মুচকি মুচকি হাসলেন।

'সারাদিন আমি খালি একটা কথাই ভাবছি, মিসিস, বুড়ো মানুষটা ঘরে ফিরে হয়তো তার নিজের ছেলে-মেয়েদেরই চিনতে পারবে না! পলি তো এখন রীতিমতো বড় হয়ে গেছে, ও এখন আর মুখচোরা সেই ছোট্ট মেয়েটি নেই। বাবা কেক ভালোবাসে জেনে নিজে হাতে বানিয়ে রেখেছে।'

মিসেস শেলবি মনে মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলেন। চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই ওঁর মন বলছিল, নিশ্চয়ই কোথাও কোনো অঘটন ঘটছে, নইলে এই ধরনের নীরবতার সত্যিই কোনো কারণ ছিল না।

'আচ্ছা, মিসিস, মাস্টার জর্জ সঙ্গে টাকা নিয়ে গিয়েছিল তো?'

'হ্যাঁ, ক্লো। তোমার জমানো টাকা ছাড়াও আমি ওর কাছে আরো বেশি টাকা দিয়েছিলাম।'

'আমি বরং এই বেলা মাস্টার জর্জের জন্যে চায়ের পাত্রটা বার করে রাখি।'

ফিরে যেতে গিয়েও ক্লোর আর যাওয়া হলো না, ঘোড়ার গাড়ির চাকার শব্দ শোনা গেল। 'ওই তো মাস্টার জর্জ এসে গেছে!'

মিসেস শেলবি উঠে গেলেন। পরক্ষণেই ছেলেকে দেখা গেল মার বুকের মধ্যে। খোলা দরজা দিয়ে ক্লো-চাচি উদ্বিগ্ন-চোখে তাকাল অন্ধকারের দিকে।

'তুমি আমাকে ক্ষমা কর, ক্লো-চাচি!' ক্লোর শক্ত হাত দুটো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে জর্জ বলল, 'সত্যিই আমি টম চাচাকে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ও আমাদের চাইতে অনেক সুন্দর একটা দেশে চলে গেছে।'

মিসেস শেলবি উচ্চকিত স্বরে কেঁদে উঠলেও ক্লো কিন্তু একটা কথাও বলল না।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে জর্জ নোটের তোড়াটা রেখে দিল খাবার টেবিলের ওপর। এতদিন যে নোটগুলো সম্পর্কে ক্লোর বুক গর্বে ফুলে উঠত, এখন সেগুলোর দিকে ফিরেও তাকাল না।

কোনো কথা না বলে ক্লো মাত্র ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, মিসেস শেলবি ওর হাত ধরে টেনে এনে চেয়ারে বসালেন, নিজেও বসলেন ওর পাশের চেয়ারটায়।

'তোমাকে কী বলে সান্ত্বনা দেব, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না ক্লো!' ওঁর মসৃণ চিবুক বেয়ে তখন অঝোরে ঝরে পড়ছে চোখের জল।

'আমি জানতাম এমনটা যে ঘটবে আমি জানতাম, মিসিস! আমি জানতাম ওকে আর কোনোদিনও দেখতে পাব না, ওর কথা শুনতে পাব না! কাউকে একবার বিক্রি করা হয়ে গেলে সে আর কোনোদিনও ফিরে আসে না!'

ক্লোর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে মিসেস শেলবি বললেন, 'শোনো, ক্লো ...'

'ও মিসিস, আমি আর কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছি না, আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে!'

'আমি জানি, ক্লো। স্বামী হারানোর ব্যথা আমি বুঝি।' অশ্রুসজল চোখে, সমবেদনায় ম্লান হয়ে আসা গলায় মিসেস শেলবি বললেন। কিন্তু যিশু ছাড়া আর কেউই তোমার ভাঙা বুক জোড়া দিতে পারবে না, ক্লো। একমাত্র উনিই পারেন স্বামীহারা শোকের সান্ত্বনা দিতে।'

অনেকক্ষণ ধরে সবাই কাঁদার পর, জর্জ ধীরে ধীরে টম চাচার মৃত্যুর শেষ গৌরবময় দৃশ্যটা বর্ণনা করল এবং সবাইকে কীভাবে তার হৃদয়ের ভালোবাসা জানিয়েছে, সে কথাও বলল।

এই ঘটনার প্রায় এক মাস পরে, একদিন জর্জ তাদের ভূসম্পত্তিতে নিয়োজিত সমস্ত ক্রীতদাস-দাসীদের ডেকে বিরাট হলঘরটাতে জড়ো করল। প্রথমটায় ওরা ব্যাপারটার গুরুত্ব কিছুই উপলব্ধি করতে পারে নি, কিন্তু প্রত্যেকের হাতে যখন একটা করে দলিল দিয়ে বলা হলো আজ থেকে ওরা স্বাধীন, এগুলো ওদের মুক্তিপত্র, তখন ওরা সত্যিই খুব অবাক হয়ে গেল। একই সঙ্গে শোনা গেল কান্না আর উল্লাসধ্বনি।

কেউ কেউ অত্যন্ত বিনীতভাবে দলিলটা ফিরিয়ে দিয়ে কাতর স্বরে মিনতি করল স্বাধীনতার চাইতে আমরা এখানে অনেক ভালো আছি, কর্তা। এতদিনের পুরনো মনিব-মনিবানিকে ছেড়ে আমরা কোথাও যেতে চাই না।

ওদের উদ্বিগ্ন-কাতর সরল মুখগুলোর দিকে তাকালে সত্যিই মায়া হয়।

'বহুদিনের পুরনো বন্ধুরা আমার, এ জায়গা থেকে আমাদের ছেড়ে আমাদের কোথাও চলে যেতে হবে না। জমি আর বাড়ির প্রতিটা জায়গাতেই তোমাদেরকে আমার প্রয়োজন এবং তোমরা যেমন এতদিন কাজ করছিলে, ঠিক তেমনি ভাবেই কাজ করবে। কিন্তু কাজের বিনিময়ে তোমরা মজুরি পাবে, কেননা আজ থেকে তোমরা স্বাধীন। বলা যায় না, যদি আমি কখনো ঋণী হয়ে পড়ি কিংবা মারাই যাই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে যা ঘটে তখন তোমাদের অন্য কোথাও বিক্রি করে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

'শুধু তাই নয়, আজ থেকে আমি ঠিক করেছি, তোমাদের প্রত্যেককেই শিক্ষা দেব!

হয়তো কিছুটা সময় লাগবে, তবু প্রতিটা স্বাধীন মানুষ হিসেবে তোমাদের কাছে আশা করব তোমরা শেখার আগ্রহ প্রকাশ করবে, তোমরা ভালো হবে, নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে আর ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখবে। আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, যতদিন জীবিত থাকব, তোমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব।'

সমস্ত চুল পেকে সাদা হয়ে যাওয়া এক বৃদ্ধ, আজকাল চোখে যে ভালো দেখতেও পায় না, কাঁপা কাঁপা হাত দুটো ওপরে তুলে বলল, 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, কর্তা!'

'আর শুধু একটা কথা, তোমরা আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু, টম চাচাকে কখনো ভুলো না।'

জর্জ তখন টমের মৃত্যুর শেষ দৃশ্যটা সংক্ষেপে বর্ণনা করল এবং এ পৃথিবীর প্রতিটা মানুষকে সে কীভাবে তার হৃদয়ের আন্তরিক ভালোবাসা জানিয়েছে সে-কথাও বলল,

'বন্ধুরা আমার, তার কবরের সামনে নতজানু হয়ে বসে আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করেছিলাম, আমার নিজের আর একজনও ক্রীতদাস থাকবে না। যদি সম্ভব হয় আমি প্রত্যেককেই মুক্তি দেব। যাতে অন্তত আমার জন্যে ওদের কাউকে পরিবার-পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নির্জন কোনো আবাদভূমিতে আমার টম চাচার মতো নিঃসঙ্গ অবস্থায় মরতে না হয়। তাই জীবনে তোমরা যদি কখনো মুক্তির স্বাদ অনুভব করো, মনে কোরো সেই মুক্তির জন্যে তোমরা চিরঋণী মহৎ হৃদয় সেই মানুষটার কাছে। যখনই তোমাদের টম চাচার ঘরটার দিকে চোখ পড়বে, মনে মনে স্মরণ করবে সৎ আর বিশ্বস্ত সেই মানুষটাকে, আপ্রাণ চেষ্টা করবে ঠিক তাঁর মতোই অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে উঠতে।'

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
আলোকিত মানুষ চাই
অন্তর্ভুক্তি নং
776403
স্থাপিত-১৯৭৮
বইটিকে যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করুন

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

www.alorpathsala.org
আলোর পাঠশালা
School of Enlightenment
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র